

স্বামী বিবেকানন্দ
ও
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

সরলাবালা সরকার



বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র, ১৩৬৩
প্রকাশকঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকরঃ যতীন্দ্রনাথ নিয়োগী
মলিন প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩, সুতারকিন স্ট্রীট,
কলিকাতা ১

প্রচ্ছদপট-শিল্পীঃ
সেবতী সরকার
বর্ণলিপি ঃ অর্ধেন্দুশেখর দত্ত

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণঃ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাইঃ
ওরিয়েন্ট বাইন্ডিং ওয়ার্কস

সাড়ে চার টাকা

ভারতবর্ষের নবযুগের স্রষ্টা ও ভারতীয় তরুণগণের
মহান কার্যে জীবন সমর্পণের প্রেরণাদাতা

স্বামী বিবেকানন্দের

ও ভারতগতপ্রাণা স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা

নিবেদিতার

পরম পবিত্র ও আদর্শদাত্রী স্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থখানি লেখিকা কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল

॥ নমো রামকৃষ্ণায় ॥

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এমনই একাত্মক যে, একটির বিষয় আলোচনা করিতে গেলে অপরটি স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্ভবের ইতিহাসও একটি বিশেষ অধ্যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলা দেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের সামাজিক ইতিহাস ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের দারুণ অধঃপতনের ইতিহাস। হিন্দুসমাজ তখন এমনই আদর্শভ্রষ্ট, ধর্মের নামে এমন সব অধর্মাচরণ, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সমাজে সগৌরবে চলিতেছিল যে, সেই সময়কার ঘটনাবলী আলোচনা করিলে মন লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "যখন সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিতেছিল, যখন আর্যসন্তানগণ কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন এবং ক্ষীণবুদ্ধি ও সংস্কারমুগ্ধ, সেই দারুণ দুঃসময়ে আর্ষ জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান আপাতপ্রতীয়মান-বহুধাবিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন; স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে যে আদর্শ জীবন্তভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উপর সেই আদর্শই দেশবাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং যিনি এই ভার অর্পণ করিয়াছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। এবং এই 'সর্বজনহিতায়'-রূপ ভার গ্রহণই স্বামী বিবেকানন্দর জীবনের সাধনার উৎসস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহিত আমি অল্প বয়স হইতেই ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলাম, এবং সেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে স্বামীজীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভও

হইয়াছিল। স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গলাভের সৌভাগ্যে এবং তাঁহার লিখিত স্বামীজীর চরিত্রচিত্রে স্বামীজীকে যেভাবে অনুভব করিয়াছিলাম, এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

তাহা ভিন্ন অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও কর্মবিবরণীর সাহায্যে এই গ্রন্থের সন্নিবেশিত বিষয়গুলিও লিখিত হইয়াছে। এই সব তথ্য সংগ্রহে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠের স্বামী ত্রিপুরানন্দের যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বস্তুতঃ তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ যে ভারতবর্ষের মহা কল্যাণকর এক মহান্ প্রতিষ্ঠান, ইহাতে আজ আর কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং আশা করি এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য দেশবাসী আগ্রহী হইবেন। এই প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের এক পরম গৌরবের সামগ্রী। আমার এই রচনার সার্থকতা একান্তভাবে ইহার বিষয়বস্তুর উপরেই নির্ভর করিতেছে, রচনানৈপুণ্য অথবা নিপুণতার অভাবের উপর নহে, ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। তবে যতটা ভুল-ত্রুটি না থাকে, সেজন্য আমি আমার সাধ্যমত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি, পাঠকগণের নিকট ইহাই আমার নিবেদন।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র অনুধ্যানে সূর্যের মত স্বীয় মহিমায় মহিমান্বিত যে একাধারে মহা তেজোময় ও মহা প্রেমময় চরিত্র আমার মনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা ভাষার সাহায্যে চিত্রিত করা আমার মত অক্ষমার পক্ষে যদিও সম্ভব নয়, তথাপি স্বামীজীর দেশবাসিগণ এই অক্ষম চেষ্টা হইতেই সেই দেশজননীর বরেণ্য সন্তানের জীবনের সাধনার স্বল্পমাত্রও যদি নিজ অনুভূতির সাহায্যে অন্তরঙ্গ করেন, তাহাতেই লেখিকা নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিবেন।

সরলাবালা সরকার

গ্রন্থ-পরিচয়

একটা অতি ছোট ফলের আঁটি, মটরের দানার চেয়ে বড় নয়, না-জানি কেমন করে, ঝড়ে উড়ে না হয় পাখির মুখে এসে কোনো রাজবাড়ীর ছাদের এক কোণে পড়ল। সে নিজ শক্তিতে বাহিরের জলবায়ু খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া প্রকাণ্ড এক বনষ্পতি হয়ে দাঁড়াল। তার পাতার নীচে সহস্র মানুষ রোদ বৃষ্টি হতে রক্ষা পায়, তার ডালে নানা রঙের শত শত পাখি, সকলে মিলেমিশে রাত্রে বিশ্রাম করে, "সর্ববিশ্ব সেখানে এক নীড় হয়।" আবার তার ডাল হতে শিকড় নেমে এক একটি নূতন স্বতন্ত্র গাছ সৃষ্টি করে। এর নাম অক্ষয় বট।

আমরা যে আজও বেঁচে আছি তাদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ এক আশ্চর্য দৈব সৃষ্টি নিজের চোখে দেখি নাই কি?

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর এক সরল নিরহংকার যুবক পূজারীঠাকর—বাবুরা তাঁকে নিরক্ষর বলিলেও ভুল হয় না—সেই মামুলী কর্মস্থলে বসে নিজ দৈনিক কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার জন্য উচ্চশিক্ষিত ধনী, এমন কি অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতারা পর্যন্ত তাঁর কাছে আসতেন, তাঁর কথা শুনে, নিঃশব্দ সঙ্গ পেয়েও চিত্তের শান্তিলাভ করতেন, যেন ঐ পুরুত-ঠাকুরটার সঙ্গও "মোটা-কাপড়ে ভাষা" তাঁদের সামনে এক অলোক-আলোকে উদ্ভাসিত অবিনশ্বর জগতের দোর খুলে দিত। আবার হিন্দু সমাজের সব নীচের স্তরে, মুদি, গরীব গৃহস্থ, এমন কি দিন-খাটা মজুর ও নিরক্ষর বিধবা তাঁর কথা বুঝতে, তাঁর কীর্তন ও ভজন শুনে ক্ষণিকের

তরে তাঁর সঙ্গে একাত্মা হতে, অমর জগতে উঠতে বাধা পেত না।

কাল আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। রামকৃষ্ণ কোনো সম্প্রদায়, কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ গঠিত করিয়া গেলেন না। তারপর কি হইল?

এরূপ ঘটনা তো ভারত ইতিহাসে সহস্র সহস্রবার ঘটেছে। ১৯০১ সালের জন-গণনায় দেখা গেল যে, এই দেশে বাহান্ন লাখ সাধু বা ধর্মপথে ভিক্ষুক আছে। এই আমরাই তো দেখিয়াছি কত নামকরা ধর্মনেতা ভবত্রাতা—রামাক্ষেপা, সাধু ভবকিংকর (তাঁর সঙ্গে ঘুরিতেন সাধ্বী ভবকিঙ্করী), দয়ানন্দ (বাঙ্গালী, আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা নহেন), নাগমহাশয় (গৃহ-আশ্রমী); আর ড্যাশ-আনন্দের তো গণনাই নাই। বহু পূর্বেও কলিকাতায় পূজা পাইত রসা-পাগলা (মুসলমান), চৌ-রংই (হিন্দু সান্নাসী) এমন কি বারাসতের গাজী তিতু মীর (যে মন্ত্রবলে ইংরাজ সিপাইদের বন্দুকের গুলী "খা ডালা")। এরা সকলেই কালের নির্মম স্রোতে ভাসিয়া গিয়া বিস্মৃতির অতল-স্পর্শ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারীটিও সেই পথে গেলেন না কেন? তিনি যে দৈববীজ কোনো দিকে না তাকাইয়া বাংলার মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গেলেন, তাহাকে অঙ্কুরিত করিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত; আর তার পর পালিত বর্ধিত ফলবন্ত করিয়াছে নরেন্দ্র-স্থাপিত সম্প্রদায়। জগতের ইতিহাস দেখাইতেছে যে, এইরূপ সঙ্ঘ গঠনের ফলেই ঈশ্বর প্রেরিত পূত অগ্নিশিখা নিবিতে পারে না, সাধকগণ তাকে চিরপ্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখে।

যীশু খ্রীষ্ট ফকির মাত্র ছিলেন তিনি কোনো ধর্ম-সংহিতা বা সম্প্রদায় গড়েন নাই। খ্রীষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ এবং ভক্ত সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ করা হইল তাঁহার শিষ্য সেণ্ট পলের কাজ এইজন্য পণ্ডিতেরা প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মকে Pauline

Christianity বলেন। সেই মত চৈতন্যের বাণীকে চির-স্থায়ী এবং তাঁহার ভক্তদের একসূত্রে-বাঁধা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন নিত্যানন্দ; নচেৎ উহা রক্ষা পাইত না।

প্রথম নাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—অর্থাৎ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ইংরাজীতে অর্ডর্ অব্ মংকস; এখন লোকে সব জায়গায় রামকৃষ্ণ মিশন বলিয়া চেনে। ইহার মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। জনসেবা (আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব-জগতে) ইহার ব্রত, জগতে এইজন্যই ইহার আদর।

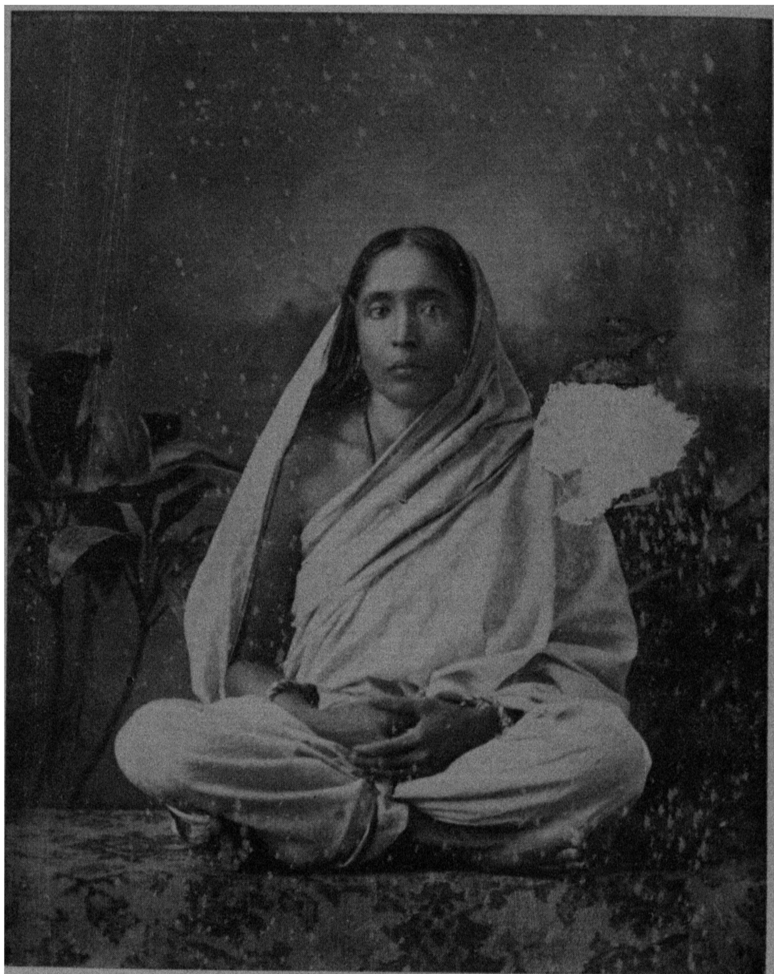
মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগে এই সংঘ রীতিমত গঠিত অর্থাৎ দেহবন্ধ স্থায়িরূপে হয়। ইহার জীবনীশক্তি, ডালপালা বিস্তার এবং বর্তমান আকার আমাদের চোখের সামনে; তার বর্ণনা আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহার ক্রমবিকাশ অতি মনোরম, অতি শিক্ষাপ্রদ একটি ইতিহাসের বিষয়। কি করিয়া সেই ক্ষুদ্র বীজটুকু এত শক্তিশালী এত বিস্তৃত মহীরুহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কে কে ইহার সেবা করিয়াছে, এর উপর দিয়া কোন কোন ঝড়ঝাপড়—যেমন সি আই ডির প্রেম-দৃষ্টি, আর ততোধিক ভয়ানক ভিতর হইতে ভাগভাগির ফাটল বহিয়াছিল কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বৃক্ষটি এবং ইহার প্ররোহ (শিকড় বেড়ে নূতন গাছ) গুলি কিরূপে জনসেবা করিতেছে,—এই সব কথা বেশ সাজাইয়া সরল সুপাঠ্য ভাষায় এই গ্রন্থখানিতে বলা হইয়াছে। অধ্যায়বিন্যাসও যুক্তিসংগত; বিবেকানন্দের কার্যগত জীবন খুব বিস্তৃতভাবে আঁকা হইয়াছে—তাঁর হৃদয়ের আশা-নিরাশা, অমর বাণী, ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের মানচিত্র (সেই হস্তলিখিত বইখানা এখনও অধ্যক্ষ মহারাজ রক্ষা করিয়াছেন)। তাঁর ইংরাজী বক্তৃতা ও পত্রাদির বাংলা অনুবাদ দেওয়ায় এই গ্রন্থ সহস্র সহস্র সাধারণ পাঠক-পাঠিকার নিকট ঐ অমৃতধারা পৌঁছাইয়া দিবে।

আরও আছে এই সংঘের নিয়মাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা এবং যেসব বাদবিতণ্ডার ভিতর দিয়া নিয়মাবলী ও

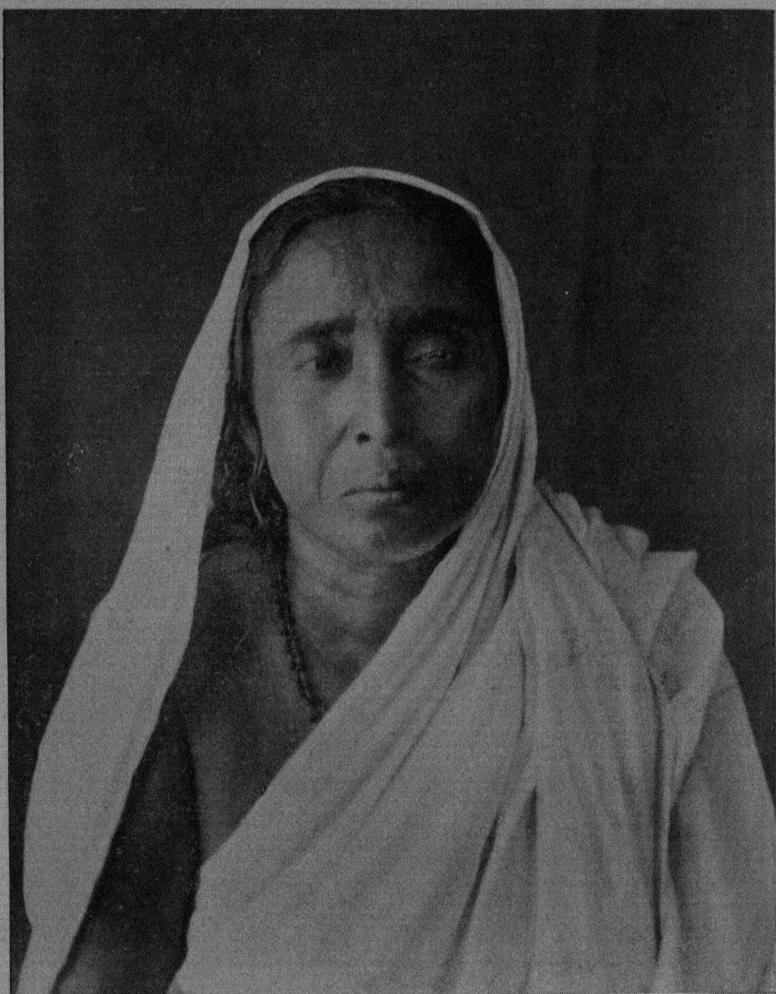
কার্যপদ্ধতি বর্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে তাহার আভাস।

গ্রন্থের লেখিকা আদি হইতেই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত, শিক্ষাকার্যে সেবিকা এবং প্রচার বিভাগে অক্লান্ত শ্রমিকা, সরস জনসাহিত্যের স্রষ্টা। এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঠিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। তাহার উপর ঘটনা-সংগ্রহ এবং সাক্ষ্য-উদ্ধৃতির ফলে এই বইখানিকে রামকৃষ্ণ সংঘের একখানি ছোট জ্ঞান-কোষ (এন্-সাইক্লোপিডিয়া) বলিয়া মনে হয়। এই জ্ঞানকোষ পূর্ণাঙ্গ হইবে যদি দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সাতজন মঠাধীশের জীবনী ও কার্যকলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয় এবং বাৎসরিক আয়ব্যয়, শিক্ষাগার, হাসপাতাল, রিলিফ কেন্দ্র প্রভৃ[illegible]া ও ফলাফল ছাপান হয়।

যদুনাথ সরকার



শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী



শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা

স্বামী মাধবানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে জীবনী লিখিয়াছেন, (vide Life of Sri Ramkrishna, Published in the year 1925) সেই গ্রন্থে যাঁহাদিগকে লইয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ' প্রথম গঠিত হয় তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে (৭২৭ পৃঃ)। সেই নামগুলি এইঃ—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন,, যোগীন, কালী, শশী ও শরৎ। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি ছেলের নাম পাওয়া যায়, ইঁহাদের নাম সারদা, হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর। ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের অসুখের সময় সেবা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঁহারাই প্রথম সন্ন্যাসী সন্তান।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুখ প্রথম ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই অর্থহীন ও অল্পবয়স্ক। যাহা হউক, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া প্রথমে দুর্গাচরণ মুখার্জির স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরকে কলিকাতায় নিয়া আসেন।

ইহার পর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার ঘরটি ভাড়া নিয়া সেইখানে ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া হয়, সেই বাড়িতে তিনি তিন মাস ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় ছিলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ প্রায় দিবারাত্র তাঁহার কাছে থাকিতেন—কালী এবং শশীও তাঁহার সহযোগিতা করিতেন।

বস্তুত এই তিনটি ছেলেকে লইয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের রুগ্নশয্যার পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সূচনা হয় এবং নরেন্দ্রই ছিলেন এই সেবকদলের নেতা।

ইহার পর কাশীপুরের বাগানবাড়ি। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে বড় রাস্তার ধারে শ্রীগোপাল ঘোষের বাগানবাড়ি। এতদিন ঠাকুরের অসুখের গুরুত্ব তত বুঝা যায় নাই, কিন্তু এখন সকলেই দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার নিকটে আসিতেছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষে ডিসেম্বর মাসে ঠাকুর এই বাড়িতে আসেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণীও ঠাকুরের পথ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য কাশীপুরে আসিয়াছেন। লাটু, বুড়ো, গোপাল ও তারক দিবারাত্র ঠাকুরের কাছে আছেন এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তগণ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন, কালী, শশী ও শরৎ ইঁহারাও সকলেই প্রায় সব সময় তাঁহার নিকটে আছেন, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কেহই অন্যত্র যান না।

রুগ্নশয্যা ও রোগীর পরিচর্যা ঠাকুরের আনন্দময় সংস্পর্শে এ নিরানন্দ ভাবটি কাহারও মনে আসে না ; ঠাকুর তাঁহার সন্তানদিগকে এই সুযোগে যেন নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রেরণা ও শক্তি যেন অহরহ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর এই তরুণ ভক্তদল আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাহিলে না, অথচ কাশীপুরে থাকাও সম্ভব নয়। কেননা বাড়ির ভাড়া আশী টাকা। এত টাকা ভাড়া দিবার সংগতি ছেলেদের নাই, আর গৃহী ভক্তগণ এতদিন যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন, এখন অনেকেই আর টাকা দিতে ইচ্ছুক নন। ঠাকুরের পুণ্য অস্থি ও শয্যা প্রভৃতি লইয়া ছেলেরা এখন যায় কোথায়?

সেই সময় 'অস্থি' লইয়া ত্যাগী যুবকগণের সহিত গৃহী ভক্তগণের কিছু মতান্তর হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত পরম ভক্ত, তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যে বাগানবাড়ি আছে সেখানে ঠাকুর পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেইখানেই ঠাকুরের পুণ্য অস্থি রক্ষিত হউক। তিনি সেখানে পূজা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবেন। নতুবা এই গৃহহীন তরুণদল, যাহাদের নিজেদেরই কোন আস্তানা নাই তাহারা এই 'অস্থি' লইয়া কোথায় রাখিবে। নরেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু অন্যান্য যুবক ভক্তগণ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। সুতরাং অস্থির কিছু অংশ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান নামক বাগানে সমারোহে সমাধিস্থ করা হইল, বাকী অংশ ঠাকুরের সন্তানগণ নিজেদের জন্য রাখিয়া দিলেন এইজন্য যে, ঠাকুরের প্রতীকস্বরূপ ইহা তাঁহাদের সাধনার অনুপ্রেরক হইবে।

রাখিয়া তো দিলেন, কিন্তু রাখিবেন কোথায়? সর্বত্যাগী এই তরুণদল, যাঁহাদের মাথা গুঁজিবার কোন আশ্রয় নাই, আহারের সংস্থান নাই, টাকাকড়িও নাই যে বাড়িভাড়া করিয়া সকলে সেই বাড়িতে একত্রে বাস করিবেন। বস্তুত যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও তাঁহারা তখনও সন্ন্যাসীই ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় প্রমদাচরণ মিত্রকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে ১।২।৩ দিয়া ১২ দফায় তখনকার অবস্থা জানাইয়াছিলেন। তাহার প্রথম আরম্ভ এইরূপঃ—

১। "প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের গোলাম, তাঁহাকে 'দেই তুলসীতিল এ দেহ সমর্পিণু' করিয়াছি। * * * তাঁহার বাক্য আপ্ত-বাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। "আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব। ইহাতে যাহা হইবার হইবে, স্বর্গ বা নরক অথবা মুক্তি যাহাই আসুক,—লইতে রাজী আছি।

৩। "তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক ওদিক বেড়াইতে গেলে সে আলাদা কথা—সে বেড়ানো মাত্র—তাঁহার মত এই ছিল যে,—যিনি পূর্ণ সিদ্ধ,—এক তাঁহারই ইতস্তত বিচরণ সাজে। যতক্ষণ তাহা না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন থাকাই উচিত। * * *

৪। "অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসীমণ্ডলী বরাহনগরের একটি পুরাতন জীর্ণ বাড়িতে একত্রিত আছেন। এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু

" শক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাড়িভাড়া দিতেন।"

এই বাড়ির ভাড়া ছিল দশ টাকা, বলরামবাবু ও সুরেশবাবু সেই বাড়ির ভাড়া দিতেন। সুরেশবাবু সুবিধামত জমী কিনিবার জন্য ১০০০৲ টাকাও দিয়াছিলেন এবং পরে আরও কিছু দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বলরামবাবুর দেহান্তর হয় এবং তাহার অল্পদিনের পরে ঐ খৃষ্টাব্দের ২৫শে তারিখে সুরেশবাবুও পরলোকগমন করেন। নরেন্দ্রনাথ যে রাত্রে সুরেশবাবু পরলোকগমন করেন তাহার পরের দিনই এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। বলরামবাবুর বাড়ি বসিয়াই তিনি এই পত্র লেখেন।

জরাজীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ি, তাহাতেই তাঁহারা চার বৎসর সাধন, ভজন ও তপস্যায় কাটাইতেছেন। কেহ কেহ ইহার মধ্যে বাহিরেও গিয়াছেন, কিন্তু আবার এখানে আসিয়াই একত্রে মিলিত হইয়াছেন। বাড়িটিকে বলা হইত বরাহনগর মঠ। ইহার পূর্বে অবশ্য ভূতের বাড়ি বলিয়া এই বাড়ির একটা বদনাম ছিল, কিন্তু এই সংসারত্যাগী যুবকগণ ইহাতে আশ্রয় লওয়ায় ইহার নাম হইয়াছে, বরাহনগর মঠ। একটি ভাল ঘর দেখিয়া সেইখানেই ঠাকুরের অস্থি ও ছবি রাখা হইয়াছিল, সেইটিই ইঁহাদের পূজার ঘর। শশী ঠাকুর পূজা অর্চনার ভার লইয়াছিলেন, এবং অন্য সকলেই মাঝে মাঝে মঠ ছাড়িয়া তীর্থে অথবা বাহিরে যাইতেন কিন্তু শশী একদিনের জন্যও ঠাকুরের এই সেবার ভার ছাড়িয়া বাহিরে যান নাই।

অতি কষ্টেই তাঁহাদের দিন চলিত, যদিও সে কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না। হয়তো কোনদিন কেবল নুন আর ভাত, অথবা তেলকুচা পাতা সিদ্ধ আর ভাত—ইহাই ঠাকুরকে নিবেদন করিবার জন্য জুটিত, আবার কোনদিন হয়তো নুনও জুটিত না। ভিক্ষা করিয়া লইয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন ও সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া প্রসাদ পাইতেন। আবার কোনদিন উপবাসেই কাটিত, সেদিন সকলে মনের আনন্দে ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ কিছুই থাকিত না। কাপড়ও বেশী ছিল না, এজন্য সকলে ভিক্ষা করিবার জন্য বাড়ির বাহির হইতে পারিতেন না; বাহির হইবার উপযোগী কাপড়খানি পরিয়া যদি কেহ বাহিরে যাইতেন, অন্য আর এক ভ্রাতা বিনা বস্ত্রেই ঘরের ভিতর দিন কাটাইতেন, ইহাই রামকৃষ্ণ সংঘের যুবকদিগের প্রাথমিক জীবন-তপস্যা।

রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ একমন একপ্রাণ; স্বামীজী তাঁদের অগ্রণী ও প্রেরণাদাতা। অপূর্ব এই প্রেমের পরিবার, একদিকে নাই কোনই বন্ধন, অপরদিকে এক অপার্থিব প্রেমের প্রবাহে সকলে যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন।

বাবুরামের বাড়ি ছিল কলিকাতার উপকণ্ঠে আঁটপুর নামক গ্রামে। বাবুরাম মাঝে মাঝে মাতৃদর্শন করিতে যাইতেন, সেই সময় একদিন বাবুরামের মা সকল ছেলেকেই আঁটপুরে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই নিমন্ত্রণ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ খুশীই হইলেন এবং সদলে আঁটপুরে গেলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

তখন ডিসেম্বর মাসের কাছাকাছি। আঁটপুর পল্লীগ্রাম, সেখানে দারুণ শীত। বাবুরামের জননী ঠাকুরের ভোগের জন্য রন্ধন করিলেন, সন্তানবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া সমস্ত দিন ঠাকুরের প্রসংগে পরমানন্দে দিন কাটাইলেন। রাত্রে কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া ধুনি জ্বালাইয়া সেই ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন সেই তরুণ ব্রহ্মচারীর দল। এই সময় নরেন্দ্রের মনে এক প্রবল আবেগ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এস ভাই, আজ আমরা এই পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, আমরা আজ হইতে ঠাকুরের নির্দেশ ধারণ করিয়া তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে চলিব, আর আমরা সংসারে ফিরিয়া যাইব না।" সকলেই আন্তরিকভাবে অগ্নি সাক্ষী করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

কিন্তু বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ তখনও বাকি ছিল। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের নিকটেই সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিধিমত দীক্ষা না পাইলেও তাঁহার নিকট হইতে গেরুয়া বস্ত্র ও সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ লাভ করিযাছিলেন, কিন্তু যথারীতি বিরজা হোম কবিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ তখনও সংপন্ন হয় নাই। সুতরাং স্বামীজীর নেতৃত্বে এইবার তাঁহারা সেই বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পন্ন করিলেন। বিরজা হোমেব হোমাগ্নিতে পূর্বের সমস্ত সংস্কার, নাম ও উপাধি বিসর্জন দিয়া গেরুয়া ধারণ ও নবজন্ম গ্রহণে নূতন নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের নাম এখন এইরূপ হইল।

১। নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ; প্রথমে স্বামীজী 'বিবিদিষানন্দ' নামই গ্রহণ করেন, পরে 'সচ্চিদানন্দ' নামও মাঝে মাঝে নিয়াছিলেন। আমেবিকা যাইবার আগে 'বিবেকানন্দ' নাম নেন। সর্বত্র ইনি স্বামীজী নামেই খ্যাত হইয়াছেন।

২। রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

৩। বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ

৪। যোগীন—স্বামী যোগানন্দ

৫। নিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

৬। শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
(দাক্ষিণাত্যে ইনি পতিত উদ্ধারকার্যে জীবন সমর্পণ করেন)

৭। কালী—স্বামী অভেদানন্দ (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা)

৮। বুড়ো-গোপাল—স্বামী অদ্বৈতানন্দ (ইনিই একমাত্র তরুণ দলের ভিতর বয়োবৃদ্ধ ছিলেন)

৯। শরৎ—স্বামী সারদানন্দ (উদ্বোধন মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও মায়ের দারোয়ান নামে খ্যাত)

১০। তারক—স্বামী শিবানন্দ (ইঁহার অপর নাম মহাপুরুষ মহারাজ, ইনি ছিলেন মঠের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক)

১১। লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ (রামদত্তের হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য, পরে মায়ের সেবায় নিযুক্ত হন)
১২। হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ
১৩। তুলসী—স্বামী নির্মলানন্দ
১৪। সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীত
১৫। গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ
১৬। সুবোধ—স্বামী সুবোধানন্দ (ইনি "খোকা মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন)
১৭। হরিপ্রসন্ন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

এই নামের তালিকায় যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারাই ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তান কি না, এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে। স্বামী মাধবানন্দ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 'লাইফ অব শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে ইংরেজিতে ঠাকুরের যে জীবনী প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের ৭৫৬-৭৫৭ পৃষ্ঠায় ঐ সতেরো জনকেই ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লিখিত একখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী মায়াবতী আশ্রম হইতে বাহির হয়, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ সেখানি প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্য সকলেরই নাম আছে, কেবল স্বামী ত্রিগুণাতীতের নাম নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী আশ্রম হইতেই স্বামী বিবেকানন্দেব একখানি জীবনী বাহির করেন, তাহাতে অন্য সকলের নাম আছে—কেবল স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নাম নাই। সুতরাং মনে হয় ভুলক্রমেই এই নাম দুটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এবার 'প্রমদাচরণ মিত্রকে লিখিত স্বামীজীর পত্রের পরের অংশ হইতে কিছু আলোচনা করিব।

ঠাকুরের দেহ দাহ করা হয় ইহা নরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না, তিনি লিখিয়াছেন ;—

> নানা কারণে ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নিতে সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে উহা গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধহয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির ও প্রতিকৃতির মঠে (অর্থাৎ বরাহনগর মঠে) প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে।

* * *

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার (অর্থাৎ সুরেশবাবু ও বলরাম বাবুর) ইচ্ছা ছিল যে গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি গত রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আপনি পূর্ব হইতেই জানেন এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই। * * * তাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা এই ক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক

বেদনা পাইতেছে। ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

কেবল স্থানের জন্যই কি? তাহাও নয়। স্বামীজী মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ঠাকুরের আবির্ভাব এবং তাঁহার ত্যাগী সন্তানদল সংগ্রহের ভিতর এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাঁহার পত্রের অপর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও জন্মভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্ত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তিনি এইজন্যেই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী University men হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?"

তিনি ঐ পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন, "যদি বলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?"—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম, তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।" (প্রব্রজ্যা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এই পত্র লিখিত হয়)

বাংলাদেশ ও বঙ্গভূমি! শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে কি গৌরব লাভ করিয়াছে—এই দুর্ভাগা দেশ! স্বামীজী তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "যদি বলেন যে, 'কাশী আদি স্থানে আসিয়া সাধন করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে এদেশের লোক স্বপ্নেও তাহা ভাবে না, কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগ্য ও 'অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন।"* *

তিনি এই পত্রের অন্য স্থানে লিখিয়াছেন, "আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।* * আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান্, সৎকুলোদ্ভব যুবা সন্ন্যাসীগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের Ideal ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের "অহো দুর্দৈবম্।"

কী সেই মহান্ আদর্শ যাহার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত সাধনা? একটিমাত্র কথাতেই স্বামীজী তাহার উত্তর দিয়াছেন, "তোমরা সব মানুষ হও। দেশের সর্বশ্রেণীকে মানুষ হইবার জন্য সাহায্য কর।" ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর লণ্ডনে 'দি ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটে'র সম্পাদক স্বামীজীকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সম্প্রদায়ই স্থাপন করিয়াছেন কি না, তাহার উত্তরে স্বামীজী বলেন, "না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীর জন্য যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে তাহা

দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল।"

"No, his (Sri Ramkrishna') whole life was spent in breaking down the barriers of sectarianism and dogma. He formed no sect. Quite the reverse. He advocated and strove to establish absolute freedom of thought. (vide complete works of Swami Vivekananda, Vol. V Third edition published in 1924 page 116)"

"মানুষ মাত্রই মানুষ এবং যত মত তত পথ" শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন এই বার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, "জীবনে একমাত্র সার সত্য আছে তাহা স্বার্থত্যাগী প্রেম।" ত্যাগের উদ্ভব যদি প্রেমে না হয় তবে সে প্রেমের বা ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? তাই স্বামীজীর উক্তিতে আমরা পাই,

"সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
প্রাণ মন শরীর অর্পণ কর সখা এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজীর গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দ

বরানগরের যে বাড়িতে এই তরুণ সন্ন্যাসীগণ আশ্রয় লইলেন, এখানে সেই বাড়ির কিছু বর্ণনা দিতেছি।

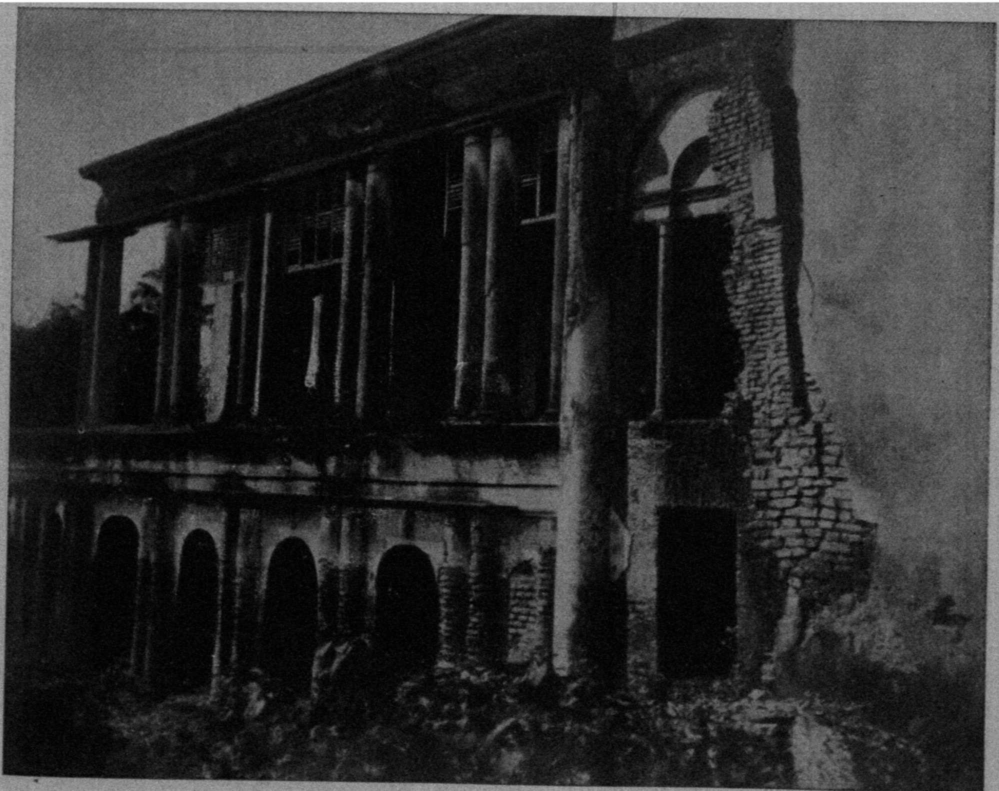
বাড়িটি ছিল মুন্সীদের বাড়ি, এত ভাঙ্গা যে, তাহার সকল অংশ ব্যবহার করা হইত না। বাড়ির সম্মুখে একটি উঠান, উঠানটি ছিল স্তূপাকার মাটিতে ভর্তি। পশ্চিমদিকে দোতলায় উঠিবার একটা সিঁড়ি, সিঁড়িটা যদিও ভাঙা, কিন্তু উপরে উঠা যায়। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতলার বারান্দা। উত্তরদিকে একটি ঘর, সেই ঘরটিকে কাপড় টাঙাইয়া তিনভাগে ভাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামী, যোগানন্দ ও অভেদানন্দ, তিনজন সাধনকুঠরী করিয়াছিলেন। এই ঘরের সমুখের দালানটি কাঠের গরাদ দিয়া ঘেরা ছিল, মেঝে উঠিয়া খোয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ছাদের বরগা ভাঙিগয়া গিয়াছে. বাঁশের ঠেক্না দিয়া কোনমতে ছাদকে রক্ষা করা হইতেছে। ইহার পরে যে ঘরটি সেইটিকেই ঠাকুরঘর করা হইয়াছিল। এই ঘরটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও তাহার ভিতরের দিকে আরও একটি দরজা ছিল।

ভিতরের দিকেও ছিল একটি বড় দালান, দালানের পূর্বদিকে খড়খড়িওয়ালা জানালাও ছিল, কিন্তু খড়খড়ি ভাঙিগয়া গিয়াছে। এই দালানের পশ্চিমদিকে একটা বড় ঘর, সেই ঘরে পাতা থাকিত প্রথমে চাটাইয়ের মাদুর ও তাহার উপর একটি ছেঁড়া সতরঞ্চি, এইটিই হইল শয়নগৃহ।

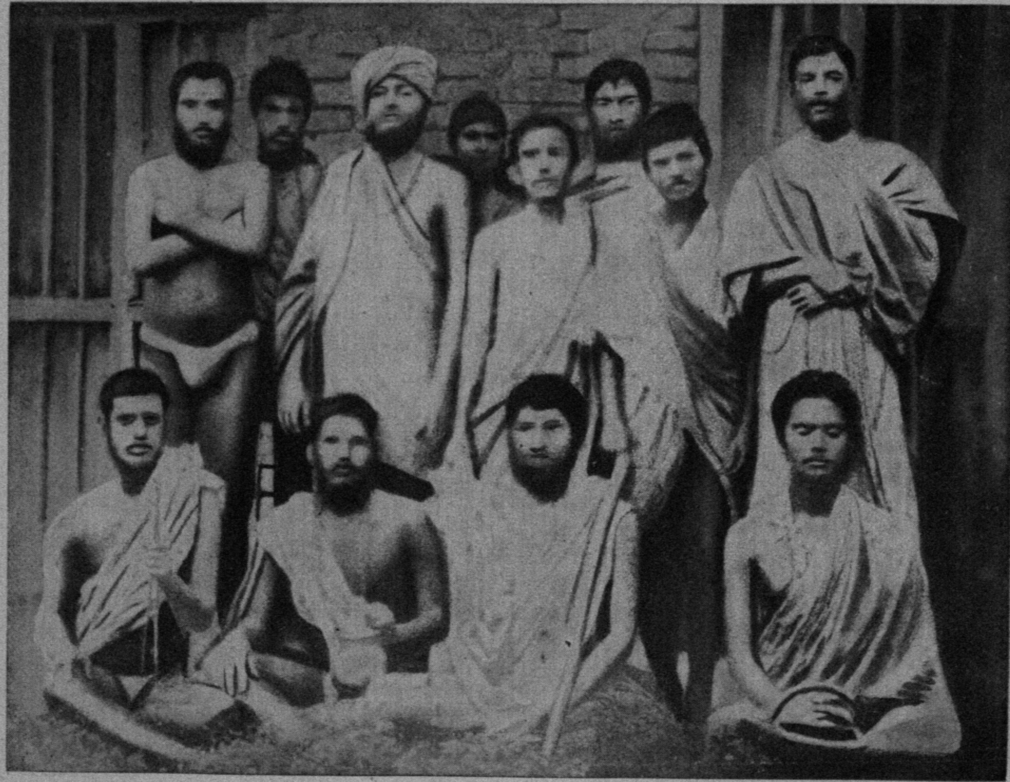
ঠাকুরঘর করার সম্বন্ধে অনেকেরই আপত্তি ছিল, কিন্তু শশীমহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সে সব আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। ঠাকুরের 'অস্থি' রহিয়াছে এবং এবং তাহাই তাঁহার প্রতীকস্বরূপ। এই বাড়িতে আসিয়া অবধি শশীমহারাজ পূজার কার্য লইয়া থাকিতেন এবং তাহাই ছিল তাঁহার ধ্যান ও ধারণা। তাঁহার সমস্ত গুরুভাইরা মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও ঠাকুরসেবা ও নিয়মিত অর্চনা ছাড়িয়া কোন স্থানে যান নাই। অতি সহজ সেই পূজার পদ্ধতি। আলমবাজারের নানা বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" এই মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করিতেন। দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির সম্মুখে হাতের ধূপদানীটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঐ একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার প্রণাম করিতেন। ঠাকুরের অর্চনাও ঐ একই মন্ত্রে করিতেন।

আহারের ব্যবস্থাও ছিল অতি যৎসামান্য, নুন ও লঙ্কা-সিদ্ধ জলের টাক্না দিয়া মুষ্টিভিক্ষার চাল সিদ্ধ করিয়া তাহাই খাওয়া হইত। সেই জলে কোন কোনদিন দু-চারটি তেলকুচার পাতাও থাকিত। রাত্রে খানকতক রুটি করা হইত।

মশারি ছিল দুটি, একটি বড় ও আর একটি ছোট, কেননা ভয়ানক মশার



বরাহনগর মঠ



বরানগর মঠ

দণ্ডায়মান — স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, বিবেকানন্দ, পাচক, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাস্টার মহাশয়, ত্রিগুণাতীত, সুরেশচন্দ্র মুস্তফী। উপবিষ্ট ঃ—অখণ্ডানন্দ, সারদানন্দ, গোপাল, অভেদানন্দ।

উৎপাত। বালিশের বদলে চাটাইয়ের নীচে এক একখানি ইঁট রাখা হইত। প্রথমে দারুণ শীতে বিনা গাত্রবস্ত্রে পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শীত কাটাইতেন, পরে বলরামবাবু চারখানি উলের গরম কাপড় দিয়াছিলেন, তাহার পর থানকতক কম্বলও জুটিয়াছিল।

পরিধানের কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে বাড়ির ভিতর অনেক সময় সকলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াই থাকিতেন, কিন্তু তামাক খাওয়াটা বাদ যাইত না। নিজেরাই পায়খানা পরিষ্কার করিতেন। পায়খানা ছিল দোতলায়, সুতরাং উলঙ্গ সাধুর দল পায়খানার সম্মুখে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে নানা আলোচনায় মাতিয়া যাইতেন। স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত "মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" নামক পুস্তকে বরানগর মঠের মঠবাসী সাধুদের জীবযাপনের একটি সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্রটি অপূর্ব চিত্র।

কিন্তু স্বামীজীর মনে যে সংকল্পটি সদাসর্বদা জাগ্রত ছিল, তাহা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্রে সেই সংকল্পের কথাই তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন,—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছাকাছি গঙ্গাতীরে কিছু স্থান সংগ্রহ এবং সেখানে ঠাকুরের পুণ্য অস্থির সমাধিদান। আর ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য একটি মঠ স্থাপন, ইহাই ছিল তাঁহার বিশেষ সংকল্প।

বরানগরের ভাঙ্গা বাড়িটি যদিও কয়েক বৎসর ধরিয়া মঠরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বরাবর এই বাড়িতে থাকা চলিবে না; তাহা তিনি জানিতেন ; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামত স্থান সংগ্রহ করিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, কোথায় সে অর্থ ?

এই অস্থায়ী মঠ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মঠ যখন আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়, তখন মঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহার পর নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে থাকার সময় মঠ সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন এবং সেই নিয়মাবলীই এখনও বেলুড় মঠের পরিচালক। এই নিয়ম সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী প্রব্রজ্যায় বাহির হন। ইহার পূর্বে তাঁহার গুরুভাইরাও মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার যাইবার কিছুদিন পরে বাবুরাম মহারাজ, কালী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ ইঁহারা তিনজনে পুরীধামে যান। ইঁহারা ফিরিয়া আসিবার পর তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) ও কালী মহারাজ হাঁটাপথে কেদারনাথ ও বদ্রিনারায়ণ যাত্রা করিবেন মনস্থ করিয়া মায়ের আশীর্বাদ লইবার জন্য প্রথমে জয়রামবাটী গেলেন ও শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কেদারবদ্রীর পথে রওনা হইলেন। এদিকে শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ ও ঠাকুরের গৃহী-শিষ্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ইঁহারাও হাঁটাপথে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 'সান্যাল মহাশয়' নামে ভক্ত-সমাজে পরিচিত ছিলেন, ইনি নামে গৃহী হইলেও প্রকৃতপক্ষে

সন্ন্যাসীই ছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজও (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তিব্বতের পথে যাত্রা করিলেন।

স্বামীজীও এই সময় তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনধাম পর্যন্ত গিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী একবার বদ্রিনারায়ণ যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বার তাঁহার বদ্রিনারায়ণ পর্যন্ত যাওয়া হয় নাই, হাতরাস্ স্টেশনে তথাকার স্টেসন-মাস্টার শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয়ই অল্পদিনের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে পরিণত হয়। এই শরচ্চন্দ্রই স্বামীজীর প্রথম শিষ্য, সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইঁহার নাম হয় স্বামী সদানন্দ এবং ইনি ভক্তগোষ্ঠীতে "গুপ্ত মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন।

বিবেকানন্দ হাতরাস্ হইতে বদ্রিনারায়ণ যাইবার জন্য যখন হৃষীকেশের দিকে রওনা হইলেন—শরচ্চন্দ্রও কর্মত্যাগ ও সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ; কিন্তু হৃষীকেশে আসিয়া প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে লইয়া আবার হাতরাসেই ফিরিয়া আসেন এবং পরে তিনি নিজেও পীড়িত হন, এই সমস্ত কারণে তাঁহার সে যাত্রা কেদারবদ্রী যাওয়া হয় নাই।

শশী মহারাজ ছাড়া অন্য সকলেই এইরূপ নানা তীর্থে গিয়াছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিতেন বরানগরের মঠ বাড়িতে। এইখানে শশী মহারাজ,—গুরুর অর্চনাই যাঁহার সর্বতীর্থ ভ্রমণ—তিনি ঠাকুরের সেবা লইয়া তাঁহাদের ফিরিবার অপেক্ষায় রহিতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) ছিলেন এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি কাহাকেও কোন আদেশ না দিলেও সকলেই তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় থাকিতেন, এমন কি স্বামীজী পর্যন্ত তাঁহার নিকট আদেশানুবর্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও খোকা মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সুবোধানন্দকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং কখনও পদব্রজে, কেহ টিকিট করিয়া দিলে মাঝে মাঝে রেলে করিয়া গির্ণার পাহাড়, ওঙ্কারনাথ, আবুপাহাড় প্রভৃতি হইতে বোম্বে ও দ্বারকা ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসেন; তখন কালী, শরৎ, হরি ও তুলসী এবং সান্যাল মহাশয় ইঁহারা পাঁচজনে হৃষিকেশে ছিলেন। তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়াই তীর্থভ্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু হৃষিকেশে আসিয়া কালী মহারাজ এত অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, আর পায়ে হাঁটিয়া চলা সম্ভব হইল না, তাঁহাকে রেলগাড়িতে করিয়া কাশী আনিতে হইল।

এই কালী মহারাজ ছিলেন বালককাল হইতেই কঠোর তপস্যার একান্ত অনুরাগী, এই জন্য তাঁহাকে কালীতপস্বী বা কালী-বৈদান্তীও বলা হইত। ইঁহার পরবর্তী জীবনে ইনি ধর্ম প্রচারকার্যে বেশীরভাগ সময় আমেরিকাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর নিকট ইনি চিরদিনই ছিলেন

একান্ত অনুরাগী জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃপরায়ণ কনিষ্ঠের মত।

যখন ইঁহারা অসুস্থ কালী মহারাজকে কাশী লইয়া আসেন, তখন স্বামীজী গাজিপুরে ছিলেন। গাজিপুরে পবহারী বাবা থাকিতেন, তাঁহারই দর্শনের জন্য তিনি গাজিপুরে গিয়াছিলেন এবং কালী মহারাজের অসুস্থ হইবার সংবাদ শুনিয়া কাশী চলিয়া আসেন।

এই তরুণ সন্ন্যাসীদল এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থই ভ্রমণ করেন। যে সকল তীর্থ অতি দুর্গম, সেখানেও তাঁহারা পদব্রজে গিয়াছেন। হস্তে কপর্দক মাত্রও নাই, হয়তো দুই তিনদিন আহার জুটিত না, হয়তো অসুস্থ অবস্থায় আশ্রয় অভাবে গাছতলাতেই পড়িয়া থাকিতে হইত, তথাপি তাঁহাদের আনন্দ কোন অবস্থাতেই ম্লান হইত না।

সুর মন্দির তরুমূলে নিবাস,
শয্যা ভূতল, অজিন বাস,
সর্ব-পরিগ্রহ-ভোগ ত্যাগ,
কস্য সুখ ন করোতি বিরাগ?

শঙ্করাচার্যের এই উক্তি তাঁহাদের জীবনে পরিপূর্ণভাবেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন বলরামবাবু ও সুরেশবাবু উভয়েই দেহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাদের স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিবার জন্য বাহির হন। তিনি তাঁহার গুরুভাইদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এবার আমি চললুম। শক্তি-সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েছে। যে শক্তিতে লোকের মনের ভাব বদ্‌লাতে পারা যায়, সেই শক্তি যতদিন না অর্জন করতে পারি, ততদিন ফিরবো না।"

জননী সারদামণি তখন ছিলেন হাওড়া জেলায় ঘুসুড়ি নামক স্থানে। এই স্থানটি গঙ্গাতীরে। কলিকাতা হইতে গঙ্গা পার হইয়া এখানে পৌঁছিতে হয়। স্বামীজী মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইবার জন্য সেইখানেই গেলেন। মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন, ঠাকুরের কাছে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কি প্রার্থনা জানাইলেন, তিনিই তা জানেন; কিন্তু স্বামীজীর মনে হইল তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা যেন সেই মুহূর্তেই পাইয়া গিয়াছেন।

পথে বাহির হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ—নিঃসম্বল এক পর্যটক। সেই দিনের সেই ছবিটি যদি আমরা মনে মনে ধ্যান করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের মনের সম্মুখে উদিত হয় দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ এক গৈরিকধারী মূর্তি, নয়নে অপূর্ব দীপ্তি, সর্বাঙ্গে যেন দৃঢ়সংকল্পজনিত বীর্য প্রস্ফুরিত হইতেছে।

স্বামীজী পশ্চিমের পথ ধরিয়া চলিলেন, সঙ্গে আছেন মাত্র একজন গুরুভ্রাতা গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ)।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ ভাগলপুর

পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু স্বামীজীর মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম অনুভব করিলেন। ভাগলপুরে নাথনগরে যে জৈন-মন্দির আছে, সেখানে অনেক জৈন-সাধু একত্রিত হন, স্বামীজী সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন, জৈন সাধুগণ ইহাতে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সকল ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যে অভিন্ন ইহা স্বামীজীর সহিত ধর্মালোচনায় প্রত্যেকেই অনুভব করিতেন,—তিনি যে-কোন-ধর্মাবলম্বীই হউন।

গঙ্গাধর মহারাজ বৈদ্যনাথধামে গিয়া বৈদ্যনাথ দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছুক দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া স্বামীজী বৈদ্যনাথে গেলেন। তখন 'রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন, স্বামীজী এক দিন ও এক রাত্রি তাঁহার গৃহে অতিবাহিত করেন। পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন একতল গৃহ, সম্মুখে গোলাপ ফুলের বাগান। শুভ্রকেশ, প্রশান্তমূর্তি গৃহস্বামী প্রসন্নহাস্যে সাধুকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং উভয়ে ধর্মালোচনায় নিমগ্ন হইয়া গেলেন। স্বামীজী এই আলোচনার সময় একটিও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন নাই, কেননা ভারতীয় ঋষিগণের অভিমতের বিষয় আলোচনায় পাশ্চাত্য শব্দ ব্যবহার তাঁহার মতে অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ হইতে স্বামীজী গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কাশী আসিলেন এবং প্রমদাবাবুর বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী এই সময় এইভাবে তাঁহাকে নিজের সংকল্পের কথা বলেন—

I shall now leave Kashi, but shall never return until I have burst upon society like a bomb-shell and it will follow me like a dog, (The life of the Swami Vivekananda Vol. II Page 100)

"আমি এখন কাশী ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন না সমাজের বুকের উপর বোমার মত ফেটে পড়তে পারি এবং সমাজকে কুকুরের মত আমার অনুসরণ করাতে পারি ততদিন আর কাশী ফিরছি না।" স্বামীজীর এই উক্তিতে একধারে হিন্দু-সমাজের ব্যবহারিক দুর্নীতির উপর দারুণ বিতৃষ্ণা, অপরদিকে আত্মপ্রত্যয় সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই ছিল এইরূপ তেজদৃপ্ত ও সুস্পষ্ট, অথচ অহমিকার ছায়া মাত্রও তাঁহার মনে ছিল না।

কাশী থেকে অযোধ্যা, অযোধ্যা থেকে নৈনিতাল, নৈনিতালে শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য নামক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি সেখানে কয়েকদিন থাকেন।

নৈনিতাল হইতে চলিলেন বদরিকার পথে। দুর্গম পথ, প্রায়ই জনশূন্য ও জঙ্গলের পথ। নিঃস্বম্বল দুই যাত্রী পদব্রজে চলিয়াছেন সেই পথে। জঙ্গলের ভিতর কে তাঁহাদের ভিক্ষা দিবে, কাজেই দিনের পর দিন অনাহারেই পথ চলিতে হইয়াছে। এইভাবে তিনদিন পথ চলিবার পর আলমোড়ার কাছাকাছি আসিয়া

স্বামীজী এমন দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, জঙ্গলের ধারে একটি কবরের কাছে অর্ধমূর্ছিতভাবে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার তখন এমন অবস্থা যেন সেই মুহূর্তেই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। ভাগ্যক্রমে সেখানে কবররক্ষক একজন মুসলমানের আস্তানা ছিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্য একটি শশা দিয়াছিল, তাহাতেই সে যাত্রা তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

গঙ্গাধর মহারাজ ইতিপূর্বে একবার আলমোড়া আসিয়াছিলেন, তিনি অম্বা দত্তের বাগানবাড়ির কথা জানিতেন, সেখানে পর্যটক সাধুগণের আশ্রয়স্থান আছে। তিনি স্বামীজীকে সেইখানে লইয়া গেলেন। আলমোড়ায় বদ্রীশা থুলঘোড়িয়া নামে এক ভদ্রলোক থাকিতেন, ইনি সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। তারক মহারাজের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। স্বামীজী যখন আলমোড়ায় আসিলেন, শরৎ মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় তখন আলমোড়াতেই ছিলেন এবং বদ্রীশার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদ্রীশা স্বামীজীর আগমনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ও গঙ্গাধর মহারাজকেও নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন।

পার্বত্যসৌন্দর্যমণ্ডিত এই আলমোড়া, স্বভাবতই এখানে মনে ভগবৎভাবের উদ্দীপনা হয়। সাধুসন্ন্যাসীগণ এখানে গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন। স্বামীজীও কিছুদিন ধ্যান ও তপস্যায় যাপন করিবার জন্য একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে আবার বদ্রীশার বাড়িতে আসিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইলেন এবং চারিজনে গাড়োয়ালের দিকে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু স্বামীজীর দেহ পথশ্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, গাড়োয়াল হইতে হিমালয়ের পথে কর্ণপ্রয়াগ নামক স্থানে পৌঁছিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং একটু সুস্থ হইয়াই আবার সঙ্গীগণের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া রুদ্রপ্রয়াগে চলিলেন। পথে আবার তাঁহার জ্বর হইল, কিন্তু সেই জ্বর গ্রাহ্য না করিয়া তিনি হাঁটিয়া চলিলেন। বেশীদূর যাইতে না যাইতেই জ্বর এমন বাড়িয়া গেল যে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না।

রুদ্রপ্রয়াগে তখন চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেখানকার সরকারী আমিন চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জানিতেন, তিনিই চিকিৎসার ভার লইলেন। কিন্তু জ্বর মোটেই কমিল না, তখন সেই আমিনই নিজের ব্যয়ে একখানি ডাণ্ডি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার গুরুভাইরা ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন।

শ্রীনগরে গিয়া অলকানন্দার তীরে একটি কুটীরে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। কুটীরটি একেবারে নদীর উপরে এবং চারিদিকের দৃশ্যও অতি মনোরম। এই কুটীরেই কিছুদিন আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইলেন। এখানে আসিয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল, তখন তিনি তাঁহার কুটীরে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা আরম্ভ করিলেন। সেখানকার একজন

শিক্ষক, যিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি স্বামীজীর নিকট হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়া যান।

স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই স্বামীজী গাড়োয়ালের রাজধানী তেহ্‌রির দিকে যাত্রা করিলেন, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গেই চলিলেন। তেহ্‌রিতে সাধুদের থাকিবার জন্য গঙ্গার ধারে একখানি ঘর ছিল, সেই ঘরে তাঁহারা সদলে আশ্রয় লইতেন এবং মাধুকরী করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। পশ্চিমা সাধুরা গৃহস্থগণের বাড়ি যখন ভিক্ষার জন্য যাইতেন তখন বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া "নারায়ণ হরি" উচ্চারণ করিয়া নিজের উপস্থিতি জানাইতেন, গৃহস্থ তাঁহাদের নিজেদের জন্য প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী হইতে কিছু রুটির টুকরা ভাজি অথবা ডাল ভিক্ষা দিয়া দিতেন। এইরূপভাবে তিন চারি বাড়ি ঘুরিয়া উদর পূরণ করিবার মত খাদ্য পাইলে তাঁহারা অপর কোন বাড়ি যান না, এইরূপ ভিক্ষাকে "মাধুকরী" বলে। মাধুকরী দিনে একবার মাত্র করাই নিয়ম, সুতরাং রাতে তাঁহারা অনশনে থাকিতেন।

তেহ্‌রিতে থাকিবার সময় তেহ্‌রির মহারাজার দেওয়ান শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। ইঁহার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী কিছুদিন তেহ্‌রিতে ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে অখণ্ডানন্দ স্বামী অসুস্থ হইয়া পড়াতে চিকিৎসার জন্য তাঁহাদের দেরাদুন যাইতে হইল, এজন্য সে যাত্রা তাঁহাদের কেদারবদরি যাওয়া হইল না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন দেরাদুনের কাছেই রাজপুর নামক গ্রামে ছিলেন, দেরাদুনের পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। তেহ্‌রির দেওয়ান দেরাদুন হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডাক্তার ম্যাক্‌লারেনের নামে একখানি অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নে গঙ্গাধর মহারাজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে স্বামীজী ও শরৎ মহারাজ এবং সান্যাল মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী শুনিয়া ডাক্তার ঠাকুরের শিষ্যগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন।

এখানে স্বামীজী হৃদয় বসু নামক তাঁহার একজন কলেজের সহপাঠীর সাক্ষাৎ পান, ইনি খ্রীষ্টিয় ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার বাড়িতে প্রায়ই অনেক খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক আসিতেন। স্বামীজী সেখানে তাঁহাদের সহিত আলোচনায় যোগ দিতেন, তাহাতে তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর জ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাধর মহারাজ একটু সুস্থ হইলেই স্বামীজী তাঁহাকে এলাহাবাদে একজন বন্ধুর বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। সান্যাল মহাশয় তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে সাহারাণপুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আবার দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলেন ও সকলে একত্র হইয়া হৃষিকেশে রওনা হইয়া গেলেন।

হৃষিকেশে আসিয়া তাঁহারা ঝাড়ি নামক স্থানে ঘাস দিয়া ছাওয়া একখানি

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হৃষিকেশের গঙ্গার ধারে এইরকম অনেক ঘর আছে, পরিব্রাজক সাধু আসিয়া তাহাতে যতদিন ইচ্ছা বাস করিতে পারেন। স্বামীজী এখানে আসিয়া আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অসুখ এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহার জীবনসংশয় বলিয়া মনে হইল।

নদীর চরে খড়ের ঝুপড়ি ঘর,—চিকিৎসার কোন উপায়ই নাই, স্বামীজীর গুরুভাইরা ও সান্যাল মহাশয় বিষম চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একজন সাধু ঔষধ দিয়া সে যাত্রা স্বামীজীকে আরাম করেন।

স্বামীজী যেমন একটু সুস্থ হইলেন, অমনি বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি একা যাইব, কেহ আমার সঙ্গী হইও না।" স্বামীজীর ইচ্ছায় বাধা দিবার কাহারও সাধ্য ছিল না, সুতরাং তাঁহারা মর্মাহত হইয়াও আপত্তি করিলেন না। স্বামীজী চলিয়া গেলেন ; ব্রহ্মানন্দ স্বামী তখন কনখলে ছিলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে একত্রে সাহারাণপুরে গিয়া উকীল বঙ্কুবিহারী বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

সেখানে গিয়া বঙ্কুবিহারীবাবুর নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী মিরাট গিয়াছেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকেও সঙ্গে নিয়া গিয়াছেন এবং ডাক্তার ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়িতে উঠিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই ব্রহ্মানন্দ স্বামী সদলে মিরাট রওনা হইলেন।

মিরাটে গিয়া সকলে একত্র হইলেন, মিরাট যেন আনন্দের নিকেতনে পরিণত হইল। প্রথমে ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রভৃতি শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় উঠিয়াছিলেন, (এই যজ্ঞেশ্বব বাবুই পরে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়া ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন) পরে শেঠজীর বাগানবাড়িতে সকলেই একসঙ্গে রহিলেন। এই সময় বুড়ো গোপাল দাদাও (স্বামী অদ্বৈতানন্দ, ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই প্রবীণ ছিলেন) আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

মিরাটে তিনমাস সকলে একসঙ্গে ধ্যান, জপ ও শাস্ত্র অলোচনায় বেশ আনন্দেই কাটাইলেন, কিন্তু স্বামীজী আর এভাবে সময় কাটাইতে চাহিলেন না, প্রিয়জন সঙ্গে আনন্দে সময় কাটাইবার তাঁহার এখন অবসর নাই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীর শেষাশেষি তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে, "এবার আমি একা যাব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে নেব না, তোমরা কেহ আমার অনুসরণ কোর না।" এই বলিয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে লইয়া দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন।

তাঁহারাও আর মিরাটে থাকিতে পারিলেন না, স্বামীজী-হীন নিরানন্দ স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারাও দিল্লী রওনা হইলেন এবং সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দাস শেঠের বাড়ি স্বামীজী আছেন জানিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইভাবে তাঁহাদের উপস্থিত হইতে দেখিয়া স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন। বোধহয় আনন্দিতও হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দগত-প্রাণ তাঁহার এই সব গুরু-ভ্রাতা, কি করিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কঠোর হইবেন? তবু তাঁহাকে কঠোর হইতেই হইল। তিনি দিল্লীত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের এই অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহার আর অনুসরণ না করেন।

স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা

দিল্লী হইতে স্বামীজী রাজপুতানা ও বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া রামেশ্বরে যান।

স্বামীজী রামেশ্বর হইতে পদব্রজেই কন্যাকুমারী গিয়া আবার পদব্রজেই পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। শরীর অবসন্ন, আর হাঁটিবার শক্তি নাই। তাই তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম লইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী পণ্ডিচেরী আসেন। এখানে তাঁহার মাদ্রাজের ডেপুটি অ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সংগে আবার দেখা হইয়া গেল। ইতিপূর্বে ইঁহার সংগে ত্রিবান্দ্রামে স্বামীজীর পরিচয় হইয়াছিল।

মন্মথবাবু তাঁহাকে পথের মধ্যে দেখিতে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। স্বামীজী মাদ্রাজ যাইতে চাহেন শুনিয়া মন্মথবাবু বলিলেন তিনিও কয়েকদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ যাইবেন, এই কয়দিন যেন স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে অনুগ্রহ করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। মন্মথবাবুর পণ্ডিচেরীর কাজ হইয়া গেলে দু'জনেই একসংগে মাদ্রাজ ফিরিতে পারিবেন আর মাদ্রাজে স্বামীজী যে কয়দিন থাকিবেন যেন তাঁহারই বাড়িতে থাকেন। স্বামীজী মন্মথবাবুর এই অনুরোধে সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে মন্মথবাবু তাঁহার মহীশূরবাসী এক বন্ধুকে পত্রে স্বামীজীর মাদ্রাজ যাওয়ার কথা জানাইলেন এবং কোন্ তারিখে স্বামীজী রওনা হইবেন তাহাও জানাইয়া দিলেন। মহীশূরবাসী বন্ধুটি সেই সংবাদ তাঁহার মাদ্রাজী বন্ধুদের জানাইলেন। স্বামীজী মাদ্রাজে পেঁাছিয়া দেখিলেন ১৩।১৪ জন মাদ্রাজী যুবক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে।

এইভাবে মাদ্রাজে পদার্পণ করিয়াই ওখানকার কয়েকজনের সংগে তাঁহার পরিচয় হইল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজী মাদ্রাজ যান এবং প্রায় একমাস মন্মথবাবুর বাড়ি থাকেন। এই একমাসের মধ্যে চতুর্দিকেই তাঁহার সম্বন্ধে এইভাবে প্রচারিত হইল যে, "এক বাংগালী সাধু এসেছেন, তিনি খুব ভাল ইংরেজী জানেন।" এই "ইংরেজী-জানা" সাধুটিকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রতিদিন মন্মথবাবুর বাড়ি পরিচিত ও অপরিচিত বহু লোকের আগমন হইতে লাগিল। অনেক মাদ্রাজী যুবক স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিল, স্বামীজী এই সকল মাদ্রাজী যুবকের আন্তরিকতার বার বার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই যুবকগণের মধ্যে একজন—তাঁহার নাম সিংগারা ভেলু মুদালিয়ার, ইনি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন। যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয় তখন ইনিই তাঁহার প্রথম ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাংলাদেশ স্বামীজীর জন্মভূমি, কিন্তু বহুদূর মাদ্রাজের অধিবাসী এই তরুণগণ যে ভাবে যত সহজে স্বামীজীকে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল তাঁহার নিজের দেশের লোকেও হয়তো ঠিক সে ভাবে পারে নাই। অবশ্য এখানে আমি তাঁহার গুরুভাইদের কথা বলিতেছি না। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন একদল অল্পবয়স্ক বিলাসবর্জিত, কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়সংকল্প স্বাস্থ্যবান তরুণ, উচ্চকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য যাহারা উৎসাহী হইবে এবং তাঁহার সহকর্মী হইতে পারিবে। মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বামীজী আমেরিকা যাইবেন এই সংবাদটি জানা মাত্র তাহারা মহা উৎসাহের সঙ্গে চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ হইল। কিন্তু স্বামীজী ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "বেশ, চাঁদা তুলেছ ভাল কথা। এখন এ টাকা গরীবদের দিয়ে দাও। যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তা হ'লে আমেরিকা যাওয়ার খরচ আপনা থেকেই আসবে।"

এই সময় হায়দ্রাবাদ হইতে তাঁহার কাছে হায়দ্রাবাদ যাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিল। স্বামীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার হায়দ্রাবাদ যাইবার দিন স্থির হইল। মন্মথবাবু তাঁহার হায়দ্রাবাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। মধুসূদনবাবু ছিলেন হায়দ্রাবাদের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জীনিয়র।

হায়দ্রাবাদ স্টেশনে পৌঁছিয়া স্বামীজী দেখিলেন প্রায় পাঁচশো লোক স্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার হিন্দু, মুসলমান ও পার্শি প্রভৃতি সকল জাতির লোকই আছেন। মধুসূদনবাবুর ছেলে কালীচরণবাবু আসিয়াছিলেন স্টেশনে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য। কালীচরণবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর ইতিপূর্বেই কলিকাতায় পরিচয় হইয়াছিল, তিনিই স্টেশনে উপস্থিত সকলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন।

মধুসূদনবাবুর বাংলোয় পৌঁছিয়া স্বামীজী দেখিলেন যে, সেখানেও অনেকে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইহার পর দিন একদল ছাত্র ও অধ্যাপক আসিয়া তাঁহাকে মহবুব কলেজে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সেদিন ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারী, স্বামীজী ১৩ই ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা দিবার দিন স্থির করিলেন।

সেইদিনই তিনি নবাব বাহাদুর সার খুরসিদ জাহরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর

এক পত্র পাইলেন, তাহাতে জানাইয়াছেন নবাব বাহাদুর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক, তিনি যদি সময় করিয়া একবার তাঁহার প্যালেসে যান তাহা হইলে নবাব বাহাদুর বিশেষ সুখী হইবেন।

স্বামীজী শুনিলেন, নবাব বাহাদুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজে ধর্মপরায়ণ ও সকল ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ। স্বামীজী ১২ই ফেব্রুয়ারী কালীচরণবাবুকে সঙ্গে লইয়া নবাব বাহাদুরের প্রাসাদে গেলেন। নবাব বাহাদুরের সহিত আলোচনায় স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন, নবাব বাহাদুর একজন যথার্থ ধর্মপিপাসু ব্যক্তি এবং সকল ধর্মেরই কোন্‌টি সার কথা তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল আছে। নবাব বাহাদুরের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সেদিন স্বামীজী খুশীই হইয়াছিলেন। আলোচনা শেষে নবাব বাহাদুর স্বামীজীকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁর আমেরিকা যাওয়ার খরচের জন্য এক হাজার টাকা দিতে চান। কিন্তু স্বামীজী টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "এখনও সময় হয়নি। যখন ভগবানের নির্দেশ পাব তখন আপনাকে জানাবো।"

স্বামীজীর এইভাবের কথায় মনে হয়, তিনি তখন পর্যন্ত মনের মধ্যে একটি বিশেষ প্রেরণা লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী সকালে নিজাম বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী সার আসমান সাহ, মহারাজা নবেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং মহারাজা সিউরাজ বাহাদুর স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

সেইদিন বৈকালে মহবুব কলেজে সাধারণ সভায় স্বামীজী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'my mission to the west' অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যে আমার প্রচারকার্য। ভারতবর্ষে এইটি স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা। বক্তৃতা-সভা লোকে পরিপূর্ণ, তাহার মধ্যে অনেক ইংরেজও ছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রতনলাল, ইনি হায়দ্রাবাদের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই বক্তৃতা শুনিয়াছিল এবং বক্তৃতা শেষে সকলে বার বার করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দন জানাইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল যে, এমন অপূর্ব বক্তৃতা এর আগে কখনও তাহারা শুনে নাই।

পরের দিন স্থানীয় কোমবাজার নামক স্থানের ব্যাঙ্কারগণ শেঠ মতিলালের নেতৃত্বে তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতে আসিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা আমেরিকা যাইবার জন্য অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিও জানাইলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিলেন এবং আবার মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। এবার স্বামীজী শ্রীশ্রীমার নিকট আমেরিকা যাইবার কথা জানাইলেন এবং তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন।

অতি শীঘ্র শ্রীশ্রীমার পত্রের উত্তর আসিল। মা অনুমতি দিয়াছেন এবং

সস্নেহ আশীর্বাদের সঙ্গে ঠাকুরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। এই পত্র পাইবার পর স্বামীজীর মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না।

এবার মাদ্রাজী শিষ্যগণ অর্থসংগ্রহের জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগিলেন। আলাসিঙ্গা পেরুমল নামক একজন শিষ্য এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কেবল মাদ্রাজেই নহে, মহীশূর, রামনাদ এবং হায়দ্রাবাদে গিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরকমে দুই মাসেই টিকিট কিনিবার টাকা উঠিয়া গেল।

কিন্তু বাধা পড়িল। খেতরির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বাবু জগমোহন লাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন খেতরি হইতে মাদ্রাজে। মহারাজা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য। দুই বৎসব আগে আবুপাহাড়ে গিয়াছিলেন খেতরির মহারাজা, সঙ্গে ছিলেন জগমোহন লালজী। স্বামীজীও গিয়াছিলেন সেই সময় আবুপাহাড়ে। জগমোহন লালজীই স্বামীজীকে মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং মহারাজা স্বামীজীকে লইয়া খেতরি গিয়াছিলেন।

মহারাজার কোন সন্তান ছিল না। মহারাজা সেজন্য স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, স্বামীজী আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি খেতরি ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। এখন জগমোহনলালজী খবর আনিয়াছেন যে, স্বামীজীর আশীর্বাদেই রাজার সন্তান হইয়াছে, আর তার জন্মোৎসবে স্বামীজী যদি উপস্থিত থাকিয়া আশীর্বাদ না করেন তবে সে মঙ্গল অনুষ্ঠান সার্থক হইবে না। তাই এতদূর হইতে জগমোহন লালজী আসিয়াছেন স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য।

স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "কেমন করে তা সম্ভব হবে? ৩১শে মে তারিখে আমার আমেরিকা রওনা হ'বার দিন ঠিক হয়েছে। আর মাত্র এক মাস সময় আছে। এর মধ্যে আমাকে সব গোছগাছ করে নিতে হবে, এখন আমি কি ক'রে খেতরি যাই!"

কিন্তু জগমোহন লালজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "আপনি যদি না যান রাজাবাহাদুর মর্মাহত হবেন। আপনার আমেরিকা যাওয়ার জন্য কোন ভাবনা নেই, সে সমস্তই ঠিক হ'য়ে যাবে।"

এই আন্তরিক আগ্রহ স্বামীজী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে খেতরি যাইতেই হইল।

স্বামীজী গিয়া খেতরি পেঁৗছিলেন, দেখিলেন উৎসবসজ্জায় খেতরি সুসজ্জিত। চারিদিকে আনন্দের কলরব। অনেক রাজা মহারাজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দরবার ঘরে জাঁকজমকের সীমা নাই। স্বামীজী দরবার ঘরে প্রবেশ করামাত্র মহারাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজী আসন গ্রহণ করিবার পর আবার সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শিশু রাজকুমারকে দরবার ঘরে আনা হইল এবং স্বামীজী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

উৎসব শেষে স্বামীজী বম্বে রওনা হইলেন, রাজা বাহাদুর জগমোহন লালজীকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন আমেরিকা যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। পোশাক প্রভৃতি ইতিমধ্যেই তৈয়ারি হইয়া গিয়াছিল।

আবু রোড স্টেশন! আবুপাহাড় স্বামীজীর খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাই এখানে তিনি একদিনের জন্য নামিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল সেদিন সেখানে থাকিয়া জায়গাটি আর একবার ঘুরিয়া দেখিবেন। ঘটনাক্রমে এইখানেই তাঁহার দুই গুরুভাইয়ের সহিত দেখা হইয়া গেল।

ইঁহাদের একজন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ঠাকুর যাঁহাকে রাখালরাজা বলিতেন আর স্বামীজী বলিতেন রাজা। আর একজন স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইঁহারা আসিয়াছিলেন তীর্থভ্রমণে, পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন একজন গৈরিকধারী দীর্ঘকায় সাধু উচ্চৈঃস্বরে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছেন। শ্লোকটি এইঃ—

"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং।
প্রতিষ্ঠাং শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

কেন যে স্বামীজী এ সময় আপন মনে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন কে জানে? সম্প্রতি খেতরির রাজদরবারে তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাই স্মরণ করিয়া অথবা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়াই তাঁহার মনে এই শ্লোকটি সে সময় উদয় হইয়াছিল কিনা তাহা তিনিই জানেন

ব্রহ্মানন্দ স্বামী আগাইয়া আসিলেন এবং আমেরিকা রওনা হইবার পূর্বে তিন গুরুভাইয়ের মিলন হইল। স্বামীজী রাখাল মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

স্বামীজী আমেরিকা যাইবার কথা সমস্তই জানাইলেন এবং ছোটছেলের মত পরম উৎসাহে নিজের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "রাজা, দেখছিস্ কি? এই এর জন্যেই এসব হচ্ছে। দেখ্‌বি, আরও কত কি হবে। মেচে যাবে, মেচে যাবে, ঠাকুরের নাম আর প্রেম।" এই 'মেচে' যাওয়া অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়া কথাটি প্রায়ই স্বামীজী ব্যবহার করিতেন।

এই সাক্ষাৎকারে তাঁহারা তিনজনেই খুব আনন্দিত এবং আরও একটি লাভ হইয়াছিল যে, বাংলায় তাঁহার গুরুভ্রাতাদের কাছে শীঘ্রই সমস্ত সংবাদ ও তাঁহার যাহা কিছু নির্দেশ সবই পোঁছিয়া যাইবে। এই দেখাই তাঁহার বাংলা মায়ের কাছে বিদায় গ্রহণ।

সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার আসিয়াছে বিদেশ যাত্রার পালা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে এক স্মরণীয় দিন। এইদিন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করেন।

এই সময় বাংলা দেশে আলমবাজার মঠে স্বামীজীর গুরুভাইরা কে কি

অবস্থায় আছেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান" নামক গ্রন্থ হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পূজনীয় গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রত্যেক গুরুভ্রাতার সম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন ভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের নিত্য সঙ্গী, সুতরাং তাঁহার এই বর্ণনার বিশেষ একটি মূল্য আছে।

তিনি লিখিয়াছেন,

"বরানগরের মঠে ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবকেরা যে শুধু মেঝেতে বা একটা ছেঁড়া চ্যাটাইতে পড়িয়া থাকিতেন, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া সেই চাল সিদ্ধ করিয়া একটা কাপড়ে ঢালিয়া সকলে মিলিয়া খাইতেন, এই যে কৃচ্ছ্রসাধনা—ইহা লইয়া বাহিরের সকলেই নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। * * কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন এখন যে শক্তি বিকীর্ণ করিতেছে তাহা এই বরানগর ও আলমবাজারের মঠেই উদ্ভূত হইয়াছিল।" (৯১ পৃঃ)

পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা ছিল, এই রকম ভালবাসা জগতের ইতিহাসে খুবই অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে আছে যে, যীশুর শিষ্যদের ভিতর পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ভালবাসা ছিল। চৈতন্যের পারিষদগণের মধ্যেও এইরূপ একটা প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।

কিন্তু এই সকল হইল গ্রন্থের কথা, চোখে দেখা বা অনুভব করা যায় না। কিন্তু বরানগর মঠে ও আলমবাজারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আত্মগোষ্ঠীর ভিতর ত্যাগী ও গৃহী উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা দেখা গিয়াছিল। এই জীবন্ত ভালবাসাই ছিল মঠের প্রাণস্বরূপ। * * * এই ভালবাসার ভিতর এক মহা আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা ভাষা দিয়া বুঝাইবার নয়, যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই এটা বুঝিতে পারিবেন। (১০২ পৃঃ)

আলমবাজারের মঠ সম্বন্ধেঃ—

"শীতের প্রথমে বরানগর মঠ হইতে আলমবাজার মঠে গমন করা হইল। * * * মঠ টিঁকিবে না উঠিয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া বরানগরে অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া মঠে অপর কেহ বিশেষ যাইতেন না। * * * পরে আলমবাজার মঠের সময় সকলে যখন দেখিল যে এই ঝড় ঝাপ্‌টার ভিতর দিয়া এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া এই কয়েকটি যুবক অবিচলিত, একচিত্ত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। * * * লোকে মনে করিল ইহা একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইবে। এই সময়ের যাঁহারা গৃহী ভক্ত তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সময়ের নহেন—পরবর্তী সময়ের * * * এই সময় কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানের লোকের মনে প্রথম যেমন একটা বিদ্রূপের ভাব ছিল এখন তা তিরোহিত হইয়া গেল। এই সময় গিরিশবাবু অবসর পাইলেই মঠে গিয়া সারা দিনটা কাটাইয়া আসিতেন। এই সময় একখানা নূতন শতরঞ্চি আসিল; একটি ভাল লম্প আসিল; আর এটা ওটা জিনিসও আসিতে লাগিল।" (১১৩ পৃঃ)

তুলসী মহারাজের কথাঃ—

"বরানগর মঠ স্থাপনের কয়েক মাস পরেই তুলসী মহারাজ আসেন। তিনি তখন যুবা, কৃশ ও দৃঢ়কায় শরীরবিশিষ্ট, অতি মিষ্টিভাষী, সর্বদা হাসিমুখ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি শশী মহারাজের একরূপ ডানহাত হইয়া রহিলেন। কি হান্ডামাজা, কি পুকুর হইতে জল আনা—যে কাজই হোক্ না কেন তুলসী মহারাজ আগুয়ান হইয়া করিতেন। রাত্রে অনেক সময় তিনি রুটি সেঁকিতেন। এই রুটি সেঁকার কথা বড় আনন্দদায়ক। দু'তিনজন লোক ময়দা মাখিতেছে ও বেলিতেছে। একটা কেরোসিন তেলের টিনের উপর একজন বসিয়াছেন, উনুনে এক একখানা রুটি সেঁকা হইতেছে এবং যে যখন বসিয়াছেন তখন গরম গরম রুটি একখানা করিয়া দেওয়া হইতেছে। * * সে রুটি সেঁকা ও রান্নাঘরে গিয়া জড় হওয়া বড় আনন্দের জিনিস ছিল, হাতেতেও যেমন সকলে কাজ করিতেছে, মুখেতেও তেমনি সৎচর্চা ও সৎ আলোচনা চলিতেছে। * * তরকারি যাই হউক না কেন গরম রুটি, নুন লঙ্কা আর এই সৎচর্চা ও মাঝে মাঝে খুব হাসি তামাসা। * * হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া মহা কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা চলিয়াছিল।" (১২৪ পৃঃ)

"তুলসী মহারাজ একদিকে নিজের জপধ্যান করিতেছেন, আবার সময় পাইলে পড়াশুনাও করিতেছেন। * * আবশ্যক হইলে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিতেছেন, ঝাঁট দিতেছেন এবং বাজারে গিয়া ঝুলি করিয়া আনাজ তরকারিও কিনিয়া আনিতেছেন। আলমবাজারের বুড়ির দোকান হইতে টিকে কিনিয়া ঝোড়াটা নিজে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেন। আবার এদিকে সমস্ত বাসন, হান্ডা চট্‌পট্ করিযা মাজিয়া ফেলিতেন। * * * ভিতরের বাড়ির খিড়কির দিকে একটা পুকুর ছিল। তুলসী মহারাজ এক কলসী জল কাঁধে আর এক কলসী জল হাতে লইয়া সমস্ত নীচের বাড়িটা মাড়াইয়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উপরকার খোলা ছাদের দক্ষিণ দিকে যে পায়খানাটা—সেইটি ধুইয়া ফেলিতেন এবং বড় বড় মাটির গামলাতে জল ভরিয়া রাখিতেন। * * আবার এর ভিতরেও তিনি রান্নাঘরের কাজ করিতেন, কুট্‌নো কুটিতেন। আবশ্যক হইলে ঐদিকে রোগীর সেবাও করিতেন।" (১২৬ পৃঃ)

মঠের প্রথম দিককার কথা সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবুর পুস্তকে যে ছবিটি পাওয়া যায় তাহার কিছু অংশ এখানে তুলিয়া দিতেছিঃ—

"বরানগর মঠে প্রথমে সকলের এক একখানা করে কাপড় ছিল, আর জোড়া কতক চটিজুতা ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেই পায়ে জুতা দেওয়া ত্যাগ করিলেন। * * * তারপর কাপড়খানা দু'টুক্‌রা করিয়া বহির্বাস করিয়া পরিতে লাগিলেন এবং ভিতরে একটা কৌপিন থাকিত। ক্রমে বহির্বাস ছিঁড়িয়া গেল এবং অবশেষে কৌপীনও ছিঁড়িয়া গেল। তখন বাড়ির ভিতর কৌপীন পরাও ছাড়িয়া দিলেন। * * আমি বিকালবেলা যখন যাইতাম, প্রথম প্রথম সকলকে উলঙ্গ দেখিয়া লজ্জিত হইতাম। * * কিন্তু সকলকেই উলঙ্গ দেখার দু'চার মিনিট পরেই আর বিশেষ কিছু সঙ্কোচ রহিল না, স্বাভাবিকভাবেই বেশ

কথাবার্তা হইতে লাগিল। * * তখনকার দিনে ঈশ্বর লাভই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য, আর বাকী সবই ছিল তুচ্ছ।" (৪১ পৃঃ)

আলমবাজার মঠে স্বামীজী বিলাত যাইবার পর ক্রমশ নানা দেশ হইতে জনসমাগম হইতে লাগিল। বোম্বাই ও আল্‌মোড়া হইতেও লোক আসিতে লাগিল। মাদ্রাজ হইতে শ্রীনিবাস সামান্নিয়া আয়ার নামে একজন মাদ্রাজী যুবক আলমবাজারে আসিলেন, তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার সন্ধানে তাঁহার আত্মীয়-গণও আলমবাজারে আসেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বামীজীব ভক্তগণের সহিতও পত্রালাপ চলিতে লাগিল। খেতরির রাজা অজিত সিংহও পত্র লিখিয়া মঠের সাধুগণের সংবাদ লইতেছিলেন। গুজরাটের জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস শীতকালে অহিফেন অনুসন্ধান সমিতির সদস্য হইয়া কলিকাতায় আসেন, তিনি আলমবাজার মঠে গেলেন এবং সাধুদের ভাণ্ডারা দিলেন। মঠবাসিগণের মনে এখন তাঁদের এতদিনের তপস্যালব্ধ শক্তি জনকল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য একটা প্রেরণাও জাগ্রত হইল।

স্বামীজী যখন ভারত পর্যটনে বাহির হন তখন তাঁহার গুরুভাইরা মাঝে মাঝে তাঁহার সংবাদ পাইতেন। এখন তিনি সমুদ্রবক্ষে জাহাজে চলিয়াছেন, সেখান হইতে তাঁদের মাঝে মাঝে যে সকল চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেশের উপর যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, দেশের চিন্তা সর্বদাই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। কলম্বো, মালয়, পেনাং তারপর সিঙ্গাপুর। এগুলি বৃহৎ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ। চারিদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত সুমাত্রা দ্বীপের সৌন্দর্যে স্বামীজী মুগ্ধ হইলেন। হংকং বন্দরে জাহাজ তিনদিন ছিল। স্বামীজী জাহাজ হইতে নামিয়া প্রায় আশি মাইল দূরে ক্যাণ্টনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এক বিরাট বৌদ্ধমন্দির আছে। চীনের স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য ও কারুশিল্প প্রভৃতি অতি অপূর্ব। দেশবাসী শ্রমশীল কিন্তু অতি দরিদ্র। বিদেশীর শোষণে চীনের অর্থসম্পদ যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী লিখিতেন,—

"চীন ও ভারতবাসী প্রগতির পথে যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তার একমাত্র কারণ এই অতিশয় দারিদ্র্য। একজন সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ চীন উভয়ের অবস্থাই সমান। যারা দৈনিক খাদ্য সংগ্রহই করিতে পারিতেছে না তাহাদের আর কিছু ভাবিবার অবসর কোথায়?"

চীনের পর জাপান। ১৮৯৩ খৃঃ জুলাই মাসে স্বামীজী জাপানে পৌঁছাইলেন। নাগাসাকি বন্দরে জাহাজ অনেকক্ষণ থামে। এই অবসরে স্বামীজী নাগাসাকি শহর ঘুরিয়া দেখিলেন, কিন্তু অন্যান্য শহর দেখিলেন, কিন্তু অন্যান্য শহর দেখিতে হইলে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়া স্থলপথে যাইতে হইবে। তাই স্বামীজী তখনকার মত জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং ওসাকা, কিয়োটো এবং টোকিও তিনটি প্রধান শহরই ঘুরিয়া দেখিলেন। অনেক

বৌদ্ধমন্দিরও দর্শন করিলেন। সেইসব মন্দিরের দেয়ালে প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা আছে দেখিতে পাইলেন।

জাপান দেখিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়াছিলেন। জাপান তখন পূর্ণবেগে উন্নতির পথে চলিয়াছে। স্বামীজী তাঁহার পত্রে জাপান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,--

"বর্তমানকালে কি কি দরকার জাপানীরা তা বুঝেছে এবং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। এদের দেশে সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। এদের যে কামান তা এদেরই একজন কর্মচারীর আবিষ্কার। সবাই বলে ঐ কামান অন্য যে কোন জাতির উৎকৃষ্ট কামানেরই সমতুল্য। আর তারা তাঁদের নৌবলও দিনে দিনে বাড়াচ্ছে।"

নিজের দেশের জন্য জাপানীরা যেভাবে প্রাণপণ প্রয়াসে আগাইয়া চলিয়াছে, —অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব নৈপুণ্য ও কর্মশীলতা, অপরিসীম চেষ্টা ও একান্ত আগ্রহ, ইহার সহিত ভারতের তুলনা যদি করা যায়, তবে কি মনে হয়? স্বামীজী তুলনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিঠিতে লিখিয়াছেন,—

"আর তোমরা কি কোরছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোকছো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকাওগে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি হয়েছে। তোমরা যদি দেশ ছেড়ে বাইরে যাও, তাহলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয় কর্‌ছো। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মুখীর গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ!! শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন কোর্‌ছোই বা কি? আহাম্মুখ, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি কোরছো। ইরোপীয় মস্তিষ্কজাত এক কণামাত্র,—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদ্‌হজম খানিকটা উদ্‌গার তুলছো। তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকেই পড়ে আছে, না হয় বড়জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কোর্‌ছ। এই ভারতবর্ষের যুবকদের সবচেয়ে উঁচু দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের পাশে একপাল ছেলে—তার বংশধর—'বাবা খাবার' 'বাবা খাবার দাও' কোরে চীৎকার কোর্‌ছে। বলি সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে— যে ঐ গাউন, বই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারে না?" * * *

"এসো মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতই কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি নিজের দেশকে ভালবাস? মানুষকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা সকলে ভাল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক। এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।"

স্বামীজীর এই জ্বালাময়ী উক্তিই জাগাইয়া তুলিয়াছিল বাংলার ছেলেদের স্বাদেশিকতা ও বিপ্লবের ইহাই গোড়ার কথা।

স্বামীজী ঘরকুনোদের ঘরছাড়া করিবার জন্য নিজেই ঘরছাড়া হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণার উৎস হইতে যে শক্তি সাকার মূর্তি ধারণ করিয়াছিল তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ। যার মূল মন্ত্র ছিল স্বামীজীর সেই অগ্নিময়ী বাণী, সেই পথনির্দেশ,

"যাও বেরিয়ে পড় ঘরের কোণ থেকে। যাও, ভারতের গ্রামে গ্রামে, নিজের চক্ষে তাদের দুর্দশা দেখ, তাদের বোঝ, তাদের মুখে অন্ন দেবার ব্যবস্থা কর, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর। উচ্চবর্ণের হিন্দু অন্ধ কুসংস্কারবশে মূঢ়ের মত যাদের নীচ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, পঞ্চম বলে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে রেখেছে, সহস্র বৎসরের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে যারা আজ মানুষ হয়েও প্রাণহীন পশুর পদবীতে গিয়ে পেঁাছেছে তাদের উদ্ধার করবার জন্য আমরণ চেষ্টা কর। নারায়ণজ্ঞানে তাদের সেবা কর। কৃতার্থ হও সেবা করে।"

স্বামীজী ভারত পর্যটনের সময় দেশে দেশে জনগণের যে দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মাদ্রাজে 'পঞ্চম' নামক হীনবর্ণের উপর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে নৃশংস ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এই সকল উক্তির ভিতর সেই মর্মদাহই প্রকটিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,

"ওরাই তো ভারতের প্রাণ, ওরা যদি না জাগে তা হ'লে ভারত জাগবে কেমন করে?"

তিনি আরও বলিয়াছেন,

"ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়সঙ্কল্পের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। খবরের কাগজে হুজুগ করা নয়। সর্বদা মনে রাখ্তে হবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

আমেরিকায় বিবেকানন্দ

১৮৯৩ খৃণ্টাব্দের অগস্ট মাসে স্বামীজী আমেরিকা পৌঁছিলেন। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাংকুভার বন্দরে জাহাজ ভিড়িল—এখান হইতে ট্রেনে চিকাগোয় যাইতে হইবে।

আমেরিকা পৌঁছাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে এখানে আসিয়াই নানা রকমে বিপন্ন হইতে হইল। প্রথম, শীতবস্ত্রের অভাব। তাঁহার যে গাত্রবস্ত্র ছিল, আমেরিকার শীত সে বস্ত্রে নিবারিত হয় না। অর্থও ছিল যৎসামান্য, আমেরিকায় খরচ খুব বেশি। কোন বড়লোকের কাছে পরিচয়পত্রও ছিল না, হোটেলের খরচ দিয়া থাকিতে হইলে খুব শীঘ্রই তাঁহার হাতে যা টাকা আছে, তাহা ফুরাইয়া যাইবে, একথা স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক, তিনি ট্রেনে চিকাগো পৌঁছিলেন। সে সময়ে চিকাগো শহরে 'ওয়ার্ল্ডস্ ফেয়ার' নামে এক বিরাট মেলা বসিয়াছে। বার দিন স্বামীজী চিকাগো ছিলেন এবং খবর লইয়া জানিতে পারিলেন যে, ধর্ম মহাসভা আরম্ভ হইবার এখনও অনেক দেরি আছে, আরও শুনিলেন, ডেলিগেট লইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন আর নূতন কোন ডেলিগেট লওয়া হইবে না।

এই সময় আবার একদল শত্রুও তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইলঃ—

"টাকা আমার কাছে অতি অল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই প্রায় সমুদয় খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিল, আমার কেবল গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্রই ছিল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। এদেশে ভিক্ষা করিবার উপায় নাই, যদি আমি ভিক্ষায় বাহির হই তাহার ফল এই হইবে যে, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। থিয়োসফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন—"শয়তানটা শীঘ্র মরিবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁচা গেল।"

যাহা হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। দারুণ বিপন্ন হইয়াও বীর বিবেকানন্দ মনের বল হারাইলেন না। তিনি আপাতত চিকাগো ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে যাওয়াই ভাল বলিয়া মনে করিলেন এবং বোস্টন শহরে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার পরিচ্ছদ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, ট্রেনে তাঁহার এক সহযাত্রিনী মহিলা কৌতূহলবশে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। এই

মহিলাটি বোস্টন শহরেরই অধিবাসিনী, তিনি বোস্টনে স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। সম্ভবত এই ভারতীয় যোগীকে তাঁহার বাড়িতে নিয়া গিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট কিছু বাহবা পাইবেন, এই ইচ্ছাই তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু স্বামীজী আতিথ্য গ্রহণে আপত্তি করিলেন না, এবং বোস্টনে গিয়া সেই মহিলাটির পল্লী-নিকেতনে আপাতত একটি আশ্রয় হিসাবে থাকিবার জন্য সম্মত হইলেন।

অতি শীঘ্রই তাঁহার আগমন-সংবাদে বহু কৌতূহলী দর্শকের জনতায় পল্লীভবনটি জমজমাট হইয়া উঠিল। যদিও অনেকেই নিছক কৌতূহলবশেই স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের অনেকেরই মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়া যাইত। হিন্দুধর্মের আলোচনা তো দূরের কথা, বাইবেলের আলোচনাতেই তাঁহারা যেন নূতন সত্যের সন্ধান পাইতেন। এতদিন খ্রীষ্টীয় প্রচারকের মুখে তাঁহারা যেভাবে যীশুখৃষ্টের কথা শুনিয়াছেন, এ যেন তাহা হইতে অনেক নূতন ভাবের কথা,—শুষ্ক উপদেশ মাত্র নয়, যেন এক বাস্তব অনুভূতি।

বোস্টন শহরের সালেম নামক স্থানে এক মহিলা-সভায় তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। সেখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সংগে তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক, ইঁহার নাম মিস্টার রাইট। স্বামীজী চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগ দিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ধর্ম মহাসভার ডেলিগেট নির্বাচন কমিটির সভাপতির সংগে আমার পরিচয় আছে। আপনাকে যাতে ডেলিগেট করে নেওয়া হয়, সেজন্য আমি তাঁর কাছে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিচ্ছি। আর যাতে প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিগণের জন্য নির্ধারিত বাসগৃহে আপনি থাকবার ও আহারাদির সুবিধা পান সেজন্য বাসগৃহ ব্যবস্থাপক কমিটির কাছেও আমি একখানি চিঠি দিচ্ছি।' এই বলিয়া তিনি স্বামীজীর কাছে দুখানি অনুরোধপত্র দিলেন এবং চিকাগো যাইবার একখানি টিকিটও কিনিয়া দিলেন।

স্বামীজী আবার চিকাগো যাত্রা করিলেন, কিন্তু রাইট সাহেব ঠিকানা লিখিয়া যে শিলপটা দিয়াছিলেন, পথে বেলগাড়িতে তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না; একজন সহযাত্রী তাঁহাকে ঠিকানায় পেঁছাইয়া দিবেন, কিন্তু চিকাগো স্টেশনে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকেও হারাইয়া ফেলিলেন। তখন বড়ই বিপদে পড়িলেন। প্রকাণ্ড চিকাগো শহর, আর তিনি নূতন আগন্তুক, কোথায় খুঁজিয়া পাইবেন সেই আফিস যেখানে বাসগৃহ কমিটি আছে। অথবা ধর্ম-মহাসভার সভাপতি ডাক্তার কে এইচ ব্যারোর আফিসই বা কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবেন? চিঠিগুলি অবশ্য ছিল, কিন্তু তাহাতে ঠিকানা ছিল না। তবে শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে ব্যারোর আফিস এই কথাটি কেবল স্বামীজীর স্মরণ ছিল, তাই তিনি সেই দিকেই খোঁজ করিলেন। দেখিলেন সেদিকে অনেক

জার্মান বাসিন্দা আছে, কিন্তু তাঁহাদের কাছে কোন সন্ধানই পাইলেন না। এদিকে রাত্রি হইয়া আসিতেছে, কোন হোটেলেও তিনি জায়গা পাইলেন না।

রাত্রে অন্তত শুইয়া থাকিবার একটু জায়গা চাই। রেলওয়ে ইয়ার্ডে বড় বড় প্যাকিং বাক্স পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহারই ভিতর গিয়া আশ্রয় লইলেন। এইভাবে সে রাত্রি কোন রকমে কাটিল।

পরদিন ভোরবেলা। শীতে ও অনাহারে শরীর একেবারে অবসন্ন। হাঁটিয়া চলিবার শক্তি নাই, তবুও হাঁটিতে লাগিলেন। জায়গাটির নাম 'লেক শোর ডাইভ'। চিকাগোর এটি একটি সম্ভ্রান্ত পল্লী। দুই ধারে বড় বড় অট্টালিকা, পথচারিগণ নিজের নিজের কাছে যাতায়াত করিতেছে, স্বামীজীর দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করা দরকার মনে করিল না।

অবসন্ন দেহে স্বামীজী পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন, এমন সময় একজন সুবেশা মহিলা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ধর্ম-মহাসভার একজন প্রতিনিধি?"

এই মহিলাটি অনেকক্ষণ হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, ধর্ম-মহাসভার সদস্যদের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে, সেজন্য তিনি ধর্ম-মহাসভা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। মহিলাটির নাম মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেল।

ইনি স্বামীজীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রথমে তাঁহাকে নিজের বাড়ি লইয়া গেলেন তাঁহার স্নান ও আহারের জন্য। অতঃপর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটির আফিসে গেলেন। রাইট সাহেবের পত্র পাইয়া কমিটির সভাপতি তখনই স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার থাকিবার ও খাওয়ার ব্যবস্থাও ঠিক করিয়া দিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে মিসেস হেল যদি এভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীজীকে সাহায্য না করিতেন, তবে এত সহজে সমস্যার সমাধান হইত না। মিসেস হেল এবং তাঁহার স্বামী ও পুত্রকন্যাগণ সকলেই পরে স্বামীজীর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মসভার উদ্বোধনের দিন। 'হল অফ কলম্বস্' নামক বিরাট হলে বেলা দশটায় সভা আরম্ভের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। উচ্চ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন সভাপতি কার্ডিনাল গিবনস্, তিনি প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর সমবেত সঙ্গীতে সভামণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিরাট সভামণ্ডপ, পৃথিবীর নানা ধর্মমত ও তাহার শাখা-প্রশাখার প্রতিনিধিগণ এখানে সমবেত হইয়াছেন। এক সময় এই ধর্মমতের বিরোধে জগতে কতই না সংগ্রাম ও রক্তপাত হইয়াছে। ধর্মমতের দোহাই দিয়া কত মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। আজ আবার সেই বিভিন্ন ধর্ম-মতবাদের প্রতিনিধিগণ একই মিলনক্ষেত্রে একত্রিত হইয়াছেন। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, জুডা, কনফিউসান, জিণ্টো, মুসলমান, আহুরমুজদা ও খৃষ্টান এবং

ই'হাদের বিভিন্ন শ্রেণী। থিয়োজফি ও ব্রাহ্মধর্ম অবশ্য হিন্দু ধর্মেরই শাখা যদিও ই'হারা স্বতন্ত্র বলিয়াই নিজেদের সম্বন্ধে ঘোষণা করেন।

বিরাট সভামণ্ডপের দৃশ্যে স্বামীজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এক একজন প্রতিনিধি উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন আর সভার জনগণের কাছে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইতেছে। বাংলা দেশেরে প্রতিনিধি ছিলেন তিনজন। ব্রাহ্মধর্মের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মিস্টার চক্রবর্তী ছিলেন থিয়োজফির প্রতিনিধি এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিনিধি হিন্দু ধর্মের। প্রতিনিধিগণের মধ্যে স্বামীজীই সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, মাত্র উনত্রিশ বৎসর তাঁহার বয়স। প্রতিনিধিগণ সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন, বাংলা দেশের প্রতিনিধি মজুমদার মহাশয়ের বক্তৃতা বেশ ভাল হইয়াছিল, চক্রবর্তীর বক্তৃতা আরো ভাল হইয়াছিল। স্বামীজীর কোন বক্তৃতা প্রস্তুত করা ছিল না, তাঁহাকে যতবার বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হইতেছে ততবারই 'এখন নয়' বলিয়া সময় পিছাইয়া দিতেছেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে উঠিতেই হইল। উঠিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখন সেই দীর্ঘায়ত বীরত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্রীময় গৈরিকধারী মূর্তি দেখিয়া দর্শকগণ যেন সম্মোহিত হইয়া গেলেন। আর যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "আমার আমেরিকাবাসী ভাইভগিনীগণ" এই সম্বোধনে,—সেই সম্বোধনের ভিতর যে আত্মীয়তা ছিল, সেই আত্মীয়তার অনুভূতি যেন প্রত্যেক শ্রোতার মনকেই স্পর্শ করিল। তখন তুমুল করতালি-ধ্বনিতে কিছুক্ষণ সভাগৃহ মুখরিত হইতে থাকিল। এক মুহূর্তে, একটিমাত্র সম্বোধনে স্বামীজী আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর—সতেরো দিন এই ধর্ম-মহাসভাব অধিবেশন চলিয়াছিল। এই সতেরো দিনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় এক হাজার প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দিনই স্বামীজীকে কিছু না কিছু বলিতে হইত। তাহার কারণ, শ্রোতারা স্বামীজীর কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। সভার কর্তৃপক্ষ তাই স্বামীজীকে সকলের শেষে বলিবার জন্য আহ্বান করিতেন, যাহাতে শ্রোতারা ধৈর্য ধরিয়া শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

সেই একদিনের বক্তৃতায় চিকাগো শহর স্বামীজীর প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁর বক্তৃতাকালীন মূর্তির প্রতিচ্ছবি দেয়ালে দেয়ালে বিলম্বিত হইল, প্রত্যেক খবরের কাগজেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার বক্তৃতা ও বক্তৃতার অজস্র সুখ্যাতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সব কাগজের কাটিং স্বামীজী ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে এবং বাংলায় তাঁর গুরুভাইদের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর মত উল্লাসে অধীর হইয়া বলিলেন, "দেখছিস কি, মেচে যাবে, সব মেচে যাবে।" অর্থাৎ ঠাকুরের বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

আমেরিকার নানা স্থান হইতে আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। বিশাল যুক্ত-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ, আয়োয়া, ডেসময়নে, সেণ্ট লুই, ইণ্ডিয়ানাপলি, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড বাফেলো, বোস্টন, কেম্ব্রিজ, ব্যাল্টিমোর, ওয়াশিংটন,

ব্রুকলিন ও নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি সকল স্থানেই তিনি বক্তৃতা দিলেন এবং সর্বত্রই ভারতের গৌরব-গরিমা প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্যের জনগণের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ছিল, যে কাল্পনিক ধারণা ছিল, তাহার উপরে সত্যের আলোকপাত হইল।

আর তাঁহার স্বদেশ? তাঁহার দেশবাসী স্বামীজীর এই কৃতিত্ব সমগ্র ভারতবর্ষের কৃতিত্ব বলিয়াই গ্রহণ করিল, পাশ্চাত্ত্যের এই সফলতা সমগ্র প্রাচ্য ভূভাগেরই গ্লানি দূর করিয়াছে, এই ভাবই লোকের মনে উদয় হইয়াছিল। আলমবাজারের মঠে আনন্দের বন্যা বহিয়া গেল। শ্রীশ্রীমা শুনিলেন তাঁহার নরেনের এই জয়ের কাহিনী, এমনটা যে হইবে মা হয়তো সে কথা আগেই জানিতেন। নরেন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী জননীও শুনিলেন এই আনন্দ-সংবাদ, তাঁহার নরেন আজ জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ। আজ তাঁহার জীবন সার্থক, "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা!"

আবার এই সঙ্গে একদল ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরও সৃষ্টি হইল এবং সেই রকম হওয়াই অবশ্য জগতের নিয়ম।

এই সংবাদে মাদ্রাজে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা রহিল না। ভারতবর্ষের সর্বত্রই সেদিন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, এক সার্বজনীন আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখা দিল।

রামনাদের রাজা সেতুপতি ভাস্কর কেরাল স্বামীজীকে অভিনন্দন পাঠাইলেন। খেতরির মহারাজা তাঁহার দেশবাসীকে এই শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য এক প্রকাশ্য দরবার আহ্বান করিলেন, আর আবেগময় ভাষায় স্বামীজীর গুণকীর্তন করিলেন। তাঁহার দেশের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বামীজীর কাছে অভিনন্দন জানাইলেন।

মাদ্রাজেও এক বিরাট সভার আয়োজন হইল, স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি এই সভায় তাঁহার এই মহান সাফল্যের প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং সেই প্রস্তাবের অনুলিপি স্বামীজীর কাছে পাঠাইলেন।

দেশে দেশে যখন এইভাবে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, তখন তাঁহার নিজের জন্মভূমি কলিকাতায় কিভাবে অভিনন্দনের আয়োজন হইবে অনুমান করিলেই তাহা বুঝা যায়।

এই কলিকাতা, এখানে স্বামীজী ছেলেবেলায় খেলাধুলা করিয়াছেন, তাঁহার কত খেলার সঙ্গী আছেন এখানে, তাঁহার সহপাঠীরা আছেন, এবং আছেন বহু গুরুজন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ।

টাউন হলে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য এক বিরাট জনসভার আয়োজন হইল। এই সভায় সভাপতি ছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার এন এন ঘোষ, দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

টাকির রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাবু ক্ষেত্রনাথ মল্লিক এবং মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাহার মর্ম এইরূপঃ—

প্রথম প্রস্তাবে এই সভা স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম প্রচাররূপে মহান কার্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমেরিকার ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তাদিগকে এবং আমেরিকার নরনারীগণকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং তৃতীয় প্রস্তাবে এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবের অনুলিপি ডাক্তার ব্যারোজ, বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি আরুইন মেরি স্নেল ও স্বামীজীর নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ভারতবর্ষ বহুদিন পরাধীনতাব গ্লানি বহন করিয়া আসিতেছে, আজ তাহার জয়ের দিন। এ জয় অস্ত্রসমারোহ ও নরশোণিতপাতলব্ধ জয় নয়, এ জয় ভারতের মহান মানবতার জয়লাভ। এ-জয় কোন ব্যক্তিবিশেষের গৌরব লাভ নয়, এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি "অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা" এই মন্ত্রেব সাধক, দেশেব গৌরব বর্ধনের জন্য এই জয় তিনিই অর্জন করিয়া অর্ঘ্য দিযাছেন দেশজননীর পাদমূলে।

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ স্বামীজী আমেরিকার নানা স্থানে হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। লোকে বক্তৃতা শুনিতে আসে, সাময়িকভাবে কিছু লাভবান হয় বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে কিছু দিন চর্চা না করিলে লোকের মনে সত্যকার কোন ধারণা দৃঢ়মূল হইতে পারে না, তাই স্বামীজী মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে কিছু বেশীদিন করিয়া থাকিতে লাগিলেন। ডেট্রয়টে মিচিগান স্টেটের গভর্নরের বিধবা পত্নী মিসেস্ জন জে বাগ্‌লের বাড়িতে প্রায় চার সপ্তাহ ছিলেন। মিসেস্ বাগলে্ সেই সমস্ত দিনের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সে সময় বাড়িতে যেন এক অপূর্ব উপলব্ধির প্রবাহ বয়ে যেত।'

স্বামীজী সেনেটর অনারেবল টমাস্ ডাব্‌লিউ পামারের বাড়িতে দুই সপ্তাহ ছিলেন। যখন কোনখানে বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ না থাকিত তখন মিস্টার জর্জ হেলের চিকাগোর বাড়িতে অবস্থান করিতেন, এই স্থানটি ছিল তাঁহার বিশ্রামের স্থান।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময় তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। নিউ ইংল্যাণ্ডের গ্রীন একার শহরে একটি সম্মিলনীতে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি কতকগুলি এমন শ্রোতা পাইয়াছিলেন যাঁহাদের মনে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ আছে। স্বামীজী তাঁহাদের লইয়া যে পাইন গাছের তলে বসিয়া ক্লাস করিতেন, সেই গাছটি আজও স্বামীজীর পাইন গাছ নামে পরিচিত।

১৮৯৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ডেট্রয়েটে ইউনিটেরিয়ান চার্চে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং মার্চ মাসে চিকাগো শহরে ছিলেন। এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কে

থাকেন, মে মাসে গরমের জন্য বোষ্টনে কাটান। আবার জুন মাসে চিকাগোয় চলিয়া যান। অক্টোবর মাসটা স্বামীজী বাল্‌টিমোর, ওয়াশিংটন ও বোস্টন শহরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া আবার নিউইয়র্কে আসেন। এখানে তাঁহার ডাঃ লিউইস্ জি জেমস্ নামক এক ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়। ইনি স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের যে বন্ধুত্ব হয় সে বন্ধুত্ব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষদিনে অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর স্বামীজী এথিক্যাল সোসাইটিতে প্রথম বক্তৃতা দেন। ঐদিন সোসাইটি হল লোকে পরিপূর্ণ ছিল এবং বক্তৃতাশেষে সকলেই তাঁহাকে নিয়মিত ক্লাস করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ জানান। সেজন্য স্বামীজীকে ব্রুকলিনে প্রায় দুমাস থাকিতে হইয়াছিল। এই সময় ব্রুকলিনের মিস্ এস ই ওয়াল্ডো নামে এক মহিলা স্বামীজীর শিষ্যা হন এবং পূর্বনাম পরিবর্তন করিয়া 'জ্যোতিমাতা' নাম গ্রহণ করেন।

এথিক্যাল সোসাইটিতে তিনি যেদিন 'হিন্দুনারীর আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সে দিনের বক্তৃতা-লব্ধ সমস্ত টাকাই স্বর্গীয় শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বরানগরের বিধবা আশ্রমের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন।

ব্রুকলিনের প্রচারকার্য বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন এবং এখানে একটি ঘর ভাড়া করিয়া নিয়মিত ক্লাস আরম্ভ করেন। শীঘ্রই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, তাঁহাকে আর একটি বড় ঘরে ক্লাস করিতে হইল। এই ক্লাসে ব্রুকলিনের ছাত্রছাত্রিগণের কয়েক জনও আসিতেন। ছাত্রছাত্রিগণের স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্যেই বাড়ি ভাড়া প্রভৃতির খরচ কুলাইয়া যাইত। ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সকালে ক্লাস বসিত, আবার এক একদিন সন্ধ্যাতেও ক্লাস বসিত এবং প্রয়োজন মনে হইলে রবিবারেও ক্লাস বসিত।

ক্লাসে তিনি প্রধানত রাজযোগ সম্বন্ধেই শিক্ষা দিতেন, আবার জ্ঞানযোগ, অভ্যাসযোগ প্রতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতেন। আসন ও ধ্যান সম্বন্ধে নিয়মাবলী, মনের একাগ্রতা অর্জন, সংযম অভ্যাস, আহারের সংযম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণীয় ছিল। তাঁহার 'রাজযোগ' নামক পুস্তকখানি এই সময়েই লিখিত হয়।

এই সময় তিনি তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে দুইজনকে সন্ন্যাস দান করেন, ইঁহাদের একজন ম্যাডাম মেরি লুই নামে এক ফরাসী মহিলা। ফরাসিনী হইলেও বহুদিন আমেরিকায় বাস করিয়া আমেরিকানই হইয়া গিয়াছিলেন ; ইনি একজন খ্যাতনামা বিদুষী মহিলা।

আর একজন শিষ্য, তাঁহার পূর্বনাম ছিল 'হের লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ, রুশ দেশের এক ইহুদী বংশে ইঁহার জন্ম। তাঁহার সন্ন্যাস নাম স্বামী কৃপানন্দ। আমেরিকায় ইঁহারাই স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য ও শিষ্যা।

আমেরিকায় যে সকল গৃহী শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিসেস্ অলিবুল বেলুড়ে মঠ স্থাপনের সময় প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। ইহা ছাড়াও তাঁহার অন্য গৃহশিষ্য ডাঃ অ্যালেন ডে, অধ্যাপক ওয়াইম্যান, অধ্যাপক রাইট, ডাঃ স্ট্রীট মিস্টার ও মিসেস লেগেট এবং মিস্ জে ম্যাকলাউড ইঁহারাও বেলুড় মঠ স্থাপনে অর্থ সাহায্য করেন।

ফরাসী দেশের খ্যাতনামা অভিনেত্রী সারা বার্নার্ড এবং গায়িকা ম্যাডাম কালভেও স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন।

নিউইয়র্কে পাঁচ মাস ক্লাস চলিবার পর জুন মাসে প্রধানত গরমের জন্যই তাঁহাকে ক্লাস বন্ধ করিতে হয়, কেননা ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এই সময় পল্লী-গ্রামে যান। স্বামীজীর শরীরও অতিরিক্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাঁহার কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মিসেস লেগেটের নিউ হ্যাম্পশায়ারের পার্সি নামক স্থানে একটি পল্লীভবন ছিল। স্থানটি মনোরম এবং স্বামীজীর শহরের কোলাহলের ভিতর থাকিতে আর ভাল লাগিতেছিল না। সেজন্য মিসেস লেগেটের অনুরোধে তিনি তাঁহার সঙ্গে সেই পল্লীভবনেই কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে গেলেন।

এই স্থানটি স্বামীজীর খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ৭ই জুন এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি জীবনে যে সকল সর্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান দেখিয়াছি, এটি তারই মধ্যে অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দিকে পর্বতমালাপরিবেষ্টিত বনরাজি ও তার অন্তরালে একটি স্বচ্ছসলিলা হ্রদ, আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কী মনোরম। কী নিস্তব্ধ, কী শান্তিপূর্ণ! * * * আমি একলা বনের মধ্যে চলে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। এখানে এসে আমার আয়ু যেন আরও দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।"

এই পত্রে ও আরও অনেক স্থানে আয়ুর উল্লেখ মনে হয় যেন তাঁহার পৃথিবীর কার্য শেষ করিবার জন্য অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নিজের দেহের দিকে দৃকপাত না করিয়া তাঁহার কাজ অবিশ্রাম করিয়া চলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মর্চে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে মরা অনেক অনেক ভাল।'

পার্সি জায়গাটি স্বামীজীর ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এখানে কিছুদিন থাকিয়াই 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এই সময় একখানি পত্রে লিখিয়াছেন— "এখান থেকে দিন দশেকের মধ্যেই আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাব। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন নির্জনে থাকবো এবং ভগবানের ধ্যান করবো।"

সেণ্ট লরেন্স নদীতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জবেষ্টিত বড় দ্বীপটিতেই ছিল মিস ডাচারের কুটীর। এই মিস ডাচার ছিলেন স্বামীজীর

এক শিষ্যা, তাঁরই বাড়িতে গিয়া স্বামীজী থাকিলেন। যদিও এই বাড়িগুলিকে কটেজ বা কুটীর বলা হইত, কিন্তু আসলে এগুলি একটি ছোট ছোট অট্টালিকা। মিস ডাচারের কুটীর ভবনটি একটি ছোট পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়টি ঢালু হইয়া নদীর ধার পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। কুটীরের পশ্চাৎভাগ তিনতলা ও সামনের দিক দোতলা। দোতলার ঘরটি বেশ বড়, সেই ঘরেই স্বামীজীর ক্লাস বসিত। নীচে সমতল স্থানে সবুজ ঘাসের 'লন' আর বড় বড় গাছে কুটীরটি এমনভাবে বেষ্টিত যেন সেটি নিবিড় বনের মধ্যে একটি বাসা। কুটীরের পিছন দিকে একটি হ্রদও আছে। চারিদিক এমন নির্জন যে, পাখির গান আর বাতাসের মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না।

আরও ছোট ছোট যে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সে সব দ্বীপে হোটেল ও বাড়িঘরও আছে।

স্বামীজী তাঁর বারটি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া সেখানে ছিলেন, ইঁহারা সকলেই তাঁহার বাছাই-করা শিষ্য। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন তিনি ক্লাস আরম্ভ করেন এবং ৬ই আগস্ট পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ক্লাস চলিয়াছিল। ক্লাস আরম্ভের প্রথম দিন তিনি বাইবেলের ক্লাস করেন। তাহার পর কোনদিন গীতা, কোনদিন অবধূত গীতা, কোনদিন পাতঞ্জল দর্শন, নারদীয় সূত্র বা বৃহদারণ্যক উপনিষদ আবার কোনদিন তিনি মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিতেন। মিস ডাচারের এই কুটীরটি যেন ঋষির আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। এখানে তিনি তাঁহার দুইজন শিষ্যকে সন্ন্যাস দেন এবং পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্য দিলেন। এইভাবে আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে হোটেল ছিল আবার পতিতা নারীগণের পল্লীও ছিল। একদিন স্বামীজী বেড়াইতে বেড়াইতে সেই দিকে গিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গী একজন শিষ্য তাঁহাকে বলিল, 'স্বামীজী ওপথে গিয়া কাজ নাই।" কিন্তু ভাবাবিষ্ট স্বামীজী সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। পতিতাগণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া নানাভাবে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী ও হাসাহাসি করিতে লাগিল। ভাবাবিষ্ট হইয়া স্বামীজী অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে একেবারে তাহাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল তাঁহার মূর্তি যেন করুণা দিয়া গঠিত, ধীরে ধীরে তিনি একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করিলেন, "আহা, দুখিনী বাছারা আমার।" সেই মুহূর্তেই পতিতাগণের সকল চপলতা দূর হইয়া গেল, তাহারা যেন সহসা নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিল। তাহারা তখন কিভাবে আর্তক্রন্দনে স্বামীজীর পায়ের কাছে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল, একজন প্রত্যক্ষদর্শিনী সেই বর্ণনা দিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন, "মনে হল যেন খৃষ্ট আবার আবির্ভূত হয়ে পতিতাদের উদ্ধার করছেন।"

ইহার পর স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ
ইংলণ্ড ও আমেরিকায়

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাস।

স্বামীজীর সহস্রদ্বীপোদ্যানের কাজ শেষ হইয়াছে। এইবার তিনি অন্যত্র যাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

স্বামীজীর জীবনের এই সময়ের কার্যাবলীতে লক্ষ্য করিবার মত যে ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়, তাহার অর্থ হইল এই যে, "সময় সংক্ষেপ, সময় সংক্ষেপ।" স্বামীজী যেন প্রতিক্ষণে নিজেকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, 'তুমি এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছ এই পৃথিবীতে, এক অমৃতের বার্তা বহন করিয়া মরণশীল জগতে জন্মাইয়াছ, তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তারই জন্য ব্যয় করিতে হইবে, একটি মুহূর্তও যেন নিষ্ফল না যায়।"

অবিশ্রাম—অবিশ্রাম এক কর্মপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে সেই অতি মহান্ জীবনের প্রতিটি দিন, প্রহর, দণ্ড, পল ও অনুপল।

সহস্রদ্বীপোদ্যান হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে যাত্রার আয়োজন করিতেছেন, তখন মিসেস লেগেট স্বামীজীকে জানাইলেন যে তিনিও প্যারিস হইয়া ইংলণ্ড যাইবেন, স্বামীজী যদি অনুমতি করেন, তবে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে স্বামীজীর ইংলণ্ডে অবস্থানের সময় তিনি হয়তো তাঁহার কোন কাজে লাগিতে পারিবেন।

স্বামীজী প্যারিস হইয়াই লণ্ডনে গেলেন, আমেরিকায় থাকিতেই তিনি মিস্টার ই টি স্টার্ডি ও মিস্ হেনরিয়েটা মুলারের নিকট হইতে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন।

মিস্টার স্টার্ডি একজন ইংরেজ এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ভারতবর্ষের উপর এবং ভারতীয় ধর্মসাধন প্রণালীর উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি একাধিকবার ভারতবর্ষে গিয়া বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন। তিনি যখন আলমোড়ায় ছিলেন, তখন সেখানে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শিবানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শিবানন্দ স্বামীর পূর্বাশ্রমে 'তারকনাথ ঘোষাল' নাম ছিল, সেইজন্য মঠে অনেকে তাঁহাকে 'তারকদাদা' বলিয়া ডাকিতেন, আবার তাঁহাকে 'মহাপুরুষ মহারাজ'ও বলা হইত। 'মহাপুরুষ' নামটি স্বামীজীই দিয়াছিলেন, কেননা তাঁর প্রকৃতিতে সর্বজীবে প্রেমময় বুদ্ধদেবের ভাব লক্ষিত হইত। স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত 'মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান' নামে একখানি পুস্তকে তাঁহার যে ছবিটি দিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য কিছু এখানে তুলিয়া দিলামঃ—"তারকদা সকালে রামতনু

বোসের গলির বাড়িতে আসিলেন, তাঁর গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মত একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়ি খুড়ি চুল, আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি। আমি বল্লুম 'তারকদা', চল তোমায় নাইয়ে দি।'* * * তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে দিল্লী থেকে আনা গা মাজ্‌বার বগ্‌লিটা হাতে পরে নিয়ে তাঁর গা ঘষতে লাগলুম। গা ঘষতে ঘষতে কাদাটে জল বেরুতে লাগলো। অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা ও মুখ ঘষে তারপর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো। আমি বল্লুম "তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন?' তারকদা বললেন, 'সমস্ত রাতি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর যেখানে সেখানে পড়ে থাকি, সেইজন্যে গায়ে এত কাদা লেগেছে। দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটে ডুব দিয়ে আসি, গাও ঘষিনি কি পুঁছিনি তো।"

একবার যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র নামে এক ভদ্র সন্তানের চাকরি না থাকায় তাঁহার খুবই কষ্টে দিন কাটিতেছিল। তিনি মাঝে মাঝে বরানগর মঠে আসিতেন, মঠে তাঁর নাম ছিল 'দম্‌দম্‌ মাস্টার"। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "দম্‌দম্‌ এসে তারকদা'র কাছে নিজের কষ্টের কথা জানাল। তারকদা বললেন, 'দম্‌দম্‌, তোমার কষ্ট হয়েছে? তুমি এখানেই থাক, খাওয়া-দাওয়া কর, সব দেখাশুনা কর।* * কাউকে বলে তোমাকে টাকা দশ করে পাইয়ে দেব'।" আবার একবার তাঁর আশ্রিত এক যুবক মঠের সমস্ত টাকাকড়ি যাহা ছিল চুরি করিয়া পালায়, পরদিন সকালে দেখা গেল, বাক্সে একটি পয়সা পড়িয়া আছে, সেই এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া আনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, "ছেলেটির খুব অভাব হয়েছিল, তাই টাকাগুলো নিয়েছে। কিন্তু এদিকে তার ঠাকুরের উপর ভক্তিও ছিল; দেখ্‌ছিস্‌ না, ঠাকুরের পাছে ভোগ না হয়, সেজন্য একটা পয়সা রেখে গিয়েছে।" টাকাগুলি বাড়ি ভাড়া দিবার জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, কেননা সেইদিন বাড়িওয়ালার লোক ভাড়া লইতে আসিবে। কিন্তু শিবানন্দ স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুই মনে হইল না।

এই ছিল স্বামী শিবানন্দের প্রকৃতি। সব দেশের লোকের সঙ্গেই তাঁহার সমভাবে হৃদ্যতা হইত, এই হৃদ্যতায় ধর্ম সম্বন্ধেও কোন বাছ-বিচার থাকিত না। মিস্টার স্টার্ডি'র সঙ্গে তাঁহার এমনই হৃদ্যতা হইল যে, দু'জনে আলমোড়ায় তো একসঙ্গে রহিলেনই আবার দু'জনে মাদ্রাজে গিয়া সেখানেও একসঙ্গে রহিলেন। এই দীর্ঘ সময় তাঁহারা সাধারণভাবে ধর্মকথা আলোচনা করিয়াছেন, আবার সেইসঙ্গে একজন আগ্রহী শ্রোতা ও অপরজন উৎসাহী বক্তা এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের নানা কাহিনী এবং সেই সঙ্গে স্বামীজীর কথাও তাঁহারা তন্ময় হইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অনবরত স্বামীজীর কথা শুনিয়া শুনিয়া স্বামীজী যেন মিস্টার স্টার্ডি'র নিকট একান্ত পরিচিত হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াই স্বামীজীর নিকট আমেরিকায় পত্র লিখিলেন ইংলণ্ডে আসিবার জন্য।

মিস্‌ হেনরিয়েটা মুলারের সঙ্গে স্বামীজীর আমেরিকাতেই পরিচয় হয়

এবং তিনি স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত হন। ইনি একজন জার্মান মহিলা, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ইনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্বামীজী প্যারিসে অল্প কয়েক দিন ছিলেন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই তিনি লণ্ডনে পেঁাছিলেন।

স্বামীজী জানিতেন ইংরেজেরা আমেরিকানদের মত সহজে কোন কিছু গ্রহণ করে না, আবার যদি গ্রহণ করে তবে সেটি আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করে, ইংরেজ চরিত্রের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য। লণ্ডনে আসিয়া স্বামীজী কাহারও গৃহে স্থায়ী আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, একদিন একজনের আবার অন্যদিন অপরজনের বাড়ি থাকিতেন এবং যেদিন যেখানে থাকিতেন, সেখানে ঘরোয়া আলোচনার বৈঠকে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়া আলোচনা চালাইতেন।

অবশ্য সে সব বৈঠকে লোক বেশি হইত না। সিস্টার নিবেদিতা যিনি তখন মিস মার্গারেট নোবেল ছিলেন—তিনি তাঁহার "আমার প্রভু—যেমনটি তাঁকে দেখেছি" নামক পুস্তকে এই সময়ে তাঁহার সহিত স্বামীজীর সাক্ষাতের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এই ঘরোয়া আলোচনার সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু ধারণা করিতে পারি।

নিবেদিতা লিখিতেছেন, "সময়টি নবেম্বর মাসের এক রবিবারের ঠাণ্ডা বৈকাল বেলা এবং স্থান ওয়েস্ট এণ্ডের একটি বৈঠকখানা। তিনি অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া এবং কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানের প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন; আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কোন সংস্কৃত শ্লোক সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের সঙ্গমে সেখানকার দৃশ্যটি তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই কোন ভারতীয় উদ্যানের অথবা সূর্যাস্ত সময়ে কোন কূপের নিকট বা গ্রামের কাছে তরুতলে উপবিষ্ট কোন সাধুর চারিপাশে সমবেত শ্রোতাগণেরই এক সামঞ্জস্যসূচক রূপান্তর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে।"

এই দিনের ঘরোয়া বৈঠকে বেশী লোক ছিল না, এজন্য নিবেদিতা খুশী হইয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "শুধু এই প্রথমবারে আমরা মাত্র পনেরো ষোলজন অভ্যাগত ছিলাম, আমাদের মধ্যে অনেকে আবার পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বামীজী তাঁহার গেরুয়া পরিচ্ছদ ও কোমরবন্ধ পরিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়া-ছিলেন, মনে হইতেছিল—তিনি আমাদের নিকট কোন্ এক দূরদেশের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একবার 'শিব! শিব!' উচ্চারণ করিতেছেন, উহা আমাদের নিকট কেমন নূতন নূতন মনে হইতেছে। আর তাঁহার মুখের ভাবে ধ্যানপরায়ণ সাধুগণের মুখে যে কোমলতা ও মহত্ত্বের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, যেন তাহাই লক্ষিত হইতেছিল। হয়তো—এ-ভাব সেই ভাব, র‍্যাফেল যাহা তাঁহার অঙ্কিত 'Sistine child'-এর ললাটে আঁকিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন।"

নিবেদিতা আরও বলিয়াছেন, "সে অপরাহ্নের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—এবং সেদিনকার কথাবার্তার সামান্যই এখন মনে পড়িতেছে,—কিন্তু সেই সুর—যে বিস্ময়কর সুর-সহযোগে তিনি আমাদের সংস্কৃত শ্লোকগুলি উচ্চারণ করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা কখনো ভুলিবার নয়।"

তাঁহাকে সেদিন পাশ্চাত্ত্য দেশে আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে আদর্শ বিনিময়েরও প্রয়োজন আছে এবং এখন তাহারই সময় আসিয়াছে। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, তিনি faith অর্থাৎ বিশ্বাস শব্দটিতে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার পরিবর্তে realisation কথাটি ব্যবহার করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। 'সম্প্রদায়' সম্বন্ধে তিনি একটি ভারতীয় উক্তি উদ্ধৃত করেন, "কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতেই আবদ্ধ থাকিয়া মরা অতি ভয়ানক।"

এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন ইহার পরও উঠিয়াছিল, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট পত্রিকার প্রতিনিধি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করে গিয়েছেন। উত্তরে স্বামীজী বলেন ;—

"No, his (Sri Ramakrishna's) whole life was spent in breaking down the barriers of sectarianism and dogma. He formed no sect. Quite the reverse. He advocated and strove to establish absolute freedom of thought. (Vide Complete Works of Swami Vivekananda, vol. V, third edition, published in 1924, page 116).

"না, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনই ব্যয় করিয়াছিলেন সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির জন্য মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে স্বাধীন-চিন্তা-পরায়ণ হয়, তাহাই তিনি সমর্থন করিতেন।"

স্বামীজী নিজেও ঠিক এইভাবের কথা অন্যত্র বলিয়াছেন। স্বামী অভয়ানন্দকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে ঠিক এইভাবের কথাই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"We have no organisation, nor want to build any. Each one is quite independent to teach, quite free to preach whatever he or she likes."

আরও লিখিয়াছিলেন—

"Individuality is my motto, I have no ambition

beyond training individuals." (Vide Complete Works of Swami Vivekananda, vol. VII, p. 419).

তাঁর পত্রাবলীর চতুর্থভাগে জনৈক শিষ্যকে লেখা একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই এই একই ভাবের উক্তিঃ—"আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী। তাহাদের নিজেদের কাজ নিজেদের করিতে দাও। তাহারা যাহা খুশি করুক।"

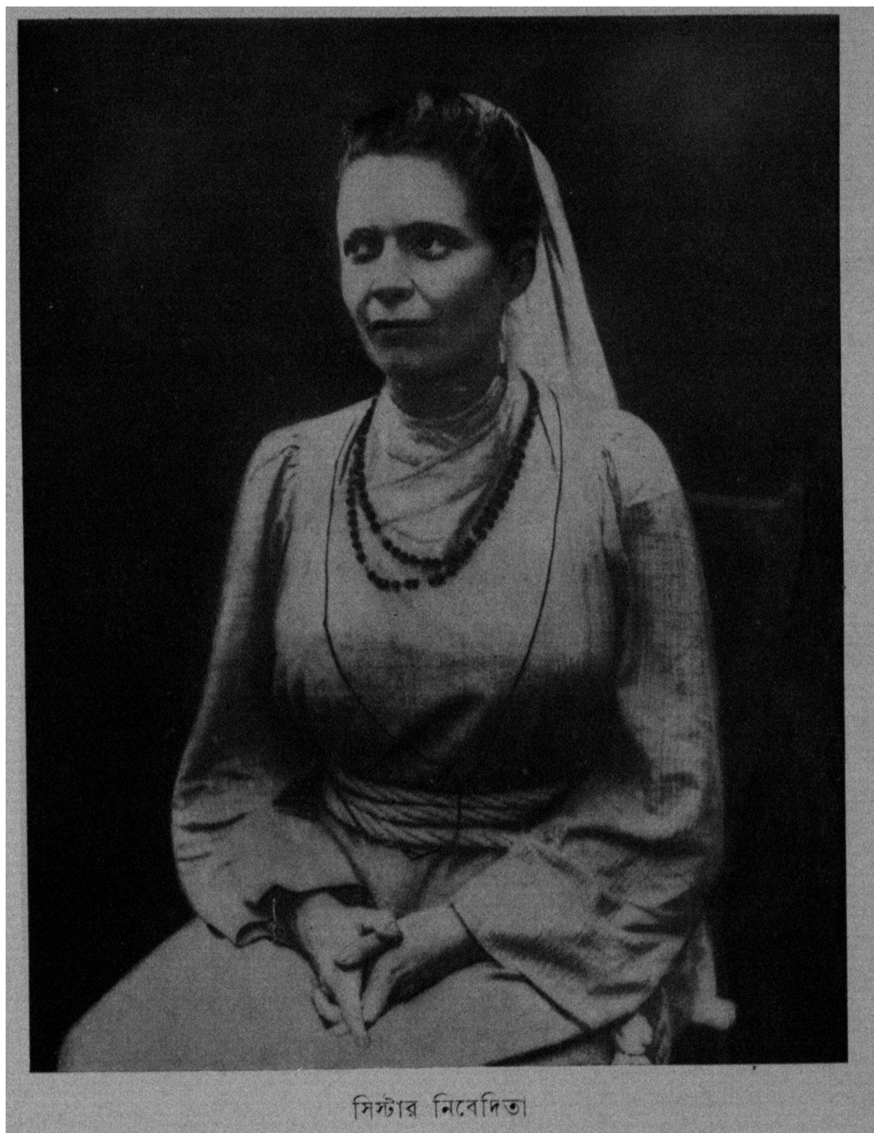
স্বামী অভয়ানন্দকে লেখা চিঠিরও একই তাৎপর্য "আমাদের কোন দল নাই, আর তা গড়তেও চাই না। পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে যা ভাল বোঝে সেইভাবে প্রচার করা বা শিক্ষা দেওয়ার তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা এই সময় মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়, স্বামীজীর প্রেরণা ও সাহায্যেই পত্রিকাখানি প্রথমে পাক্ষিক, পরে মাসিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইখানিই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রচারপত্রিকা। জি ভেঙ্কটরঙ্গ রাও, এম সি আলাসিংগা ও পেরুমল নামে তাঁর তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য পত্রিকাব সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ষোল-সতেরো বৎসর এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

লণ্ডনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মিস্টার স্টার্ডি এই সময় উদ্যোগী হন, আমেবিকার কেন্দ্রগুলিও এই বৎসর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং এই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে আমেরিকায় গুডউইন স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি শর্টহ্যাণ্ডে লিপিবন্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

লণ্ডনে প্রথমবার স্বামীজী তিনমাস মাত্র থাকেন। এই অল্প সময়েই তাঁহার নাম সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। 'এক ভাবতীয় যোগী' এই নামে খবরের কাগজে তাঁহার উল্লেখ করা হইত। ২১শে অক্টোবব পিকার্ডিলির প্রিন্সেস হলে তিনি 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, ঐ বক্তৃতার পর বিশেষ করিয়া তাঁহার কথা সকলে জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরেই তিনি লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া যান।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার, স্বামীজী নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে তাঁহার অনুপস্থিতিতেও বেদান্ত-প্রচারকার্য বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। আমেরিকান শিষ্যবৃন্দ স্বামী কৃপানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দ এবং মিস এস ই ওয়াল্ডো এই কাজের ভার লইয়াছিলেন। স্বামীজীর অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যারাও এই প্রচারকার্যে সাহায্য করিয়াছেন। নিউইয়র্ক, বাফেলো ও ডেট্রয়েট এই তিন স্থানে তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হইযাছিল। স্বামীজী নিউইয়র্কে পেঁীছিয়াই নিউইয়র্কের কেন্দ্রটিকে প্রধান কেন্দ্র করিলেন এবং সেখানে 'কর্মযোগ' সম্বন্ধে নিয়মিত ক্লাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার এই সমস্ত বক্তৃতা মিস্টার গুডউইন শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া লইতে লাগিলেন। এই গুডউইন সাহেব ছিলেন স্বামীজীর একান্ত ভক্ত ও নিয়ত সঙ্গী। ইহার পূর্বে স্বামীজীর



সিস্টার নিবেদিতা



সিস্টার নিবেদিতা

অনেক বক্তৃতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গুডউইন এখন হইতে আর কোন বক্তৃতাই নষ্ট হইতে দেন নাই। তিনি যদি এই মহামূল্য উপদেশগুলি সঞ্চয় করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে তাহার অনেকগুলিই নষ্ট হইয়া যাইত।

নিউইয়র্কে বড়দিনের উৎসব আসিয়া গেল। স্বামীজী বড়দিনের সময় বোস্টনে গিয়া মিসেস অলিবুলের বাড়িতে থাকিলেন। তাহার পর আসিল নূতন বৎসর। স্বামীজী আবার নিউইয়র্কে ফিরিয়া গেলেন এবং ৫ই জানুয়ারী রবিবার হইতে 'হার্ডম্যান হলে' প্রতি রবিবারে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। রবিবার ছাড়া অন্যদিনও কোন কোন স্থানে বক্তৃতা দিতেন, কোনদিন বা ব্রুকলিনের 'মেটা-ফিজিক্যাল সোসাইটিতে' আবার কোনদিন 'পিপলস্ চার্চে' বক্তৃতা দিতেন।

বক্তৃতাস্থলে ক্রমশ এত বেশী জনতা হইতে লাগিল যে, স্থান সংকুলান হয় না দেখিয়া স্বামীজী 'ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন' নামক নিউইয়র্কের বৃহৎ হলে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে প্রায় দু হাজার লোকের স্থান ছিল। এখানে তিনি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী "আমার প্রভু" নামক বক্তৃতায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী ডাক্তার স্ট্রীট নামক একজন শিষ্যকে সন্ন্যাস দান করেন, ইঁহার সন্ন্যাস নাম হইল স্বামী যোগানন্দ। ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি আরও কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষাদান করেন।

ইহার পর নিউইয়র্ক হইতে ডেট্রয়েটে গিয়া সেইখানে দুই সপ্তাহ থাকেন। তাহার পর ডেট্রয়েট আশ্রমের ভার স্বামী কৃপানন্দের উপর দিয়া তিনি বোস্টনে চলিয়া যান এবং সেখানে কয়েকদিন থাকেন। এই সময় স্বামীজী বিভিন্ন স্থানে ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ স্বামীজী হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন যাঁহারা শ্রোতা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্বান, দর্শন বিভাগের ছাত্রগণ ও অধ্যাপক-গণও এই বক্তৃতার শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার সময় অনেকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং স্বামীজী তাহার উত্তর দেন। এই দিনের এই বক্তৃতা ও প্রশ্নের উত্তরগুলি এত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, অধ্যাপকগণ তাঁহাকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে "Chair of Eastern Philosophy" নামে একটি আসন দানরূপ সম্মান দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী বলিলেন, তিনি সন্ন্যাসী,—তিনি এরকম সম্মান লইতে পারেন না।

আমেরিকায় স্বামীজীর যে সম্মান হইয়াছিল, কোন রাজা-মহারাজার ভাগ্যেও তেমন সম্মান দুর্লভ। কিন্তু পদ্মপত্রে যেমন জল লাগে না, তেমনি সে সব সম্মান স্বামীজীর মনে দাগ কাটিতে পারে নাই। গিরিশবাবু এই সময় তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এত মান হজম করা—এ তো যে সে লিভারের কাজ নয়। এর জন্যে খুব বড় লিভার চাই, নরেনের তা আছে, তাই বদহজমে মারা পড়ে নি।"

মার্চ মাস শেষ না হইতেই ইংলণ্ড হইতে স্বামীজীর কাছে বার বার অনুরোধ-পত্র আসিতে লাগিল। তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতেই হইবে। স্বামীজী ইংলণ্ড গমনের পূর্বে আমেরিকার বেদান্ত প্রচারকার্য যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহিলেন। তিনি নিউইয়র্কে 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন এবং এইভাবে ইহার উদ্দেশ্যগুলি লিখিত হইলঃ—

(১) বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় যে যে আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর স্থাপিত, তাহার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা।

(২) বিভিন্ন দেশের মহান ধর্মাচার্যগণ যে আদর্শ নিজেদের জীবনে পালন করিয়াছেন এবং শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রচার করা।

(৩) সমগ্র মানবজাতিকে সেই সকল আদর্শ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে কার্যকরী করিবার দিক দিয়া সাহায্য করা।

এই বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্যগুলিতে একটি বিষয়ই পরিস্ফুট হইয়াছে, সেটি সমগ্র মানবজাতির সর্বতোভাবে উন্নতিবিধান। মানুষের দেহের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেই যে আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করিতেছে, ইহা স্বামীজী একান্তভাবে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষকে মানুষ করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উচ্চাভিলাষ নাই।"

গৃহী ও সন্ন্যাসীর ভিতরে পার্থক্য স্থাপন তিনি অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যিনি পার্থক্য করেন না, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) লণ্ডনে যান। স্বামীজী তাঁহাকে লণ্ডনে আসিতে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, লণ্ডনে আসিয়া তিনি যেন স্টার্ডি সাহেবের বাড়িতে থাকেন। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) লণ্ডনে আসিবেন প্রথমে ইহাই স্থির ছিল ; কিন্তু শশী মহারাজ তখন অসুস্থ হইয়া পড়ায় স্বামীজী শরৎ মহারাজকেই লণ্ডনে আসিতে লিখেন।

এবার আবার লণ্ডন যাত্রার জন্য স্বামীজী প্রস্তুত হইলেন। ১৮৯৩ সালের আগস্ট হইতে ১৮৯৬ সালের এপ্রিল, এই দীর্ঘ সময় স্বামীজী আমেরিকাতেই কাটাইয়াছিলেন, মধ্যে মাত্র তিন মাসের জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এই সময় আমেরিকায় যে সব কাজ হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেগুলি বহু স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রসার, বহু শিষ্যকে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য দান, কয়েকজনকে সন্ন্যাস দান এবং তাহাদের উপর কার্য পরিচালনের ভার অর্পণ প্রভৃতির কথাই বলিতে হয়। রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নামক তিনটি পুস্তক এবং স্বামীজীর বক্তৃতাবলীও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল স্বামীজী নিউইয়র্ক হইতে ইংলণ্ডের দিকে রওনা হন, গুড্‌উইনকেও তিনি তাঁহার সহিত লইয়াছিলেন। লণ্ডনে আসিয়া শরৎ মহারাজের সহিত তাঁহার দেখা হইল, বহুদিন পরে এই সাক্ষাৎ।

এই সময় স্বামীজী ৫৭, সেণ্ট জর্জ স্ট্রীটে ছিলেন। বাড়িটির অধিকারিণী ছিলেন লেডি ফার্গুসান। লেডি ফার্গুসানের একটি শিশুকন্যা ছিল এবং সেটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহার চৌদ্দ বৎসর পর কাশীর অদ্বৈত-আশ্রমে স্বামীজীর পাশ্চাত্যের শিষ্যগণ যখন আসেন, তখন এই মেয়েটিও সেই সঙ্গে আসিয়াছিল, স্বামীজীর কথা তখনও সে ভুলে নাই।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে স্বামীজীর ক্লাস আরম্ভ হইল, এ সময় তিনি "জ্ঞানযোগ" সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। মে মাসের শেষের দিকে পিকাডেলির 'রয়েল ইনস্টিটিউটে' প্রতি রবিবারে বক্তৃতা দিতেন এবং জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত "প্রিন্সেস হলে" প্রতি রবিবারে বক্তৃতা দিয়াছেন। অন্যান্য সময় শিক্ষার্থিগণকে সাধন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, প্রশ্নের উত্তর দান ও নানা বিষয়ের আলোচনায় কাটিয়া যাইত। কাজেই তাঁহার অবসর ছিল না বলিলেই হয়। শরৎ মহারাজ সব সময় তাঁহার সহিত থাকিয়া তাঁহার কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

থিয়োসফিস্টরা আমেরিকায় স্বামীজীর অনেক বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, কিন্তু মিসেস অ্যানি বেসান্টের অনুরোধে স্বামীজী সেণ্ট জন্‌স উডে, অ্যাভিনিউ রোডের থিয়োসফিক্যাল লজে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি ছিল 'ভক্তি' সম্বন্ধে। কর্নেল অলকটও এই বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে স্বামীজীর আমেরিক্যান শিষ্যেরা বার বার শরৎ মহারাজকে আমেরিকা পাঠানোর জন্য তাঁহাকে লিখিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর কোন গুরুভাই যেন আসেন, সেজন্য স্বামীজীর কাছে বহু পূর্বেই আবেদন করিয়াছিলেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে সে কথা জানাইলেন এবং স্বামী সারদানন্দ ও গুড্‌উইন সাহেব ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা রওনা হইলেন।

গ্রীন একারে যে পাইন গাছের তলায় বসিয়া দুই বৎসর আগে স্বামীজী ক্লাস করিয়াছিলেন, সেই গাছের তলায় বসিয়াই স্বামী সারদানন্দও ক্লাস করিতে লাগিলেন। গ্রীন একারে এই সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার জন্য যে কনফারেন্স বসিয়াছিল সেই কনফারেন্সে স্বামী সারদানন্দ বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

এই সময় গ্রীন একারের একটি প্রোগ্রামে একটি কথা ছাপা হয়,, সেটি এই যে, 'এস্' অর্থাৎ স্বামীজীর সদয় অনুমতিক্রমে স্বামী সারদানন্দ ইংলণ্ডের কাজে ছুটি পাইয়া আমেরিকায় আসিয়াছেন। এই কথাটি পড়িয়া স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। সেই লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"It was an awful mistake in the Greenacre programme that it was printed that Saradananda was there by the kind permission (leave of absence from England) of S.—Who is S—or anybody else to permit a

Sannyasin? I am no master to any Sannyasin in this world. They do whatever it suits them, and if I can help them—that is all my connection with them. I have given up the bondage of iron, the family tie,—I am not to take up the golden chain of religious brotherhood. I am free, must always be free. And I wish everyone to be free. And I wish everyone to be free,—free as the air. If New York or Boston or any other place in the U.S. needs Vedanta teachers, they must receive them and keep them and provid for them." (*Vide* Complete Works of Swami Vivekananda, vol. VI, p. 334).

গ্রীন একার প্রোগ্রামে একটা অত্যন্ত ভুল হয়েছে, ওতে ছাপা হয়েছে এস. দয়া করে (ইংলণ্ডে কাজে ছুটি নিয়ে যাবার) অনুমতি দেওয়াতেই যেন সারদানন্দ সেখানে আছে।

'এস' বা যে কেউ হোক্—একজন সন্ন্যাসীকে অনুমতি দেবার সে কে? এই পৃথিবীতে আমি একজনও সন্ন্যাসীর প্রভু নই। তাঁদের যে কাজ ভাল লাগে, তাই তাঁরা করে থাকেন এবং আমি যদি তাঁদের কোনও সাহায্য করতে পারি—তাই যথেষ্ট, এইটুকুই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। সংসার বন্ধনরূপ লোহার শিকল আমি ছিঁড়েছি, গুরুভাইদের সম্বন্ধ বন্ধনরূপ সোনার শিকল আর আমি প'রতে চাই না। আমি মুক্ত—চিরদিনই মুক্তই থাকবো এবং আমি চাই সকলেই মুক্ত থাকুক—বাতাসের মতই মুক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বোস্টন কিম্বা যুক্তরাজ্যের অন্য কোন স্থান বেদান্তের শিক্ষক চায়—তারা তাঁদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আস্‌বে, রাখ্‌বে এবং তাঁদের থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে।'

স্বামীজীর এই পত্রে যে ভাবটি অতি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যাঁহারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহারা যেন কোন বাধ্যবাধকতার বন্ধনে ধরা না দেন এবং বৈষয়িক অর্থাৎ আর্থিক লেন-দেনের ব্যাপারে তাঁহারা জড়িত না হন, ইহাই স্বামীজীর কাম্য ছিল। সেই জন্যই তিনি বেদান্ত সমিতির সভাপতি করিয়াছিলেন মিস্টার লেগেটকে, কোনও সন্ন্যাসী শিষ্যকে সে ভার দেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ

স্বামীজী বলিয়াছেন, "মানুষ সমাজে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন আছে।" এই কথাটির সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যায়, সে কথাটি এই যে, কার্য-পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন দেশের পরস্পরের কাছে শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের কার্য-পরিচালন পদ্ধতি ঢিলাঢালা গোছের, আর পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি 'তড়ি-ঘড়ি', অর্থাৎ যাহা করিবার করিয়া ফেল। সময়কে পাশ্চাত্ত্য দেশ যেভাবে মূল্য দেয়, প্রাচ্য সেভাবে মূল্যদান করে না। পাশ্চাত্ত্যে সব কাজই, তা ছোট ও বড় যেমনই হোক্ না কেন, নিয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধনে এমনভাবে বাঁধা যে, তাহার আর এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু প্রাচ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না।

স্বামীজী তাঁহার সঙ্ঘ সংগঠনে ও মিশনের কাজে এই নিয়মানুবর্তিতা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এই উভয়ই নিজের নিজের দিক দিয়া তৎপরতার পথে চলিয়াছে। মিশন হইল প্রেরণা, আর সঙ্ঘ হইল সম্মিলিতভাবে সেই প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে রূপদান। এই দুই ব্যাপারেই প্রচার-পত্রিকার যে কতখানি প্রয়োজন, স্বামীজী সেকথা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই গুডউইন যখন আমেরিকায় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব করিলেন, স্বামীজী সে প্রস্তাবে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিলেন। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন একজন আমেরিকান ভক্তকে যে পত্র লেখেন, সে পত্রখানির ভাব এইরূপঃ—"গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা সম্বন্ধে তোমাকে ডাকে পত্র দিচ্ছে। আমারও মনে হয়, বেদান্ত প্রচারকার্যটি স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই রকমের একটা কিছু দরকার। আমি অবশ্য সে যেভাবে কাজ করবার উপায় নির্দেশ করবে সেইভাবেই তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।"

মাদ্রাজেও এই সময় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। মাদ্রাজে স্বামীজীর যেসব গৃহী শিষ্য 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন ছেলেদের জন্য একখানি পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা জানাইয়া স্বামীজীকে পত্র লিখিয়াছেন, স্বামীজী সে পত্রের উত্তরে ১৪ই মার্চ যে পত্র লেখেন, তার ভাবার্থ এইঃ—"তোমরা ছেলেদের জন্য যে কাগজ বার করবার প্রস্তাব জানিয়েছ, সে প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকা এবং এই পত্রিকাটি যদিও একই ধারা ধরে চলবে, কিন্তু তার মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য রাখতে হবে। এর লিখনভঙ্গী যেন সহজবোধ্য এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষী হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

এই পত্রিকাখানি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে প্রকাশিত হইল। মাত্র বারো পাতার একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন মিঃ আলাসিঙ্গা ও ডাক্তার মঞ্জুন্ডা এবং আর কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য।

মাদ্রাজ হইতে দুইখানি আর আমেরিকা হইতে একখানি, সর্বসমেত এই তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইল এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই পত্রিকাগুলিকে প্রচারকার্যের বিশেষ সহায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ৮ই আগস্ট যে পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেনঃ—

"যে কাজের ভার লইয়াছ, তাহা দেবকার্যের ন্যায় সমস্ত মন দিয়া করিয়া যাইবে। জানিবে যে, তাহারই সাফল্যের উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করিতেছে।"

ডাক্তার মঞ্জুন্ডা রাওকে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"যে কাজের ভার যাহার উপর আছে, সে তাহার পরিষ্কার হিসাব রাখিবে। যে কাজের উদ্দেশ্যে যে টাকা আছে, সে টাকা সেই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে,—সে কাজ যেমনই হোক না কেন—ব্যবহার করিবে না। ইহার জন্য যদি পরমুহূর্তে মরিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকেই বরণ করিবে। সদ্ভাবে কাজ করিবার ইহাই নিয়ম। প্রত্যেক কাজেই অদম্য কর্মতৎপরতা আবশ্যক। তুমি যা কিছু কর না কেন, সে সময়ের জন্য সেই কাজটিই যেন তোমার ভগবৎ আরাধনা হয়। উপস্থিত ঐ কাজটিই তোমার ভগবান। এইরকমভাবে কাজ করিলেই তুমি কৃতকার্য হইবে।"

প্রকৃতপক্ষে ইহাই কর্মযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেব ইহাই আদর্শ এবং এই আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণ মিশন অদ্যাবধি পরিচালিত হইতেছে।

প্রতিষ্ঠান যখন জনসাধারণ-প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়, তখন সেই পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যাঁহাদের উপর থাকে, তাঁহাদের অর্থব্যয় ব্যাপারে কতখানি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, স্বামীজীর এইভাবের নির্দেশে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

গুডউইন ও স্বামীজী সারদানন্দ যখন আমেরিকা চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী কিছুদিন একাই ছিলেন, তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে বাহির হন। এই সময় তাঁহার শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রথমেই তিনি সুইজারল্যান্ড যান। জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী লন্ডন ত্যাগ করেন। সংগে ছিলেন মিস মুলার, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার। সে সময় জেনেভায় এক প্রদর্শনী চলিতেছিল। স্বামীজী ইংলন্ড ত্যাগ করিয়া এক রাত্রি প্যারিসে থাকিয়া পরদিন জেনেভায় যান। সেখানে প্রদর্শনী দেখেন এবং প্রদর্শনীক্ষেত্রে দর্শকদের যে বেলুনে চড়ানো হইতেছিল, সেই বেলুনেও তাঁহারা সকলে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইসব ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত।

জেনেভায় স্বামীজী তিনদিন থাকেন। তাহার পর সেখান হইতে চল্লিশ

মাইল দূরে শার্মনিস নামে একটি গ্রামে যান। এই গ্রাম হইতে মঁ ব্লাঁ পর্বতের বরফে ঢাকা চূড়া চোখে পড়ে। পর্বতের সানুদেশে একটি হোটেল আছে। যাহারা পর্বতে উঠিতে চায়, তাহারা সেই হোটেলে আসিয়া আস্তানা নেয়, সেখানে পথপ্রদর্শকও আছে। কিন্তু স্বামীজীকে সেই পথপ্রদর্শকেরা জানাইল যে, পাহাড়ে ওঠা যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহারা ছাড়া আর কাহারও এই খাড়া এবং বরফে পিচ্ছিল পাহাড়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। স্বামীজীও সেকথা বুঝিতে পারিলেন।

যাহাই হউক, তাঁহারা বরফের উপর দিয়া হাঁটিবার আনন্দ উপভোগের সুযোগ ছাড়িলেন না। পর্বত-শিখরের নীচে যে স্তূপাকার বরফ জমিয়াছিল, সেই পথের উপব দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহারা বরফের স্তূপ পার হইয়া পার্বত্য অধিত্যকার একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে একটি ছোট হোটেল ছিল। হোটেলে এক কাপ চা পান করিতে পারিয়া তুষারের পথে ভ্রমণের পরিশ্রমের পর তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইলেন।

বরফ, বরফ, আর বরফ! চারিদিক যেন এক সাদা আস্তরণ দিয়া ঢাকা। সূর্যোদয় হইলে সেখানের যে অপূর্ব শোভা হয়, সে অতুলনীয় সৌন্দর্য গিরিরাজ হিমালয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজীর তখন কেবলই হিমালয়ের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সেই রুদ্রপ্রয়াগ, সেই কর্ণপ্রয়াগ ও সেই স্রোতবতী অলকানন্দা! ছয় বৎসর আগের সেই পার্বত্যপথে নিঃসম্বল ভ্রমণের দিনগুলি। সেইসব দিনের কাহিনী তিনি যখন তাঁহার সঙ্গীদের কাছে বলিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মনে একটা সংকল্প দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আমার খুবই ইচ্ছা যে, হিমালয়ে সন্ন্যাসীদের একটি আস্তানা হয়। সেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য ত্যাগী ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়ে নিজের নিজের দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচারের কার্যে প্রচারকরূপে গড়ে তুলতে হবে, আর আমার এই কর্মজীবনের শেষে অবসর নিয়ে সেইখানেই ধ্যান ও ভজনের মধ্যে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারবো।"

স্বামীজীর এই কথা শুনিয়া ক্যাপ্টেন সেভিয়ার উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এইরকম একটা মঠ আমাদের করতেই হবে।" ইহাই মায়াবতী আশ্রম স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা।

ইহার পর তাঁহারা সুইজারল্যান্ডের একটি গ্রামে প্রায় পনের দিন ছিলেন। সেই গ্রামে থাকিবার সময় স্বামীজী জার্মানীর 'কীল' নামক স্থান হইতে এক আমন্ত্রণ-পত্র পান। পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক পল ডয়সন। পল ডয়সন তাঁহাকে কীল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জন্য এবং তাঁহার বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থানের জন্য সেই পত্রে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সেই পত্রের উত্তরে স্বামীজী ইংলন্ডে ফিরিবার পথে কীলে যাইবেন, একথা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন।

অনবরত কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ইংলন্ডে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সুইজারল্যান্ডের জলবায়ুর গুণে ও বিশ্রামে কতকটা ভাল

হওয়ায় তিনি এখন আবার কাজের মধ্যেই ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন।

প্রথমে তিনি গেলেন লুকার্নে, তারপর জারমাট্টে, এটি সুইজারল্যাণ্ডের একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানটি দেখিয়া তিনি রাইন নদীর উৎস দেখিতে গেলেন এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থান হিডেলবার্গ দেখিয়া রাইন নদী পার হইয়া কোলানে গেলেন।

কোলান হইতে বার্লিন। বার্লিন তখন পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ নগর। জার্মান সৈন্যদল কিরূপ সুশিক্ষিত, কেমন তাহাদের শারীরিক গঠন, রণনৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা, জার্মান জাতি কিভাবে ঐকান্তিক সাধনায় শিল্প কল্যাবিদ্যা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, কি প্রবল তাহাদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা! স্বামীজী এ সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং নিজের দেশের সহিতও মনে মনে তুলনা করিয়াছিলেন।

এই অতি জ্বলন্ত দেশপ্রেম! সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে কি তাহা ঢাকা পড়িতে পারে? নিবেদিতা স্বামীজীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "একটি জিনিস আচার্যদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল—যাহা তিনি কিরূপে ঠিকভাবে রাখিবেন, তাহা নিজেই জানিতেন না। উহা তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্দশার প্রতিকারের ইচ্ছা। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম। দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া ছাড়িতেন না। তিনি "জাতীয়ত্ব" শব্দটিও ব্যবহার করিতেন না বা বর্তমান যুগকে 'জাতিগঠনের যুগ' বলিয়াও ঘোষণা করিতেন না; তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া।' কিন্তু তিনি মহাপ্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমিই ছিল তাঁহার আরাধ্য-দেবতা। একটি ঘণ্টাকে চারিদিকের ভার সমান করিয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন উহা যে কোন শব্দ দ্বারা তাড়িত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাঁহার জন্মভূমি-সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ হইত। ভারতের চারিসীমার মধ্যে যে কোন কাতর ধ্বনি উঠিত, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইত। ভারতের প্রত্যেক ভীতিসূচক চীৎকার, দুর্বলতাপ্রসূত কম্পন, অপমানজনিত সঙ্কোচবোধই তিনি জানিতেন ও অনুভব করিতেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই ভারতীয় প্রসঙ্গে তাঁহার সমান আনন্দ হইত—অথবা তাঁহার শ্রোতৃগণের সেইরূপ মনে হইত। তাঁহার এই সকল কথোপকথনে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখদিগের ধর্মবিশ্বাস, মারাঠাগণের শৌর্য, সাধুদিগের ঈশ্বরভক্তি এবং মহানুভবা নারীগণের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা—এই সমস্তই যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত। মুসলমানগণও এই প্রসঙ্গে বাদ পড়িতেন না। তিনি ভারতকে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেন, তাহার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু সে কেবল ঐ দোষগুলিকে অপরের

নয়, তাঁহার নিজেরই দোষ মনে করিতেন বলিয়া। পক্ষান্তরে, কেহই আবার তাঁহার ন্যায় ভারতের ভাবী মহিমা কল্পনায় অভিভূত হইতেন না। তাঁহার চক্ষে, হিমালয়ের অরণ্যানী-মধ্যস্থ এক পর্বতপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম "হর্ হর্" ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর ছাড়িয়া দেওয়াই আদর্শ মৃত্যু।"

নিবেদিতার এই বর্ণনায় স্বামীজীর যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, আছে কেবল এক পরিপূর্ণ অনুভূতি।

স্বামীজী কীলে পেঁাছিয়া সদলে একটি হোটেলে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু অধ্যাপক ডয়সন তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই তাঁহার বাড়িতে গিয়া প্রাতঃকালীন চা খাইবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, সেজন্য পরদিন সকালেই তাঁহারা অধ্যাপকের বাড়ি গেলেন।

অধ্যাপক ডয়সন একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, ভারতীয় দর্শনের তিনি বিশেষ ভক্ত। তিনি ইতিপূর্বেই সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তিনি উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ করিয়াছেন। ইনি ভারতের প্রতি এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে, নিজের ডয়সন নামের পরিবর্তে নিজেকে 'দেবসেনা" নামে উল্লেখ করিতেন। স্বামীজী যে কয়েকদিন অধ্যাপকের বাড়ি ছিলেন, সেই কয়েকদিন দুজনে অধিকাংশ সময় বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং এই অল্প কয়েকদিনেই উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল। স্বামীজী যখন বিদায় লইবার কথা বলিলেন, অধ্যাপক তখন তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্বামীজীর তখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা তিনি সেখানে গিয়া ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না। অগত্যা অধ্যাপক নিজেই ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "তা হলে আপনি প্রথমে হ্যামবুর্গে যান, সেখানে গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং দুজনে একসঙ্গেই ইংলণ্ডে রওনা হব।"

সেই অনুসারে স্বামীজী প্রথমে হ্যামবুর্গ গেলেন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং অধ্যাপক ডয়সনও সপরিবারে হ্যামবুর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হ্যামবুর্গ হইতে তাঁহারা প্রথমে গেলেন হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম শহরে। সেখানকার আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিলেন, স্থানীয় অনেকের সহিত স্বামীজীর পরিচয়ও হইল। এইভাবে যেখানে যখন স্বামীজী গিয়াছেন সেইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ রোপিত হইয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডনে তিনি সেভিয়ার দম্পতির হ্যামস্টেডের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া মিস মুলারের উইম্বলডনের বাড়িতে চলিয়া যান। এখানে থাকিবার

সময় "মানব-সভ্যতায় বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে দুই সপ্তাহে দুইটি বক্তৃতা দেন। নিয়মিত ক্লাসও আরম্ভ করেন, সেই সব ক্লাসে প্রধানত 'রাজযোগ' সম্বন্ধেই শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ছাত্রদের নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে হইলে কিভাবে চলা উচিত, সে সম্বন্ধেও স্বামীজী শিক্ষা দিতেন। যাহারা বিশেষ অধিকারী বলিয়া তাঁহার মনে হইত, তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও তপস্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে মিস্টার স্টার্ডি স্বামীজীর ক্লাস করিবার জন্য ৩৯নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি হল ভাড়া নিলেন এবং তারই কাছে ওয়েস্টমিনস্টারে ১৫নং গ্রে কোর্টগার্ডেনে সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর জন্য একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। এই সময় স্বামীজী 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে ধারাবাহিক-ভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং সেই বক্তৃতাগুলিই একত্র করিয়া 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

স্বামীজী এই সময় স্বামী অভেদানন্দকে লন্ডনে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন। বরাহনগরের মঠ হইতে তাঁহার গুরুভাইরা তখন আলমবাজারে গিয়াছেন। স্বামীজীর পত্র পাইয়াই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্য সকলে অভেদানন্দকে লন্ডনে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

স্বামী অভেদানন্দের গার্হস্থ্য-জীবনে নাম ছিল কালীপ্রসাদ। তাঁহার মা সন্তান-প্রাপ্তির জন্য শ্রীশ্রীকালীর অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন কালীপ্রসাদ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কালীপ্রসাদের জন্ম হয়। লন্ডন যাত্রার সময় তাঁহার মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। অল্প বয়সেই তিনি পায়ে হাঁটিয়া অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। তপস্যার দিকে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এজন্য তাঁহার গুরুভাইরা তাঁহাকে কালী-তপস্বী বলিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে একটি জন্মগত দার্শনিক ভাব ছিল; অল্পবয়সেই তাঁহার মনে 'কেন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণের সার্থকতা কি, সেই সার্থকতা লাভের উপায়ই বা কি?' এইরকম প্রশ্ন উদয় হইত। তিনি যখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, তখনই তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য এবং পাতঞ্জল-দর্শন প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থও তিনি সেই সময়ে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অ্যালবার্ট হলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া কালীর মন ধর্মসাধন এবং যোগাভ্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গুরু না থাকিলে ধর্মসাধনার পথ দেখাইবেন কে? উপযুক্ত গুরুই বা কোথায় পাইবেন? তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কোন গুরুর কথা জান?" উত্তরে যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "আমি একজনের কথা শুনেছি লোকে তাঁকে পরমহংস বলে। তিনি গঙ্গার ধারে

দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। শুনেছি তিনি নাকি একজন মহাপুরুষ।"

এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কোন পথে যাইতে হয় তাহা তিনি জানেন না। সোজাসুজি টালার পুল পার হইয়া একদিন খুব ভোরে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে সাতপুকুর নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এ পথ দক্ষিণেশ্বরের পথ নয়, তখন আবার তাহারই নির্দেশমত চলিতে চলিতে অবশেষে বেলা ১১টার সময় যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ফটকের কাছে আসিলেন তখন পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় শরীর একেবারে অবসন্ন। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, 'পরমহংস মহাশয় মন্দিরে নাই, তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন হয়তো রাত্রে ফিরিতে পারেন' তখন আর তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিল না।

ভগবানের দয়ায় এই সময় তাঁহার দেখা হইল শশী মহারাজের সহিত। শশী মহারাজও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঠাকুরের কাছেই আসিয়াছিলেন, তিনিও শুনিলেন ঠাকুর কলিকাতা গিয়াছেন। দুয়ারের কাছে কালীপ্রসাদ মাটিতে বসিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিয়া লইলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি এত কষ্ট করে যাঁকে দেখতে এসেছে তাঁর দেখা নিশ্চয়ই পাবে। এখন এস, দু'জনে গঙ্গায় স্নান করে আসি, তারপর মা কালীর প্রসাদ পেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি।"

সেইদিন রাত্রি নয়টার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন কালীপ্রসাদ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ইহার পর ২।৩ দিন অন্তর অন্তর কালী দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। আহিরীটোলায় নৌকায় উঠিয়া আসা যায়, কিন্তু নৌকা ভাড়া হয়ত হাতে থাকিত না, আবার বাবা ও মাকে না বলিয়া পলাইয়া আসা। এইভাবে তাঁহার দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। তাহার পর ক্রমশ অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় হইল এবং ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে তিনি তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু বাবুরামকেও দেখিয়া খুবই খুশী হইয়াছিলেন।

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ঠাকুরের অসুখের সময় যাঁহারা তাঁহার সেবার জন্য দিনরাত থাকিতেন কালীও সেই দলে ছিলেন। তিনি সেই সময় নরেন্দ্রনাথের উপর এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, সকল কাজে এমন কি ধ্যান-ধারণার ব্যাপারেও তাঁহার অনুকরণ করিতেন।

সেই তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুভাই আজ তাঁহাকে ইউরোপ হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কার্যে সহকারী হইবার জন্য, ইহাতে অভেদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না।

কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাট হইতে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে তিনি রওনা হইলেন।

নয়জন গুরুভাই তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য জাহাজঘাটে আসিয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ অভেদানন্দ ডেকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভেদানন্দ স্বামী ইংলণ্ডে পোঁছিয়া প্রথমে স্বামীজীর সঙ্গে মিস মুলারের বাড়িতেই ছিলেন, তাহার পর গ্রে কোর্টে গার্ডেনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হইলে স্বামীজীর সঙ্গে তিনিও সেই বাড়িতে গেলেন। এখানে কিছুদিন স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার কার্য পরিচালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই যখন স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা দানের দিন স্থির করিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, ২৭শে অক্টোবর ভারত হইতে আগত স্বামী অভেদানন্দ ব্লুমসবেরি স্কোয়ার ক্লাবে 'পঞ্চদশী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন" তখন অভেদানন্দ ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর উৎসাহদান তাঁহার মনে শক্তি সঞ্চার করিল, তিনি মনের সকল দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যদিও ইহার আগে কোনদিন তিনি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন নাই কিম্বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন নাই এবং যদিও সেই প্রথম বক্তৃতা কিন্তু সেটি এমন সাবলীল ভাষায় হৃদয়গ্রাহীভাবে বলা হইয়াছিল যে, বক্তৃতাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন স্বামীজী নিজে। তিনি এই বক্তৃতা শুনিয়া বলেছিলেনঃ—

"Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it".

"আমি এ জগৎ থেকে অন্তর্হিত হ'লেও এই সব প্রিয় অধরে আমার বাণী ধ্বনিত হবে এবং জগৎ তা শুনবে।"

স্বামীজীর এই দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মত মনীষী তখনকার দিনে ইংলণ্ডে খুব কমই ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার মত পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্যে আর কেহই ছিলেন না। ইনিই সর্বপ্রথমে ইংরেজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশ করেন। স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ শুনিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বামীজী ৩০শে মে তারিখের একখানি পত্রে ম্যাক্সমুলারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'য়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক। তাঁর বয়স সত্তর বৎসর হ'লেও তাঁকে যুবকের মত দেখায়। এমন কি তাঁর মুখে একটিও চিন্তার রেখা নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, তার অর্ধেকও যদি আমার থাকত!

"সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অপরিসীম এবং তিনি

'নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরিতে' তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি তাঁহাকে জগতের সম্মুখে প্রচার করিবার জন্য কি করিতেছেন?' "

"শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন ইহা কি একটি সুসংবাদ নয়?"

যে শক্তির প্রভাবে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে আকস্মিক এক অপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল সে কোন্ অপার্থিব শক্তি? তাহারই সন্ধানে ম্যাক্সমুলার প্রথমে যাঁহার সন্ধান পান তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনিই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের এইভাবে জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের এই আবিষ্কার তাঁহাকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তিনি যখন স্বামীজীর মুখে শুনিলেন যে, আজ হাজার হাজার লোক তাঁহার পূজারী হইয়াছে তখন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এমন লোক ছাড়া আর কাহাকে পূজা করবে?"

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার অক্সফোর্ডের বাড়িতে স্বামীজী ও মিস্টার স্টার্ডিকে লাঞ্চ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার বাসায় গেলে তিনি পরমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামীজী ও স্টার্ডিকে সঙ্গে লইয়া অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী দেখাইলেন, তারপর স্বামীজী যখন তাঁহাকে বিদায় জানাইয়া চলিয়া আসেন তখন তিনি তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী যখন তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া স্টেশন পর্যন্ত না আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন অধ্যাপক বলিয়াছিলেনঃ—

"রামকৃষ্ণের শিষ্যের দর্শন প্রতিদিন পাওয়া যায় না।"

স্বামীজী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেনঃ—

"অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার কি অসাধারণ মানুষ! কয়েকদিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা নয়,—আমি বোলবো—তাঁর প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যই গিয়েছিলাম—কেননা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি যে-কোনও জাতি, সম্প্রদায় বা মতেরই হউন না কেন, তাঁকে দর্শন করা আমার তীর্থ দর্শনেরই সমান। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা তে মে ভক্ত-তমাঃ মতাঃ।"

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাথমিক ইতিহাস

স্বামীজীকে ইউরোপে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। লণ্ডনের খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা এই হিন্দুযোগীকে নানা ভাবে যাচাই করিতে চাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইটি পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। একটি সাণ্ডে টাইমস্ ও অপরটি ইণ্ডিয়া। টাইমস্ পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁহাকে বলেন, "আমাদের ধারণা আপনি কোন নূতন ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন না।"

উত্তরে স্বামীজী বলেন,—

"এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের নীতি নয়, কারণ সম্প্রদায় তো অনেকই রয়েছে। আর সম্প্রদায় গঠন করতে গেলে তার কর্ম-পরিচালনের জন্য লোকের দরকার। ভেবে দেখুন, যারা সন্ন্যাস নিয়েছে অর্থাৎ পদমর্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নামযশ প্রভৃতি সবই ত্যাগ করেছে-আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তারা এ-রকম কাজের ভার নিতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ সকল কাজ যখন অন্যদের দ্বারা (গৃহীদের দ্বারা) চলছে।"

'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেন "কোন্ কোন্ দেশে স্বামীজী প্রচারকার্য করেছেন?" আরও জিজ্ঞাসা করেন, সেই সব দেশেই তিনি শিষ্য করেছেন কিনা? উত্তরে স্বামীজী বলেন,--"হ্যাঁ, শিষ্য করে এসেছি কিন্তু কোন দল গঠন করিনি। * * সম্প্রদায় ও দল যথেষ্টই আছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় করলেই পরিচালনের জন্য উপযুক্ত লোকের দরকার। যারা এই সব দলের পরিচালক হবে তারা ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি চাইবে। অপরের উপর প্রভুত্বের জন্য তারা প্রায়ই চেষ্টা করবে, এমন কি নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য পরস্পর লড়াই করবে।'

দল বা সম্প্রদায় গঠিত হইলে যে দোষগুলি হওয়া সম্ভব তাহা স্বামীজী জানিতেন তাই তিনি কোন সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা পছন্দ করেন নাই। এইরকম সম্প্রদায় গঠনের সহিত সন্ন্যাসধর্মের আপস হইতে পারে না একথাও তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘকে সম্প্রদায় বা দল অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু তবুও এটি একটি কর্মীসংঘ ইহা নিশ্চিত। কর্ম পরিচালনের ক্ষেত্রে অর্থের একান্ত প্রয়োজন, এবং অর্থ থাকিলেই সংগে সংগে কিছু না কিছু বৈষয়িক ব্যাপারও আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ যেন আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার গোড়ার দিকের ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে এ-কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবার আগের সময়ের দেশের অবস্থা কি ছিল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনার দরকার। হুতুম প্যাচার নক্সা, দীনবন্ধুবাবুর সধবার একাদশী এবং জামাই বারিক প্রভৃতি পড়িলে সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়।

তখন উচ্চশ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য ইঁহাদের জীবন যাপন প্রণালী কিরূপ ছিল? দীনবন্ধুবাবুর বইয়ের জীবন্ত আলেখ্য হইতে আমরা ধনী কায়স্থগণের সম্বন্ধে যে তথ্য পাই, তাহাতে দেখি সে সময়ের ধনী সন্তানগণের উচ্ছৃঙ্খলতা, কায়স্থগণের মধ্যে কুলীনগণের শ্রেণীবিভাগ, যেমন জম্মমুখ্যি, গর্ভমুখ্যি, নবরঙ্গের কুলীন, মধ্যাংস দ্বিতীয় পো প্রভৃতি। কৌলিন্যের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না, মৌলিকগণও বংশপতির সম্মান পাইবার জন্য অনেক কিছু করিতেন, জামাই বারিক নাটকে তাহার পরিচয় বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায়।

সে সময় ভদ্রসন্তানগণ কিভাবে স্পর্ধার সহিত মদ খাইয়া মাতাল হইতেন 'শিমলার অষ্টবসুর' পাড়ার নামেই তাহা বুঝা যায়। শিমলার ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসুগণ আটজন একত্র হইয়া পাল্লা দিয়া মদ্যপান করিতেন, তাহা হইতেই 'অষ্টবসু পাড়া' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ছিল তান্ত্রিক সাধনা ও ভৈরবী চক্র। দুর্গাপূজার নবমীর দিন অনেকের বাড়ি মহিষ বলিও হইত, পাঁঠা বলি সকলের বাড়িতেই হইত। সেই সময় মহিষ বা পাঁঠার রক্তাক্ত মুণ্ডে কাদা মাখাইয়া সেই মুণ্ড মাথায় লইয়া ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে পথে বাহির হইতেন, এবং পূজক পরিবারের আবালবৃদ্ধ এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া অশ্লীল গানে পল্লী মুখরিত করিতেন।

ইহা ছাড়া সমাজপতিগণের অনুশাসন এবং ছোঁয়াছুঁইর বিচার প্রবলভাবেই ছিল, স্বামীজী ইহাকেই 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়াছেন। নিমন্ত্রণ বাড়িতে আলুনি তরকারি করা হইত কেননা নুন দিলে তরকারি উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়। নিমন্ত্রণ করিলেও সকলে সকলের বাড়িতে যাইতেন না। প্রথম কথা, কোন কর্তাব্যক্তি আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কিনা, এবং নিমন্ত্রণটি ঠিক সম্মানসূচক হইয়াছে কিনা? যদি কোনও অল্পবয়স্ক আসিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন তবে কোন ছোট ছেলে পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইত। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ির গৃহিণীকেই পালকি করিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইত, আবার অপর দিকে ছাঁদা বাঁধিয়া খাবার লইয়া যাওয়ারও প্রথা ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে বলিতে গেলে, কতকগুলি আচার নিয়ম ও প্রথাই ছিল ধর্মের নামে প্রচলিত। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ এতদূর গড়াইয়াছিল যে, উভয় পক্ষই অপরের ধর্ম ও দেবতাকে হেয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজই ছিল ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণের আশ্রয় স্থান। ডিরোজীয়োর ছাত্রগণ হিন্দুধর্মের আচার লঙ্ঘন করাকেই সাহসের পরিচয় দান বলিয়া মনে করিতেন এবং বৃটিশ মিশনারীগণের প্রচারকার্য শহর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত

হইতেছিল, এই প্রচারের প্রধান বিষয়ই ছিল 'হিন্দুধর্ম'কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

এক কথায় দেশ কুসংস্কার, পরানুকরণ, উচ্ছৃংখলতা ও কদর্য মনোভাবের মধ্যে যখন একেবারে ডুবিতে বসিয়াছে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং গীতার—

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

বাণীটি তাঁহার জন্মগ্রহণে সার্থক হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সূচনা হয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে, এগারো নম্বর মধু রায় লেনে। এই বাড়িতেই সর্বদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিতেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আবহাওয়া এমন হইয়া যাইত যে যাঁহারা সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদের সকলেরই মনে হইত, তাঁহারা যেন একই পরিবারের লোক। তখন যেন এমন এক পবিত্রতা ও ভালবাসার পারিপার্শ্বিক আপনা হইতেই সৃষ্টি হইত যে হীন মনোভাব সে স্থান হইতে দূর হইয়া যাইত।

যাঁহারা সে সময় রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে আসিতেন তাঁহাদের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইত না কেবল এই কথাটি বলিলেই হইত যে, "অমুকদিন পরমহংসমশাই রাম ডাক্তারের বাড়িতে আসিবেন।"

দর্শনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল, চল্লিশ পঞ্চাশ হইতে ক্রমে একশো দেড়শো লোক হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মেয়েরাও আসিতে লাগিলেন। দর্শন ও কীর্তন প্রভৃতির শেষে সকলেই ছাদে গিয়া খাইতে বসিতেন। সে যেন এক পারিবারিক প্রীতিভোজন।

স্বামীজীর ভ্রাতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সেই সময়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি প্রতিদিনই সেই আনন্দ-সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে এখানে সামান্য কিছু তুলিয়া দিতেছিঃ—

"আমরা যখন ছাদে খাইতে যাইলাম, তখন দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন। অন্য পাড়ার দু' পাঁচজন লোকও তাহার ভিতর আছেন। অবশ্য নিরামিশ রান্না—লুচি তরকারি ইত্যাদি হইয়াছিল। তখন এরকমভাবে একত্র খাওয়ার প্রথা ছিল না। তখন বাড়িতে যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবার প্রথা ছিল; কিন্তু দেখিলাম যে, এখানে সকলে অ-নিমন্ত্রিতভাবে খাইতেছেন। * * যজ্ঞিবাড়ির বেগারঠেলার খাওয়াতে ও এ-খাওয়াতে অনেক তফাৎ বোধ হইল। এখানে যেন সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া খাইতেছেন, কেহই অবজ্ঞার ভাবে খাইতেছেন না। যে সকল লোক একসঙ্গে খাইতেছিলেন তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর একটা টান দেখা গেল, যেন সকলেই নিজের লোক। * * পরমহংস মশাইর প্রতি যেমন একটি আন্তরিক আকর্ষণ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রতিও সেইরূপ আকর্ষণ হইয়াছিল। এইভাবে পরমহংস মশাই-র একটি আত্মগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। * * দুই তিনজন এক সঙ্গে বসিয়া

'পরমহংস মশাই'-এর সম্বন্ধে কথাবার্তা বড় আনন্দের বিষয় ছিল। রাস্তায় দেখা হইলে পরমহংস মশাইয়ের কথাই হইত। * * অন্য কোন কথা বা সামাজিকতা এসব আর ভাল লাগিত না। নিজেরা যেন অন্য এক রাজ্যের লোক। * * এইভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে লাগিল।"

ঠাকুরের অসুস্থতার সময় কাশীপুরের বাগানে এই সঙ্ঘ বেশ জমাট হইয়াছিল এবং ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পরের আত্মীয়তা এমন দৃঢ় হইয়াছিল যে, কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন না।

ঠাকুরের অদর্শনের পর স্বামীজী স্বতই এই সঙ্ঘের পরিচালক হইয়াছিলেন, যেন নিজের ইচ্ছায় নয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই প্রেরণায়। স্বামীজী যখন "তুই কি চাস্" ঠাকুরের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি সর্বদা সমাধিস্থ হ'য়েই থাক্‌তে চাই।" উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন "বলিস্ কিরে? এত ছোট অধিকার চাইবি তুই?" ঠাকুরের এই কথার ভিতরই সেই তাৎপর্য রহিয়াছে—'নিজের জন্য নরেনের দেহ ধারণ নয়, তার দেহধারণ জগতের হিতের জন্য।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক ছিল কোন ভাষাই সে সম্পর্কের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন, "জন্মে জন্মে দয়ানিধে, আমি দাস তব।" আবার ইহাও বলিয়াছেন—"সত্য বটে আমার নিজের জীবন এক মহাপুরুষের ভাবরাশির অনুপ্রেরণায় চলছে, কিন্তু তা'তে কি? ঈশ্বরীয় ভাবসমূহ শুধু এক ব্যক্তির মধ্য দিয়েই জগতে প্রচারিত হয়নি! * * সত্য বটে আমি বিশ্বাস করি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আপ্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমিও একজন আপ্ত এবং তুমিও আপ্ত।"

প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের মহিমায় মহীয়ান্, যদি তাহার নিজের 'মনুষ্যত্ব' সবন্ধে উপলব্ধি জাগ্রত হয়। স্বামীজী বার বার বলিয়াছেন, "আমার একমাত্র কাজ মানুষ করে মানুষকে গড়ে তোলা।" স্বামীজী পূজ্যপাদ অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলিয়াছিলেন, "বাংলার যুবকদের হাড় দিয়ে যে বজ্র তৈরি হবে সেই বজ্রের প্রভাবেই ভারতবর্ষের অধীনতা ঘুচে যাবে।"

তিনি বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা ভিন্ন কোনো উন্নতিই সম্ভব হয় না।" তিনি বলিয়াছেন, "উন্নতির প্রধান সহায়--স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করবার এবং সেই চিন্তাকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, সেইরকম তার খাওয়া, পোশাকপরা, বিবাহ এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতাও প্রয়োজন-- যতক্ষণ না সেই স্বাধীনতায় অন্যের অনিষ্টের কারণ হয়।" তিনি তাঁর একখানা পত্রে লিখিয়াছেন, "কাজে ও চিন্তায় স্বাধীনতাই হচ্ছে জীবনের উন্নতির ও কল্যাণের একমাত্র উপায়। যে মানুষের, যে সমাজের বা জাতির তা নেই তার অধঃপতন নিশ্চিত।"

ইহার সহিত তিনি আজ্ঞাবহতার উপরও বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। আজ্ঞাবহতাই সঙ্ঘবদ্ধ হবার শক্তির উৎস। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিলে

সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে না। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় ও কার্যে যেন স্বাধীন থাকিতে পারে, যে কোন জাতির জাতীয় উন্নতির পক্ষে সেটি একান্ত প্রয়োজন, সেই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও কাজ করিতে হইলে আজ্ঞাবহতাও একান্ত প্রয়োজন। স্বামীজী তাঁহার একজন মাদ্রাজী শিষ্য ডাক্তার নঞ্জুন্ডায়াকে ১৮৯৬ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল একখানা পত্র লিখিয়াছিলেনঃ—

"ভারতবর্ষে একটি বিষয়ে আমরা খুব পেছিয়ে আছি। সেটি হচ্ছে, সকলে মিলে মিশে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করবার শক্তির অভাব এবং তা আনবার প্রথম উপায় হচ্ছে আজ্ঞাবহতা। * * সাহস করে এগিয়ে যাও, একদিনে বা এক-বৎসরে সফলতার আশা কোর না। উচ্চ আদর্শের দিকেই সব সময় লক্ষ্য রাখ। কাজে লেগে থাক। ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, সত্য, মানবজাতি এবং তোমার দেশের চির বিশ্বস্ত আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যদি কাজ করে যেতে পার তা হলে তুমি জগতের ধারাই পরিবর্তন করে দিতে পারবে। মনে রেখো মানুষ—মানুষের জীবন—ইহাই সকল শক্তির গোপন ভাণ্ডার—অন্য কিছুই নয়।"

ভগবানের অমূল্য দান এই মানব জীবন, ভারতবর্ষে এই জীবনরূপ সম্পদের কিভাবেই না অপচয হইতেছে! পাশ্চাত্ত্যে বিশেষত আমেরিকায় অর্থ ও বিলাসের প্রাচুর্যের সীমা পরিসীমা নাই। সেই দেশে আসিয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্য যে কি ভীষণ সকল সময়ই স্বামীজী তাহা অনুভব করিয়াছেন। স্বামীজী আমেরিকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তোমরা ভারতের সর্বত্র গীর্জা তৈরি করছো (অর্থাৎ দলে দলে ধর্মপ্রচারক পাঠাচ্ছ) কিন্তু প্রাচ্যের নিদারুণ অভাব ধর্মের অভাব নয় –তাদের ধর্ম যথেষ্টই আছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী আজ অন্নের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে, ভারতবাসী শুষ্ককণ্ঠে আর্তনাদ করছে অন্ন! অন্ন! তারা অন্ন চায়, তার বদলে পাচ্ছে কাঁকর! অন্নের অভাবে যে উপবাসী, তাকে ধর্মের উপদেশ দিতে যাওয়া মানেই তাকে অপমান করা। * * ভারতবর্ষ সেই দেশ,—যে দেশে যদি কোন ধর্মপ্রচারক অর্থের বিনিময়ে ধর্মপ্রচার করে তবে সে জাতিচ্যুত হয়, লোকে তার গায়ে থুতু দেয়। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীদের জন্য সাহায্য চাইতে এদেশে এসেছি এবং একথা বেশ বুঝেছি যে খৃষ্টান দেশে খৃষ্টানদের কাছ থেকে—যাদের তারা 'হিদেন' অর্থাৎ ঘৃণ্য অপদেবতার উপাসক বলে গালাগালি দেয়, সেই ভারতবাসীদের জন্য সাহায্য পাওয়া কত কঠিন।"

এটি একটি অগ্নিগর্ভ ভাষণ, যাহাতে স্বামীজীর অন্তরের দহনজ্বালার কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া। ভারতের অভাব যে কেবল অন্নের অভাবই নয়—(যদিও প্রধানত অন্নের অভাবই সকল অভাবের মূল কারণ) সে সম্বন্ধেও স্বামীজী যেমন মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন আর কয়জন অনুভব করিয়াছেন? ভারত ভাবুকের দেশ, কিন্তু ভারতের সেই ভাবুকতা ক্লৈব্যতায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন প্রথা ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কারই ধর্মের নামে চলিয়া আসিতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান

এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পাশেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে তখন তৃষ্ণার্ত লোকগুলাকে নর্দামার পচা জল খাওয়ান কেন? * * আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পূতিগন্ধময় ও গতায়ু ভাবরাশির সমর্থন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমার অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। * * হায়! যদি দ্বাদশজন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!"

স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পবিত্রাত্মা নরনারীগণ যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিতে পারেন—সেই মহান্ কার্যে দলে দলে অগ্রসর হইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"A hundred thousand men and women fired with the zeal of holiness fortified with eternal faith in the Lord and nerve to lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the down trodden, will go over the length and the breadth of the land, and preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up the gospel of equality."
ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য স্বামীজী প্রস্তুত হইতেছেন এবং স্বদেশে ফিরিয়া কিভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন তাহার একটা তালিকা করিয়া লইয়াছেন, গুরু-ভাইদেরও সে সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। সেই তালিকাটি এইঃ—

১। **বেদান্ত প্রচার।** স্বামীজী বেদান্ত প্রচারকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছেন, কেননা বেদান্ত প্রচারই দেশবাসীকে বীর্যবান, দুর্বলতাজয়ী ও ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিবে।

২। **স্বাধীনতা।** ভারতবর্ষ পরাধীন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনা করিবার প্রথম সোপান নিজেকে সর্ববিষয়ের পরাধীনতা হইতে মুক্ত করা। শত বৎসরের দাসত্বে মানুষ এমনভাবে দাসমনোভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজের যে-একটা বিচারবুদ্ধি আছে তাহাই ভুলিয়া গিয়াছে। সে হইয়াছে সংস্কারের দাস, অভ্যাসের দাস, বিলাসিতা ও আরামের দাস। স্বামীজী বলিয়াছেন — "খাদ্যাখাদ্যের বিচারও অনেকটা দাসমনোভাবের কারণ; মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন কিন্তু শত বৎসরের দাসত্ব কি সেই সব প্রাণী হত্যার চেয়ে অধিক ভয়ানক নয়। যাঁহারা ধনী, আহার্য সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না, তাঁহারা খান আর নাই খান তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু যাহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের বলপূর্বক নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। চাই মহাতেজ, মহাবীর্য এবং

অদম্য উৎসাহ। উত্তম খাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য একটা জাতিকে কি ভাবে কর্মকুশল করিতে পারে জাপান তাহার দৃষ্টান্ত।"

৩। **আত্মাবহতা।**

৪। **অস্পৃশ্যতা বর্জন।** স্বামীজী বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপে আজ দেশ ডুবতে বসেছে।" তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর আমেরিকা হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে—"হে ভগবান, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুর মত মানুষগুলি হাড়ি ডোম প্রভৃতি তোমার বাড়ির চারিদিকেই যারা রয়েছে তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ? তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য তোমরা কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূর দূর কর। ঐ যে রয়েছেন তোমাদের হাজার হাজার সাধু আর ব্রাহ্মণ, তাঁরা এই পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? কেবল বলছেন, 'ছুঁয়োনা, আমাকে ছুঁয়োনা।"

স্বামীজী একথাও বলিয়াছেন, "বাহ্য সভ্যতাও আবশ্যক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের অন্ন সংস্থান হয়। অন্ন! অন্ন! যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ভাবতকে উঠাইতে হইলে গরীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে, ব্রাহ্মণই হোন—সন্ন্যাসীই হোন আর যিনিই হোন।"

৫। **শিক্ষা বিস্তার।** নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয় সে জন্য তিনি তাঁহার এক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, "তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একটি ফান্ড করবার চেষ্টা কর। শহবের যে অংশে সর্বাপেক্ষা দরিদ্রদের বাস সেখানে একটি মাটির ঘর ও একটা চালা প্রস্তুত কর, আর গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ আর গ্লোব আর কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় ক'রে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গরিবদের জড় কর; নিম্ন জাতি এমন কি চাঁড়ালদেরও জড় করবে, তাদের প্রথমে ধর্মউপদেশ দেবে। তারপর জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দেবে।"

৬। গ্রাম্য শিল্প ও কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার।

৭। নারী জাতির উন্নতি ও নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার।

ব্রহ্মচারিণী মঠ প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর বহুদিনের কল্পনা। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "যেদিন থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল—মেয়ে পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ মূর্খ বিদ্বান ভেদ,—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ সব তিনি এসে দূর করে দিয়ে গেলেন। তিনি বিবাদ ভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান কি ক্রিশ্চান এসব

ভেদাভেদ চলে গেল। * * ভারতে দুই মহাপাপ, এক মেয়েদের পায়ে দলা, আর এক 'জাতি জাতি' করে গরিবদের পিষে মারা।"

তিনি আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "মেয়েদের অবস্থার উন্নতি না করলে পৃথিবীর মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নাই। পাখি এক ডানায় ভর দিয়ে কখনই উড়তে পারে না।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে এজন স্ত্রীলোককে গুরুরূপে গ্রহণ, মেয়েমানুষের বেশ ধারণ করে স্ত্রীভাবে সাধনা, ইহাতে মা জগদম্বার প্রতিনিধিস্বরূপা সমস্ত নারীই যে মাতৃস্থানীয়া ইহাই প্রচারিত হয়েছে।

"সেই হেতু মেয়েদের জন্যে একটি মঠ স্থাপন করাই আমার প্রথম প্রচেষ্টা। এই মঠে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত এমন কি তাঁদের চেয়ে উচ্চাবস্থার মেয়েও সব তৈরী হবে।"

তিনি আরও যে যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি হইল ভারতবর্ষের তিন দিকে তিনটি প্রধান স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তিনটি কেন্দ্র স্থাপন। দুটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে টাকা দরকার তাহা তিনি ওদেশ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৃতীয়টির জন্য তখনও টাকার সংস্থান হয় নাই, তিনি সে টাকা ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই কেন্দ্রের একটি হইবে হিমালয় প্রদেশে। সেভিয়ার দম্পতির সহিত সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। স্বামীজী একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন (১৮৯৬ খৃঃ ২০শে নবেম্বর) "মিস্টার সেভিয়ার এবং তাঁহার স্ত্রী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে একটি স্থান ঠিক করেছেন— যেটিকে আমি আমার হিমালয়ের কেন্দ্র করতে চাই। সেটি পাশ্চাত্ত্য দেশীয় ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণের স্থান হবে। গুডউইন একজন অবিবাহিত যুবক। সে আমার কাছে থাকবে ও আমার সঙ্গে বেড়াবে। সে একরকম সন্ন্যাসীই।"

"উইম্বলডনের মিস্ এম্ নোবল্ একজন বড় কর্মী।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসবের আগেই কলিকাতা পেৌঁছিবার জন্য আমি খুবই উৎসুক। আমার বর্তমান কর্মপন্থা হবে দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করা—একটি কলিকাতায় ও অপরটি মাদ্রাজে। এই দুই কেন্দ্রেই যুবক প্রচারকগণকে শিক্ষা দেওয়া হবে। কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের কর্মক্ষেত্র, সেদিকে আমার সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে। এবং কলকাতায় একটা কেন্দ্র করবার জন্য আবশ্যকীয় অর্থ আমার কাছে আছে। মাদ্রাজের কেন্দ্রটির জন্য ভারতবর্ষ থেকেই টাকা পাব বলে আশা করছি।

"আমরা এই তিনটি কেন্দ্র (হিমালয়, কলিকাতা ও মাদ্রাজ) থেকে কার্য আরম্ভ করবো। পরে বোম্বে ও এলাহাবাদে আমরা কেন্দ্র করবো। যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হয় এই সকল কেন্দ্র থেকে আমরা যে কেবল ভারতবর্ষেই

অভিযান করবো তা নয় পরন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশে দলে দলে প্রচারক পাঠাব। এইটি আমাদের প্রথম কর্তব্য। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাও।"

"বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় আমাদের একখানি পত্রিকা আছে, (ব্রহ্মবাদিন)। দেশীয় ভাষার আমরা কতকগুলি পত্রিকা পরে বার করতে পারি।"

স্বামীজীর সংকল্পিত এই তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল ঃ হিমালয়ে "মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম," কলিকাতায় গঙ্গাতীরে "বেলুড় মঠ" এবং মাদ্রাজে "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।"

যদিও স্বামীজী কলিকাতার কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পত্রে এমন নির্দেশ নাই যে, "বেলুড় মঠ"-ই সকল কেন্দ্রের পরিচালক হইবে, বরং তাঁহার আর একখানি পত্রে "আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী।" এই কথাটি পাওয়া যায়।

এই সময় স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কেননা ভারতবর্ষে তখনও কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। আলমবাজার মঠে তাঁহার গুরুভাইরা আছেন, কিন্তু সেটি অস্থায়ী আশ্রয়, তাকে কেন্দ্র বলা চলে না। মিসেস অলিবুলকে তিনি এক পত্রে ভারতে ফিরিয়া যাইবার কথা জানাইয়াছিলেন, ঐ পত্রের উত্তরে মিসেস অলিবুল তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের জন্য যদি কলিকাতার কোন স্থানে একটি আশ্রম করেন, তাহা হইলে সেই আশ্রম স্থাপনের জন্য যে টাকার দরকার তাহা মিসেস অলিবুল দিতে চাহিলে স্বামীজী তাঁহার সে আবেদন গ্রহণ কবিলেন কিনা?

স্বামীজী তাঁহার সেই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"তোমার এই অতি মহৎ প্রস্তাবে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনাবশ্যক।

"প্রথমেই খুব বেশী টাকায় আমি নিজেকে জড়িত করতে চাই না। যেমন যেমন কাজ অগ্রসর হবে সেইভাবে আমি ঐ টাকা খুব আনন্দের সঙ্গে কাজে লাগাব। আমার কার্যপ্রণালী কি রকম হবে এবং কিভাবে তা সফলতা লাভ করবে এ সম্বন্ধে আমি ভারতবর্ষে গিয়ে তোমাকে বিস্তারিতভাবে জানাব।

"১৬ই ডিসেবর এখান থেকে রওনা হ'য়ে ইটালী পে'ছে নেপ্‌লসে স্টীমার ধরবো।"

নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে চারখানা টিকিট কিনিতে বলিলেন ; এই চারখানা টিকিট কেনা হইল নেপল্‌ হইতে যে জাহাজ কলম্বো শীঘ্রই রওনা হইবে তাহারই বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্য। বরাবর জাহাজে গেলে ভারতে পে'ছিতে দেরি হইবে এজন্য স্বামীজী নেপলস্‌ পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন। চারখানা টিকিট স্বামীজী, জেমস্‌ গুডউইন ও মিস্টার সেভিয়ার এবং মিসেস সেভিয়ার এই চারজনের জন্য।

স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন এ সংবাদ লণ্ডনে প্রচারিত হইল। স্বামীজীর যাহারা বন্ধু এবং শিষ্য তাঁহারা ঠিক করিলেন এতদিন যে মহাপুরুষ

তাঁহাদের সঙ্গ দান করিয়া মানুষের প্রকৃত উন্নতি কোন্ পথে সে সম্বন্ধে শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছেন তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিতে হইবে। সেই সময় তিনি যে কতখানি দিয়াছেন এবং সেই দান তাঁহাদের পক্ষে কি অমূল্য সম্পদ তাহাও তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ভাষায় মনের ভাব যতখানি প্রকাশ করা যায় ততখানি প্রকাশ করিতে হইবে তাহাদের অসীম কৃতজ্ঞতা ও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা।

স্বামীজীর প্রিয় বন্ধু মিস্টার স্টার্ডি এই অভিনন্দন দান ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অভিনন্দনটি রচনা করিলেন জেমস গুড্উইন। পিকাডিলিতে 'রয়েল সোসাইটি অব্ পেণ্টার্স ইন্ ওয়াটার কলার' সমিতির ভবনে সাধারণ সভায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর অভিনন্দন দিবার দিন স্থির হইল।

সেদিন পিকাডিলি হল লোকে লোকারণ্য। এত ভিড়েও কোন গোলমাল ছিল না। অতি প্রিয়জন দূরদেশে চলিয়া যাইতেছেন তাহারই বিদায়ের এই আয়োজন, সভায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছিল।

স্বামীজী যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন অস্ফুট কলরব উঠিল, "ঐ আসছেন, ঐ আসছেন।" স্বামীজী আসন গ্রহণ করিবার পর মিস্টার এইচ বি এম বুকানন সভাপতি মিস্টার স্টার্ডিকে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্রখানি স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং মিসেস জি সি এ্যাশ্টন জনসন সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র অর্পণ করা হইল, এবং তুমুল করতালি ধ্বনিতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাহা সমর্থিত হইল।

অভিনন্দনপত্রের উত্তর দিবার জন্য স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সেটি অবশ্য অভিনন্দনকে উপলক্ষ করিয়াই বলা হইল কিন্তু তাহার বিষয় ছিল 'অদ্বৈত বেদান্ত।' জগতে 'দুই' বলিয়া যাহা কিছু তা অধ্যাস মাত্র, প্রকৃত 'দুই' বলিয়া কিছু নাই। দেশকালের ভেদ, বাহিরের যত কিছু পার্থক্য সকলেই এক পরম 'একে'রই বিভিন্নরূপে প্রকাশ।

এই বক্তৃতাই লণ্ডনে স্বামীজীর শেষ বক্তৃতা। দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইবার সময় যখন তিনি লণ্ডনে আসেন তখন তিনি কোন বক্তৃতা করেন নাই। এই দিনের বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে শ্রোতাগণ যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, করতালিধ্বনি পর্যন্ত শোনা যায় নাই। বক্তৃতার শেষে সমস্বরে অনুরোধ শোনা গেল, 'স্বামীজী, আবার আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে।"

স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিন স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য লণ্ডন ত্যাগ করেন।

নেপ্‌ল্‌স পর্যন্ত ট্রেনে গিয়া সেখান হইতে জাহাজে উঠিবেন ইহাই ঠিক করা হইল। লণ্ডন ত্যাগ করিবার আগে স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দের হাতে সমস্ত কার্যভার অর্পণ করিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশে কিভাবে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে নিয়ত স্বামীজীর সঙ্গে থাকিয়া তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সে দিক দিয়া চিন্তার কোন কারণ নাই। ভারতের চিন্তা ছাড়া স্বামীজীর মনে তখন আর অন্য কোন চিন্তাই ছিল না।

মিস্টার সেভিয়ারকে স্বামীজী বলিলেনঃ

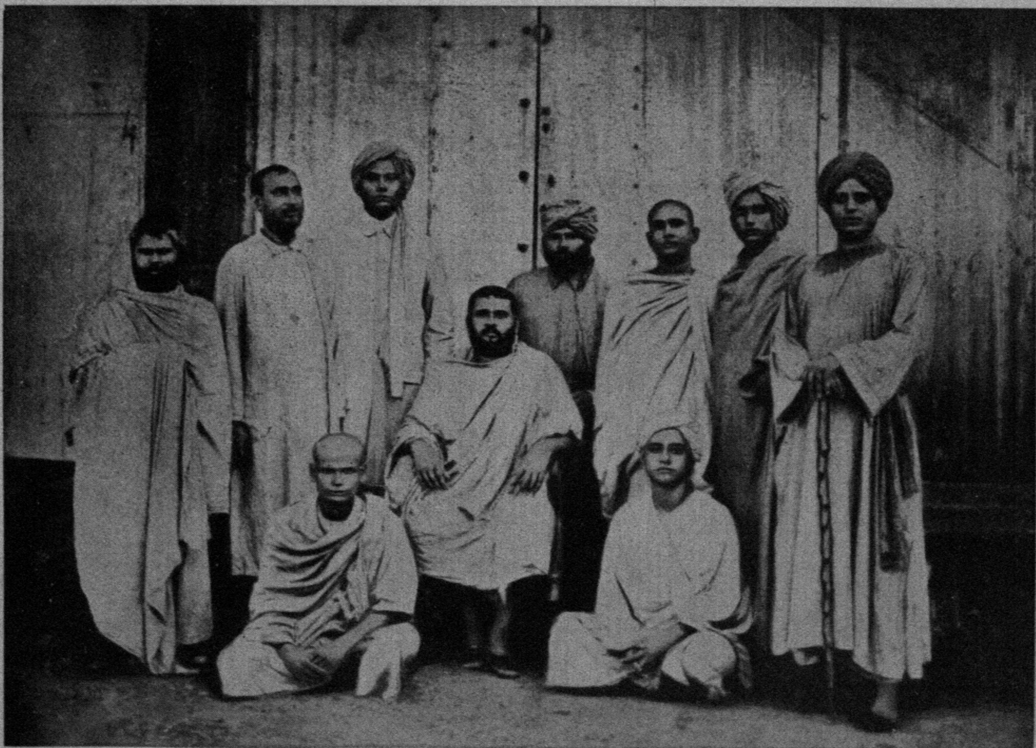
"আমার এখন একমাত্র ধ্যান—ভারতবর্ষ! আমার মন দৌড়চ্ছে ভারতের দিকে, ভারতের দিকে!"

ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থে সমবেত ইংরেজ বন্ধুদের একজন যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, এই দীর্ঘকাল—প্রায় চারি বৎসর আপনি পাশ্চাত্ত্যে এমন বীর্যবান, গৌরবান্বিত ও বিলাসী পাশ্চাত্ত্য জাতির সঙ্গে বাস করেছেন—এরপর আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে কেমন লাগবে?"

উত্তরে স্বামীজী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার আগে আমি সমগ্র ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণাও আমার কাছে পবিত্র।"

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ডোভার পার হইয়া তাঁহারা ক্যালে পৌঁছিলেন, সেখান হইতে মিলান। মিলানে পৌঁছিয়া মিলানের বিখ্যাত গির্জা দেখিলেন, তাহার পর ইটালীর কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখিয়া ফ্লোরেন্সে আসিলেন।

ফ্লোরেন্স অতি নয়নমনোহর স্থান। লণ্ডন ও অন্যান্য দেশ হইতে বহু পর্যটক ফ্লোরেন্সে আসেন। স্বামীজীর এখানে একটি পার্কে আমেরিকা নিবাসী হেল দম্পতির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। মিসেস হেল, ইনিই স্বামীজীর চিকাগোর জনারণ্যে প্রথম আশ্রয়দাত্রী। স্বামীজী যখন চিকাগো শহরে ধর্ম-মহাসভার ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথ খুঁজিতে খুঁজিতে পথভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবসন্নদেহে পথের ধারে এক গাছতলায় আশ্রয় লইয়া-ছিলেন, সেই সময় অপরিচিতা যে মহিলা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলেন ও নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আতিথ্য দান করিয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন, ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম-



স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকা যাত্রার সময় গৃহীত। চেয়ারে উপবিষ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ।
দণ্ডায়মান — স্বামী অদ্ভুতানন্দ, যোগানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীত, তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ।
উপবিষ্ট— স্বামী সুবোধানন্দ, অখণ্ডানন্দ।



আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামদিকে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দণ্ডায়মান ও সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট মাদার সেভিয়ার

মহাসভায় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই মিসেস হেল। এই মিসেস হেল, তাঁহার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল, তাই এই অভাবনীয় সাক্ষাতে উভয় পক্ষই যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইঁহারা ফ্লোরেন্সে বেড়াইতে আসিয়াছেন, স্বামীজীর সঙ্গে অনেকদিন পরে এইভাবে দেখা হওয়ায় তাঁহাদের যত কিছু বলিবার ও জানিবার ছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই সব কথাবার্তা চলিল।

ফ্লোরেন্স হইতে স্বামীজী রোমে গেলেন এবং রোম হইতে নেপল্‌সে গিয়া জাহাজ ছাড়ার দেরী আছে দেখিয়া সেখানেও কয়েকদিন থাকিলেন। মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু গুডউইন সাউদাম্পটান হইতে জাহাজে আসিয়া নেপল্‌সে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া ঠিক করা হইয়াছিল। সাউদাম্পটানের জাহাজ যখন নেপল্‌সে পেঁছিল, গুডউইনও সেই জাহাজে নেপল্‌সে পেঁছিলেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা সকলে একত্রে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

জাহাজে একঘেয়ে দিন কাটানোর জন্য নানারকম খেলার ব্যবস্থা থাকে। দাবা খেলাটাই স্বামীজীর পছন্দ ছিল, দাবা খেলায় খুব কম খেলোয়াড়ই তাঁহাকে হারাইতে পারিতেন। তা ছাড়া ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

কয়েক দিন পরে জাহাজ এডেন বন্দরে পেঁছিল। এখানে কয়েক ঘণ্টা জাহাজ নোঙর বাঁধিবে। যাত্রীরা শহর দেখিবার জন্য এডেনে নামিলেন। স্বামীজীও জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে প্রায় মাইল তিনেক পথ গিয়া এক পুষ্করিণীর কাছে একটা পানের দোকান দেখিতে পাইলেন। পানওয়ালাকে দেখিয়া তাঁহার ভারতবাসী বলিয়া মনে হইল। কাছে গিয়া দেখিলেন ভারতীয়ই বটে, ভারতের পশ্চিম প্রদেশের লোক। সে তাহার দোকানে বসিয়া পান বিক্রি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে একটা ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছে।

স্বামীজী তাহার দিকে এত তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন যে, তাঁহার সঙ্গী তিনজন অনেক পিছনে পড়িয়া রহিলেন। দোকানে গিয়াই স্বামীজী তাহার পাশের একটা তক্তার উপর বসিয়া পড়িয়া তাহাকে বলিলেন, "ভাই, তুমি আমাকে এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পার?"

কতদিন হইল স্বামীজী এমনভাবে হুঁকায় তামাক খান নাই। বরানগরের ভাঙা বাড়িতে অন্ন জুটুক বা নাই জুটুক দা-কাটা তামাক খানিকটা সংগ্রহ করা থাকিত। একটা পুরানো গড়গড়াও ছিল। সেই হুঁকায় সকলেই একজনের পর আর একজন তামাক খাইতেন, এই তামাক খাওয়াটাই ছিল সেই সর্বত্যাগী তরুণ সন্ন্যাসিগণের একমাত্র বিলাস।

পানওয়ালা তখনই তাঁহার কাছে হুঁকাটি আগাইয়া দিল, আর স্বামীজী

তামাক টানিতে টানিতে হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন,—কোথায় তাহার ঘর,—বাড়িতে কে কে আছে,—এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে কেমন করিয়া ইত্যাদি। পানওয়ালাও মহাখুশী, এতদিন পরে দেশের একজন লোকের কাছে ঘর-গহস্থালির আলোচনা কি কম আনন্দের? ইতিমধ্যে মিস্টার সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন আসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। অবশ্য স্বামীজীর কোন কাজেই তাঁহারা কখনও অবাক হইতেন না।

জাহাজ এডেন ছাড়িল। ক্রমে আসিয়া পড়িল আরব সাগরে। আরও কিছু দূরে এই আরব সাগরের তীরেই দ্বারকাধাম এবং প্রভাসতীর্থ। এই সব তীর্থ স্বামীজী পায়ে হাঁটিয়া দর্শন করিয়াছেন, পথে গৃহস্থের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছেন। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে ভারতবর্ষের দক্ষিণের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারী তীর্থ। সেই তীর্থের সঙ্গমের জলে অর্ধমগ্ন এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া যেদিন স্বামীজী ধ্যানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, সেই ধ্যানের চিন্তাই কি এখন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে?

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পনেরোই জানুয়ারী উষার অরুণোদয়ের পূর্বমুহূর্তে। স্বামীজী ডেকের উপর অনবরত পাদচারণ করিতেছেন। এমন সময় দূর দিগন্তে—যেন অস্পষ্টভাবে কি একটা তাঁহার নজরে পড়িল। যেখানে সাগরের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে—সেখানে সেই জলরাশির বুকের উপর ঐ কি যেন দেখা যাইতেছে, ঐ কি ভারতবর্ষের তটরেখা? অন্য অনেক যাত্রীও এই সময় ডেকে সমাসীন, তাঁহারাও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেই স্থানটি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "হ্যাঁ, কলম্বো বন্দরই দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা নাগাদ জাহাজ পেঁৗছে যাবে কলম্বো।"

স্বামীজীর ভারতীয় সকল প্রদেশের বন্ধুগণ এবং তাঁহার গুরুভাইরা পূর্বেই তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়াছেন এবং কোন্ জাহাজে ও কোন্ সময়ে যে তিনি আসিয়া পেঁৗছিবেন, সে সংবাদও তাঁহারা স্বামীজীর পত্রে জানিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভাইদের মধ্যে দু'জন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দ মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কলম্বোতেই আসিয়াছেন। স্বামীজীর অনেক ভক্ত ও শিষ্যও কলম্বোতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য।

সমস্ত সিংহলের হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছে। জাহাজঘাট হইতে তাঁহার আগমনপথ সুসজ্জিত করা হইয়াছে, মাঝে মাঝে এক-একটি তোরণ, আর পথের দুই ধারে ও পথের পাশের বাড়িগুলি ফুল-পাতা ও আলোর মালায় সজ্জিত হইয়াছে। পথে ও জাহাজের ঘাটে জনতার অবধি নাই।

সন্ধ্যার সময় জাহাজ বন্দরে আসিয়া নোঙর করিল। স্বামীজী ডেকের উপর

দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতেই সেই দীর্ঘায়ত বীরমূর্তি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উত্থিত হইল, "জয়! সনাতন হিন্দু-ধর্মের জয়! জয় ভারতমাতার জয়!"

স্বামীজী কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সেই লোকারণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এখনও তবে ভারতবাসী বাঁচিয়া আছে—এখনও এই সব মুমূর্ষু প্রাণেও জাগিতে পারে উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দ! এখনও সমগ্র জাতির প্রাণে একই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়! স্বামীজী আপন মনে বলিলেনঃ—

"ভারত নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এই জনগণকে এবং দরিদ্রদের সুখী করতেই হবে। * * * আধ্যাত্মিকতার বন্যা এসেছে! আমি দেখছি ঐ বন্যা সারা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রবাহিত হচ্ছে অবিশ্রাম, বাধাবন্ধনহীন এবং সর্বপ্লাবিনী। প্রত্যেক ব্যক্তিই অগ্রসর হবে, প্রত্যেক শুভ ইচ্ছাই ইহার শক্তিবর্ধন করবে এবং প্রত্যেক হস্তই ইহার পথের বাধা সরিয়ে দেবে। জয়, প্রভুর জয়!"

স্বামীজী করজোড়ে প্রণাম করিলেন তাঁহাকেই, যিনি সকল শুভ ইচ্ছার প্রেরণাদাতা। তখনই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে। দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন এবং তাঁহারই হাত ধরিয়া জাহাজ হইতে নামিবার পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে যে তিনজন ইউরোপীয় শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে গুরুভ্রাতার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

তীরে মাননীয় কুমারস্বামী একগাছি জুঁই ফুলের গড়ে মালা হাতে করিয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বামীজী তীরে পদার্পণ করিলে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। রাস্তায় গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহারা অনেক কষ্টে জনতা অতিক্রম করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলেন, গাড়ি হইতেই স্বামীজী যুক্ত করে সমস্ত জনতাকে অভিবাদন জানাইলেন।

বার্নে স্ট্রীটে একটি মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। প্রথমে স্বামীজীকে সেইখানে লইয়া যাওয়া হইল। 'সিনামন গার্ডেনে' তাঁহার জন্য একটি বাসা ঠিক করা হইয়াছিল, তাহার কাছেই আরও একটা মণ্ডপ করা হইয়াছিল অভিনন্দন-সভার জন্য। স্বামীজী পদব্রজেই সিনামন গার্ডেনের মণ্ডপে গেলেন, সেখানে কুমারস্বামী সিংহলের হিন্দুগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র দান করিলেন এবং স্বামীজীও তাহার উত্তরে কিছু বলিলেন। পরের দিন ফ্লোরাল হলে আর একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল, স্বামীজী সেখানেও বক্তৃতা করেন।

১৭ই তারিখে তিনি সিংহলের একটি শিব মন্দির দর্শন করেন।

১৮ই তারিখে মিঃ চিল্লায়া নামক স্বামীজীর একজন ভক্ত তাঁহাকে জল-যোগের নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহার বাড়িতে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া পাবলিক হলে "বেদান্ত দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯শে তারিখে প্রত্যূষে তিনি ক্যাণ্ডি শহরে যাত্রা করেন, সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে একটি বাংলোবাড়িতে লইয়া যাওয়া

হয়। তাহার পর ক্যান্ডি অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দান করা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি মাটাল নামক স্থানে যান, সেখানে রাত্রি কাটাইয়া ২০শে জানুয়ারী সকালে জাফ্‌নায় যাত্রা করেন। জাফ্‌না মাতারা হইতে দুইশত মাইল দূরে। পথে গাড়ির চাকা ভাঙিগয়া গেল, সুতরাং মিসেস সেভিয়ারের লগেজ প্রভৃতি একটি গরুরগাড়িতে তুলিয়া দিয়া তাঁহারা হাঁটিয়াই চলিলেন। কিছুদূর গিয়া আর একখানি গরুরগাড়ি পাওয়া গেল, সেই গরুরগাড়িতে চড়িয়া তাঁহারা অনুরাধাপুরে পেঁাছিলেন।

অনুরাধাপুর সিংহলের প্রাচীন বৌদ্ধযুগের এক সমৃদ্ধিশালী শহর, এখন সেখানে বহু পুরাতন মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। স্বামীজী যে বাসায় ছিলেন, তাহার কাছেই দুই হাজার বৎসর আগের এক রাজপ্রাসাদের ষোল শত বড় বড় পাথরের থাম তখনও খাড়া ছিল। স্বামীজী এখানে "পূজা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতায় তিনি পূজার বাহিরের আড়ম্বর প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া ইষ্টের নিকট যাহা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন, তাহাই প্রকৃত পূজা--এই কথা বলেন।

চব্বিশে সকালে স্বামীজী জাফ্‌না পেঁাছিলেন। জাফ্‌না একটি রমণীয় স্থান। এখানে তিনি পেঁাছিবামাত্র অনেক লোক আসিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া মিছিল করিয়া মিস্টার পি পোন্নামপালমের বাড়িতে লইয়া গেল। বৈকালে স্বামীজী হিন্দু কলেজে গেলেন, কলেজের সম্মুখে একটি বিরাট মণ্ডপে প্রায় পনেরো হাজার বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুরের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ এস চাল্লাপ্পা পিলাই তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পর জাফ্‌নার সকল অধিবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইলে অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। পরের দিন সন্ধ্যায় হিন্দু কলেজে তিনি আর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বক্তৃতাটির বিষয় ছিল "বেদান্তবাদ"। শ্রোতাগণের অনুরোধে সেদিন মিস্টার সেভিয়ারকেও কিছু বলিতে হইয়াছিল। মিস্টার সেওিয়ার কেন এদেশে আসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বলিবার বিষয় ছিল। সে বক্তৃতাটিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সিংহলের অধিবাসিগণ স্বামীজীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার নিকট তাহারা বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইল যে, তিনি যেন তাহার আর একজন সন্ন্যাসী সহযোগীকে এখানে পাঠান, যিনি এখানে কিছুদিন থাকিয়া তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করিবেন এবং তাঁহার জীবনের কাহিনীসমূহ তাহাদের শুনাইবেন। স্বামীজী তাহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেই স্বামী শিবানন্দকে সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনিও সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া প্রচারকার্য

করিয়াছিলেন। বর্তমানে সিংহলে নানা স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেকগুলি কেন্দ্র আছে।

২৫শে জানুয়ারী স্বামীজী সিংহল হইতে সমুদ্রপথে ভারতে যাত্রা করিলেন। মধ্যরাত্রে রওনা হইয়া বেলা তিনটার সময় পাম্বান রোডে পৌঁছিলেন, এখানে রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এই রামনাদের রাজাই স্বামীজীকে আমেরিকা যাইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই তিনি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী।

রামনাদে পৌঁছিবার পর সেখানকার অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দিবার পর রাজা আবেগের সহিত স্বামীজীর গুণকীর্তন করেন এবং সভা-ভঙ্গ হইবার সময় রাজা প্রস্তাব করেন যে, স্বামীজীর এই আগমন চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ ফন্ডে টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্যে আজ হইতে এখানেও একটি চাঁদা সংগ্রহের ফান্ড খোলা হউক।

সভাভঙ্গের পর রাজার যে গাড়ি স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিল, স্বামীজী গাড়িতে উঠিবার পর সেই গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া স্বয়ং রাজা এবং অন্যান্য সকলে গাড়ি টানিয়া রাজার বাংলো-বাড়িতে স্বামীজীকে লইয়া গেলেন। তখনকার দিনে বিশেষভাবে ভক্তি দেখাইবার ইহাই একটা পদ্ধতি ছিল।

পরের দিন শ্রীরামেশ্বর মন্দিরে গিয়া স্বামীজী শিবপূজা করিবার পর তাঁহার দর্শনাথী জনতার অনুরোধে মন্দিরে 'তীর্থ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

রামনাদের রাজা পরদিন স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে বহু দরিদ্রকে অন্নদান ও বস্ত্রদান করেন এবং ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের যেখানে স্বামীজী প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 'বিজয়স্তম্ভ' নামে একটি চল্লিশ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সেই স্তম্ভে যে বাক্য ক্ষোদিত ছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—"পাশ্চাত্ত্যে বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপিত করে দিগ্‌বিজয়ের পর তাঁর ইংরেজ শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই পুণ্য-স্থানকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্য রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এই স্মৃতিস্তম্ভ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী নির্মিত হল।"

রামনাদের রাজা ফনোগ্রাফে ধরিয়া রাখিবার জন্য স্বামীজীকে কিছু বলিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী "ভারতে শক্তিপূজার আবশ্যকতা" নামে একটি ছোট বক্তৃতা দেন। স্বামীজী রামনাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্মানার্থে রাজা একটি বিশেষ দরবারও আহ্বান করেন।

রামনাদে স্বামীজী পাঁচদিন ছিলেন। ৩১শে জানুয়ারী তিনি মধ্যরাত্রে রামনাদ হইতে প্রথমে পরমকুডি তারপর মনমেদুরায় যান। প্রত্যেক স্থানে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ও অভিনন্দন দান করা হয়। তারপর তিনি মাদুরায় গিয়া মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দর্শন করেন, সেখানে তিনি রাম-

নাদের রাজার বাড়িতে দিনের বেলায় বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় কুম্ভকোনম্ নামক স্থানে ট্রেনে রওনা হন।

মাদুরা হইতে কুম্ভকোনম্ যাইবার পথে প্রত্যেক স্টেশনে পূর্ব হইতেই জনসমারোহ হইতে থাকে। দর্শনার্থী জনগণ নিশান ও ফুলের মালা হাতে লইয়া প্রত্যেক স্টেশনেই স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানায়, ইহার পর যখন ত্রিচিনোপল্লী স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিল, তখন দেখা গেল অতবড় স্টেশন একেবারে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী সেখানে নামিবেন না জানিয়া প্ল্যাটফর্মেই তাঁহাকে দু'খানা অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল, একখানা জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এবং অপরখানি নগরের সমস্ত অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে। কুম্ভকোনমেও তাঁহাকে দুখানা অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, একখানি হিন্দু জনসাধারণের পক্ষ হইতে ও অন্যখানি ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে। স্বামীজী কুম্ভকোনমে তিনদিন ছিলেন, সেখানে 'বেদান্তের আদর্শ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর আগমনে সমস্ত মদ্রদেশে যেন এক নূতন জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, বিশেষত ছাত্রসমাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। কুম্ভকোনম্ হইতে স্বামীজী যখন মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন প্রতি স্টেশনেই সমানভাবে লোকের ভিড় হইতেছিল। মায়াভরম্ স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মেই তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং তিনি অভিনন্দনের উত্তর দান করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে স্বামীজী মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিবার বহু পূর্বেই সেখানে বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, ট্রেন পৌঁছিবামাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী নামিবার আগেই তাঁহার গাড়ির দিকে এত ভিড় জমিয়া গেল যে, গাড়ি হইতে নামাই অসম্ভব হইয়া পড়িল। নামামাত্রই তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া সম্বর্ধনা করা হইল।

পথের দুই ধারের বাড়ি সাজানো হইয়াছিল এবং যে পথ দিয়া তাঁহার গাড়ি যাইবে সেই পথের স্থানে স্থানে তোরণ করা হইয়াছিল। গাড়ি কিছুদূর যাইতেই গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া জনতাই গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং মিস্টার বিলিজিবি আয়েঙ্গারের 'কার্নান ক্যাসেল' নামক বাড়ির কাছে আসিয়া গাড়ি থামিল, এইখানেই স্বামীজীর থাকিবার স্থান ঠিক করা হইয়াছিল।

স্বামীজী বাড়িতে পৌঁছিবামাত্র মাদ্রাজ 'বিদ্বান মনোরঞ্জিনী সভার' পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইল, পত্রখানি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল মিস্টার কৃষ্ণামাচারিয়ার স্বামীজীর হাতে দিলেন। আর একখানি কানাড়ী ভাষায় লিখিত অভিনন্দনও দেওয়া হইল। এই সময় জাস্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার সকলকে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন যে, স্বামীজী এখন বড়ই ক্লান্ত, তাঁহার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। এ কথায় সকলে তখনকার মত চলিয়া গেলেন।

পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। এইদিন টাউন হলে বিরাট এক সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতি, বিস্বৎ বৈদিক সভা ও সোস্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন স্বামীজীকে পৃথক পৃথক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। এছাড়া খেতরির মহারাজার পক্ষ হইতে একখানি এবং আরও অন্যান্য পক্ষ হইতে ২০ খানি অভিনন্দন দেওয়া হইল। হলে এত বেশী লোক হইয়াছিল যে, স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী হল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটা ফিটনগাড়ির কোচবক্সের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেখান হইতেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন।

মাদ্রাজে স্বামীজী নয়দিন ছিলেন এবং এই নয়দিনে তিনি মোট ছয়টি বক্তৃতা দেন ; ১। অভিনন্দনের উত্তর। ২। আমার সমরনীতি। ৩। ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা ৪। ভারতীয় মহাপুরুষগণ। ৫। আমাদের উপস্থিত কর্তব্য। ৬। ভারতের ভবিষ্যৎ।

এখানে স্বামীজীর "আমার সমরনীতি" নামক বক্তৃতার শেষাংশের কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এই আমাদের জাতীয় তরণী ; হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোতই কোটি কোটি মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পার করছে। এরই সাহায্যে অনেক গৌরবান্বিত শতাব্দীর পর শতাব্দী কোটি কোটি মানবজীবন জীবননদীর অপর পারে অমৃতধামে নীত হয়েছে। আজ হয়তো তোমাদের নিজের দোষেই ওতে দু' একটা ছিদ্র হয়েছে, পোতখানি একটু জখমও হয়েছে, তাই কি তোমরা এখন ওর নিন্দা করবে? জগতের সব জিনিসের চেয়ে যে জিনিস আমাদের বেশী প্রয়োজনে লেগেছে, এখন কি তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হয়ে থাকে, আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান, আমাদেরই এগিয়ে গিয়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। যদি আমরা তা করতে না পারি, তবে আনন্দের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের রুধির দিয়েও তার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি তা না পারি, তবে এস আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। আমরা আমাদের মাথা দিয়ে ঐ জাতীয় অর্ণবপোতের ছিদ্রগুলি বন্ধ করবো, কিন্তু কখনও তার নিন্দা করবো না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথাও বলো না, এর অতীত মহত্ত্বের জন্য আমি একে ভালবাসি। আমি তোমাদের ভালবাসি, কেননা তোমরা দেবগণের সন্তান, মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের বংশধর। তোমাদের সকল প্রকারে কল্যাণ হোক। তোমাদের নিন্দা কেমন করে করতে পারি? কখনও পারি না। হে আমার সন্তানগণ, আমি তোমাদের কাছে আমার সব উদ্দেশ্যের কথা বলতে এসেছি, যদি তোমরা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আছি। যদি না শোন,—এমন কি আমাকে পদাঘাত ক'রে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দাও, তবুও আমি তোমাদের কাছেই ফিরে এসে বলব—আমরা সকলেই ডুবছি। আমি এবার এসেছি তোমাদের মাঝে বসতে। যদি ডুবতে হয় তবে এস সকলে একসঙ্গে

ডুবি, কিন্তু তবু আমাদের মুখে যেন কারুর প্রতি কটূক্তি উচ্চারিত না হয়।"

দেশের উপর যে জ্বলন্ত ভালবাসা আগুনের মত নিরন্তর তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, এই সব ভাষণে তাহারই পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে দেশবাসীর অনাচার ও ক্লৈব্য তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও দীপ্ত সূর্যের মত তাঁহার মনে সর্বদাই তেজ ও শক্তি বিকীর্ণ করিতেছিল ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক মহান্ আশা।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই, যেখানে যেখানে স্বামীজী গিয়াছেন সেখানেই লোকের মনে আশার আলো ও কর্মের উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার আগে সেখানকার অনেকেই মাদ্রাজে যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব প্রচার হয় সে জন্য তাঁহার একজন গুরুভাইকে সেখানে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

স্বামীজী জানিতেন মাদ্রাজীরা নিষ্ঠাচারের বিশেষ ভক্ত, তাই তিনি বলিলেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সেখান হইতে তিনি এমন একজন সন্ন্যাসীকে মাদ্রাজে পাঠাইবেন যিনি দাক্ষিণাত্যের গোঁড়া ব্রাহ্মণগণের চেয়েও বেশী নিষ্ঠাবান।

স্বামীজীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে ও মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা এইভাবে আপনা হইতেই দেখা দিল। এই সূচনাই যেন মহান্ মহীরুহের অঙ্কুর স্বরূপ। সেই মহীরুহই এখন তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছায়া ও কল্যাণদান করিতেছে।

কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ

যখন মাদ্রাজেই স্বামীজীর আগমনে এত উৎসাহ ও আন্দোলন, তখন তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতায় কি আনন্দের সাড়া পড়িয়াছিল কল্পনাতেই তাহার খানিকটা বুঝা যায়।

স্বামীজীর গুরুভাইরা—তাঁহারা তো বিবেকানন্দগতপ্রাণ। তাঁহারা আলমবাজারের মঠেই স্বামীজীর আগমনের জন্য আয়োজন করিতেছেন, আবার কলিকাতায় অভিনন্দনের উদ্যোগ আয়োজনের সহিতও যোগ রাখিতেছেন। বরানগরের বাড়ি ছিল খুব বড় আর ভাঙ্গাচোরা। এ-বাড়িও অবশ্য ভাঙ্গা বাড়ি, কিন্তু ততটা অপরিষ্কার ছিল না। যাহা হউক সেই বাড়িই যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে।

কলিকাতায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছিল এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সেই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে স্বামীজী জাহাজ হইতে নামিয়া যে পথ দিয়া আসিবেন, সেইসব রাস্তার দুইধার পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল এবং পথের মাঝে মাঝে গেটও করা হইয়াছিল। সার্কুলার রোডে যে গেটটি করা হইয়াছিল, তাহার মাথায় লেখা ছিল—'এস স্বামীজী'। হ্যারিসন রোডের গেটটির উপরে লেখা ছিল 'জয় রামকৃষ্ণ' এবং রিপন কলেজের সম্মুখে যে গেটটি করা হইয়াছিল তাহার উপরে লেখা ছিল 'স্বাগত!'

এই রিপন কলেজেই স্বামীজীকে প্রাথমিক অভিনন্দন দেওয়া হইবে এই রকম ঠিক করা হইয়াছিল এবং খিদিরপুর ডক হইতে শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সেদিন যে দেশবাসীর কি আনন্দের দিন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বহুদিনের পরাধীন এক জাতি যেন এক ক্ষণিকের স্বাধীনতার স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে। জয়ী হইয়া আসিয়াছেন, পরাজিত জাতিরই এক প্রতিনিধি জেতৃ জাতির দেশে গিয়া। এ জয় কাহারও ব্যক্তিগত জয় নয়, এ জয় সমগ্র দেশের জয়, প্রত্যেক দেশবাসীই এই জয়ের অংশীদার। প্রত্যেক দেশবাসীই সেদিন তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র সে দিন স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন—

(সাহানা-ধামার)

ভুবন ভ্রমণ কর যোগীবর, যাঁর ধ্যানে—
তাঁহারি সন্তানগণে চেয়ে আছে পথপানে।

উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানবচিত প্রভুর গৌরব গানে,—
নানা দেশে, নানাভাষে—জয়ধ্বনি একতালে।
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব পুলক আলোক দানে।
জনমন পুলকিত ঘোর নিশা অবসানে।

বহুকণ্ঠে এই গীতটি সুর লয়ে গান করা হইয়াছিল। সেদিন মনে হইয়াছিল পরাধীনা ভারতমাতা আজ আর দুঃখিনী নন, তিনি আজ বীরপুত্রের গৌরবে গৌরবিনী। তাঁহার সেই বীরপুত্র, যে—

কোথা দূরে মিলালো সংশয়,—
মা, তোর দুলাল সেই— সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
দশদিক গাহে তার জয়!
ভাই বলি সমাদরে পতিতে হৃদয়ে ধরে,
আতুরে দেবতা করি মানে,—
দরিদ্র অভাগা জন তার পূজ্য নারায়ণ
ধনী দীনে ভেদ নাহি জানে—।
যাঁর মা এমন ছেলে, তাঁরে কে দুখিনী বলে?
মৃত্যুঞ্জয়ী সে চির অমর,
বীর পুত্র তব বীরেশ্বর!

সে দিনের সেই আনন্দক্ষণের স্মৃতির যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁহারা যেভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, আজ বর্ণনায় তাহার চিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়।

খুব ভোরেই জাহাজ খিদিরপুরে পোঁছিয়াছিল। ডকে জাহাজ পোঁছিবা-মাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে গঙ্গার তরঙ্গরাশি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বামীজীর জন্য স্পেশ্যাল ট্রেন প্রস্তুত ছিল, সেই ট্রেনে সকাল সাড়ে সাতটায় স্বামীজী শিয়ালদহ স্টেশনে পোঁছিলেন। মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, পুষ্পমাল্যভূষিত করিয়া তাঁহারা স্বামীজীকে ও তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণকে একখানি ফিটন গাড়িতে তুলিলেন। তখনকার দিনে 'মোটর কার' বলিয়া কিছু ছিল না।

স্বামীজী গাড়িতে উঠিবার পর স্টেশনে আগত যুবকগণ আগাইয়া আসিয়া গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিলেন। বাগবাজারের অনেকেই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ৺শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত (দত্তবাবু), অপরেশ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গাপদ ঘোষ, রামকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি অনেকেই সেদিন গাড়ি টানিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় তখনও ডাক্তার হইয়া বাহির হন নাই। তিনি কিছুদিন আগে লোকান্তরিত হইয়াছেন; মৃত্যুর অল্পদিন আগেও তিনি সেদিনের কথা আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

মহাশয়ও এই দলে ছিলেন। তিনি আজিও সেই দিনের কথা স্মরণ করেন।

গাড়ি রিপন কলেজের গেটের সম্মুখে পোঁছিলে ভিড় এতই বাড়িয়া গেল যে, সেই ভিড়ের চাপে অনেকেই চাপা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশত সেদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। অপরেশবাবু লোকের পায়ের তলায় পড়িয়া গিয়াছিলেন, মণি গুপ্ত মহাশয় অতি কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

এই দিন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তখনকার দিনে ঘটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ এমন পর্দানশীন ছিলেন যে, গঙ্গাস্নানে যাইতে হইলে পাল্কিতে করিয়া তাঁহাদের গঙ্গাগর্ভে নামিয়া স্নান করিতে হইত। কিন্তু সেদিন সেই প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া বিডন স্ট্রীটের চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর পুরমহিলাগণ প্রকাশ্য রাজপথে স্বামীজীকে ধূপদীপ দিয়া আরতি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, স্বামীজীর আগমন সেদিন লোকের মনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সেদিন বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে স্বামীজীর মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল এবং °গোপাল শীল মহাশয়ের কাশীপুরের বাগান বাড়িতে তাঁহার এবং তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামীজী আহারান্তে পশুপতি বাবুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে কাশীপুরে গেলেন বটে, কিন্তু রাত্রে তাঁহার গুরুভাইদের নিকট আলমবাজার মঠে গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

টাউন হলে অভিনন্দন দিতে কয়েক দিন দেরি হইবে জানিয়া ইতিমধ্যেই বাগবাজারে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর নাটমন্দিরে তাঁহাকে একটি অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন অল্পবয়স্ক যুবক, কিন্তু তিনিই এই অভিনন্দনদান ব্যাপারে অগ্রণী হইলেন এবং বাগবাজারের অন্যান্য যুবকবৃন্দ, বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবুও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহার পর যেটি বিশেষ অভিনন্দন, সেটি টাউন হলে না হইয়া শোভাবাজারে স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠানে করিবার আয়োজন করা হইল। এই দিনের সভায় কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন।

এই সভায় অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন, সেটি প্রধানত বাঙ্গলার যুবকগণকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। সেই ভাষণ হইতে এখানে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইহাই ঋষিবাক্য। ভারতের প্রতি ধূলিকণাও পবিত্র এবং এই ভারতবর্ষ এক মহাতীর্থ।

ভারতের অধিবাসিগণের আচার ব্যবহারকে যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, সকল দেশের আচার ব্যবহারের ভিতরেই কোন না কোন

গভীর তাৎপর্য আছে, সেই জন্য কোন আচরণকেই উপহাস করা উচিত নয়।

ভারতবর্ষের যে যত দরিদ্র সে তত সাধু।

হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করাই মহা বীরত্ব।

আমার দ্বারা যা কিছু জীবনপ্রদ, বলপ্রদ ও পবিত্র কার্য সাধিত হয়েছে অথবা যা কিছু আমি বলেছি সে সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তির খেলা, তাঁরই বাণী এবং তিনিই স্বয়ং।

ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ মহাশক্তির বিকাশ।

ভারতবাসী রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং অন্যান্য যাহা কিছুই হউক ধর্মের মাধ্যমে না হ'লে গ্রহণ করতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সার্বভৌম ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ভ্রাতৃভাব স্বরূপ।

মহান্ এক আদর্শ পুরুষের উপর একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগই যে কোন জাতির উত্থানের উপায়। একই পতাকাতলে সকলকে সমবেত হ'তে হবে।

ভারতবাসীর ইহাই প্রকৃতি যে তারা কোন ধর্মবীরকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ না করলে তারা উঠতে পারবে না ও মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণই সেই আদর্শ পুরুষ, অতএব আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তাঁকেই আদর্শ করা প্রয়োজন।

আমাদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক সে জন্য তাঁর কাজ থেমে থাকবে না। তিনি সামান্য ধূলিকণা থেকেও শত শত কর্মী সৃষ্টি করতে পারেন।

বিস্তৃতিই জীবনের লক্ষণ। আমাদের হয় সমস্ত জগৎ জয় করতে হবে না হয় লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। সুতরাং বিদেশে যেতেই হবে। ভারতের বাইরে অন্যান্য জাতি কিভাবে উন্নতি করছে তা লক্ষ্য করতে হবে এবং এই তুলনার দ্বারাই বোঝা যাবে যে আমরা কোথায় পড়ে আছি। দিতেও হবে আবার নিতেও হবে। আদান প্রদানই উন্নতির মূল। ভারতের অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। চৈতন্য রাজ্যের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে পাশ্চাত্ত্য জাতির নিকট থেকে জড়রাজ্যের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আধ্যাত্ম্য বিষয়ে আমরা হব ওদের শিক্ষাদাতা এবং জড়সম্পর্কিত বিষয়ে ওরাই হবে আমাদের শিক্ষাদাতা। সম-অবস্থাপন্ন না হ'লে কখনও বন্ধুত্ব হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তি খুবই ভাল জিনিস বটে, কিন্তু তাদের বেশী দূর এগোবার ক্ষমতা নাই। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্য সকল উদ্ঘাটিত হয়। বাঙালী ভাবুক এবং ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হবে।

শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এখন উঠতে হবে, জাগতে হবে এবং সাহস সহকারে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি মহাবলি চান, সেই বলির জন্য চাই আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ ও মেধাবী যুবকের দল।

ভারত দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্র্য আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হ'তে পারবে না।

চাই মানুষ—চাই উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—'যে আপনাকে দুর্বল ভাববে সেই দুর্বল হবে।' প্রত্যেক আত্মায় অনন্ত শক্তি রয়েছে, কেবল তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ধীর হ'তে হবে।

ভয় একেবারে ত্যাগ করতে হবে। অতীতের ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে—সাধারণ লোকের মধ্য থেকেই জগতের যত কিছু শক্তির প্রকাশ হয়েছে। সাধারণ লোকের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। যা একবার ঘটেছে তা আবার ঘটবেই। পুনরাবৃত্তিই জগতের নিয়ম।

বাংলার যুবকগণের মধ্য দিয়াই সেই শক্তির বিকাশ হবে। বাংলার যুবকগণের উপরেই সমর্পিত হয়েছে এই অতি গুরু দায়িত্বের ভার।"

স্বামীজীর এই যে বাণী, ইহাতে যেন তাঁহার মনের ভিতরের তাপ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় উৎসারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই রহিয়াছে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া নবজীবন লাভের মন্ত্র। স্বামীজীর কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই বাণী। আরও একটু বেশী দূর গেলে এই কথাটি আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন" এই মহাবাণীরই প্রচারক এবং এই বাণী প্রচারই তাহার প্রধান কার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ যেন দুই রূপে এক অভেদ সত্তা। স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা Nivedita of Ramkrishna Vivekananda এই নামে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন একদল ছেলে চাহিয়াছিলেন, যাহারা উচ্চ কার্যের প্রেরণায় সবকিছু ত্যাগ করিতে পারে; যাহারা অনাসক্ত অথচ প্রেমময় হইবে, যাহারা হইবে সর্বত্যাগী অথচ মহাকর্মী—সেইসব ছেলের দলের নেতারূপেই তিনি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, "আর সব নর আর তুমি হলে নরেন্দ্র।" (অর্থাৎ সকল নরের মধ্যে তুমি নরশ্রেষ্ঠ।) ভালবাসার দিক দিয়াও স্বামীজীর মনের ভাব তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতেন। স্বামীজী যে কোন কিছুর প্রার্থী নন সেকথাও তিনি জানিতেন; তিনি স্বামীজীকে সে বিষয়ে পরীক্ষাও করিয়াছেন অনেক সময়ে।

তখনকার দিনে কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁহার বক্তৃতার সময় সরস্বতী দেবী যেন তাঁহার রসনায় আসিয়া আবির্ভূতা হইতেন। তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাষা সাবলীল, উদ্দীপক এবং মনোমুগ্ধকর, তাই শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতায় যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইত।

কিন্তু একবার তিনি গ্রীষ্মের সময় সদলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সেখানে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার সময় লক্ষ্য করিলেন, পরমহংসদেব একটু বক্তৃতা শুনিবার পর উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরমহংসদেবের মতামতের কেশববাবুর কাছে বিশেষভাবেই মূল্য ছিল, তাই তিনি বক্তৃতার শেষে তাঁহার নিকট আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন বক্তৃতার ভিতর কোন ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুমি যে বললে, ভগবান তুমি সমীরণ দিয়েছ,

তরুগুল্ম দিয়েছ, এসব তো বিভূতির কথা। এসব নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? যদি এসব বিভূতি কিছুই তিনি না-ই দিতেন, তাহলে কি তিনি ভগবান হ'তেন না? বড়মানুষ হলেই কি বাপকে বাপ বলবে, গরীব বাপকে কি বাপ বলবে না?" কেশবচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিষম তার্কিক, প্রত্যেক কথাতেই তিনি তর্ক তুলিতেন, যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়া না দিলে তিনি কোন কথাই মানিয়া লইতেন না। এমন কি অনেক সময় তিনি ঠাকুরকে বলিতেন, "তুমি আর কি জান, তোমার কাছে শেখবারই বা কি আছে?" একথা শুনিয়া ঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুই এখানে আসিস কেন? ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, তবুও এমন-ভাবে রোজ রোজ আসিস কেন বল দেখি?" উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, সেই জন্য তোমার কাছে আসি।" এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, সেই মুহূর্তে তিনি সমাধিস্থ হইয়া নরেন্দ্র-নাথকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "শুনলে নরেনের কথা, ও কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বলেই এখানে আসে।"

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার কথা না মানিয়া লইয়া আবার তাঁহার সঙ্গে তর্ক করে, ইহাতেও ঠাকুর খুশি হইতেন, তিনি জানিতেন এইভাবে তর্ক করিবার সাহস একমাত্র নরেন্দ্রনাথেরই ছিল। আর অন্য দিক দিয়া নরেন্দ্র একেবারে নির্লোভ, অর্থ ও সম্পদ তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। স্বামীজীর ভ্রাতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমার বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়। পূর্বের দিন আমাদের বাড়িতে চাকর সরকার প্রভৃতি অনেক লোক ছিল, কিন্তু পরের দিন আমরা একেবারেই গরীব হইয়া পড়ি, কিছুই সংস্থান ছিল না। সংসারের সকল ভার তখন নরেন্দ্রনাথের উপরেই পড়িল। সে তখন আইন পড়িতেছিল এবং এক অ্যাটর্নির আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে কিছু পাইবার আশা ছিল না। সংসার কি করিয়া চলিবে এই চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে আমাদের সংসারে অতিশয় কষ্ট আসিল, নরেন্দ্রনাথ তাহাতে একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িল। এই সময় সে কাহারও সহিত মিশিত না তাহার পূর্বেকার প্রফুল্ল ভাব একেবারে চলিয়া গেল, সে ম্লান হইয়া পড়িল। একদিন সে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইকে বলিল, "আপনি মাকে বলুন, যাতে আমার মা-ভাইদের খাওয়া-পরার কষ্ট দূর হয়। এত কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।" পরমহংস মশাই বলিলেন, "তুই মা কালীকে প্রণাম করে যা চাইবি তাই পাবি।" নরেন্দ্রনাথ কালীর মন্দিরে যাইয়া সংসারের অভাবমোচনের জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করিবে এইরূপ মনস্থ করিয়া পরমহংস মশাই-এর ঘর হইতে বাহির হইল। মন্দিরে যাইয়াই মা কালীকে প্রণাম করিয়া সংকল্পিত ইচ্ছা সকল ভুলিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "মা আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও।" তাহার

পর পরমহংস মশাই-এর ঘরে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, মার কাছে প্রার্থনা করেছিস?" নরেন্দ্রনাথ বলিল, "মশাই, ভুলে গেছি।"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যানঃ ১২৪ পৃঃ)

বিষয় সম্বন্ধে এইরকমই যাঁহার মনোভাব এবার তাঁহারই উপর বিষয়ের ভার আসিয়া পড়িল।

টাকা। টাকা না হইলে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। পরিচালিত করিতে হইলেও টাকারই প্রয়োজন। স্বামীজী বিলাতে বক্তৃতা করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়াই তিনি আলমবাজারে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কাছে সমস্তই দিয়া দিলেন। তাঁহাকে গঙ্গার ধারে মঠের জন্য এক খণ্ড জমির খোঁজ করিতেও বলিলেন।

এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজী মিসেস অলিবুলকে লিখিয়াছিলেন—"সন্ন্যাসীদের জন্য একটি ও মেয়েদের জন্য একটি—এই দুটি কেন্দ্র স্থাপন না করে যদি আমি মরে যাই, তাহলে আমার কর্তব্যের শেষ হবে না।"

"যদি আমি মরে যাই" অর্থাৎ দিন সংক্ষেপ, কাজ শেষ করিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। আর মেয়েদের জন্য একটি মঠের কথা তিনি অনেকবারই বলিয়াছেন।

মিসেস অলিবুলকে এই পত্রে তিনি টাকাকড়ির কথাও লিখিয়াছেন।—"ইংলণ্ড থেকে ইতিপূর্বেই আমি পাঁচশো পাউণ্ড (প্রায় ৭৫০০) পেয়েছি। 'মিঃ এস'-এর কাছ থেকে প্রায় পাঁচশো আর তোমার টাকাটা দিয়ে ঐ দুটি কেন্দ্র স্থাপন করতে আমি নিশ্চয়ই পারবো। সেইজন্য আমার মনে হয় তোমার ঐ টাকাটা যত শীঘ্র পার পাঠানো উচিত।"

মিসেস অলিবুলকে তিনি ঐ পত্রে আরও লিখিয়াছেন, "সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে আমেরিকার কোন ব্যাংকে ঐ টাকাটা তোমার ও আমার এই দুজনের নামে জমা করে দেওয়া। তা হলে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কেউ ঐ টকাটা বার করতে পারবে। ঐ টাকাটা কাজে লাগাবার আগেই যদি আমি মরে যাই, তুমি ঐ টাকা দিয়ে আমি যা করতে চেয়েছিলুম, তাই করতে পারবে। একথা আমি এইজন্য বলছি যে আমার মৃত্যুর পর আমার লোকেরা ঐ টাকাটা নিয়ে গোলমালের সৃষ্টি করতে পারবে না। ইংলণ্ডে পাওয়া টাকাটাও ঐভাবে আমার ও 'এস্'-এর দুজনের নামেই রাখা হয়েছে।"

টাকা যে কি সাংঘাতিক জিনিস, সর্বত্যাগী স্বামীজীর সে সম্বন্ধেও বিশেষভাবে ধারণা ছিল তাঁহার এই পত্রে সেকথা বেশ বুঝা যায়। আরও একটি বিষয় বুঝা যায় যে, কোন কাজ এলোমেলোভাবে হয় এটা তিনি একেবারেই চাহিতেন না, পশ্চাত্যের সুশৃংখল কার্যপদ্ধতিকে তিনি অনুকরণের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময়ও সন্নিকট। এই সময়টিতে

যাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারেন, সেজন্য স্বামীজী ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এতদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই ঠাকুরের জন্মোৎসব করা হইত। তাহার কারণ বরানগর অথবা আলমবাজারের মঠে স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতেই ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করা হইয়াছে এবং তাহাতে কোন আপত্তিও ওঠে নাই। কিন্তু এবার আপত্তি দেখা দিল। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া যখন মন্দিরের উঠানে ঢুকিতে গেলেন, তখনই দুয়ারের দারোয়ান বাধা দিল। হিন্দুর দেবালয় এখানে সাহেব মেমের অথবা কোনো মুসলমানের প্রবেশের অধিকার নাই। রাণী রাসমণি তাঁহার উইলে যদি সে অধিকার দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি হইত অবশ্য বলা যায় না।

কিন্তু এই যে মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার এবং জেমস গুডউইন ইঁহারা কি এখনও সাহেব মেম আছেন? ইঁহাদের হিন্দুধর্মের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধা, কোন হিন্দুর তাহা আছে? তাঁহারা একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া বহু দূরে এই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিজেদের আচার ও আচরণ ত্যাগ করিয়া এই দেশের আচার গ্রহণ করিবার জন্য কত নিষ্ঠা সহকারে অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মত নিষ্ঠাবানই বা এদেশে কয়জন আছেন?

যাহা হউক মন্দির প্রবেশের এই বাধায় জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে হওয়া সম্ভব হইল না। এই সময় স্বামীজী তাঁহার এক মহিলা ভক্তকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এখন আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়, কিন্তু তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না।" * * *

এই পত্রে তিনি একথাও লিখিয়াছেন যে, 'তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব, কারণ রাসমণির দেবালয়ের মালিক 'বিলাত ফেরত' বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না। অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই চারিটি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

ঠাকুরের জন্মোৎসবের অবশ্য তখনও কিছু দেরি আছে। কিন্তু স্বামীজীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষত ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার এক মুহূর্তও বিশ্রাম লইবার সময় হয় নাই। তাই তিনি অল্প কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং গেলেন এবং সেখনকার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত এম এন ব্যানার্জি মহাশয়ের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, গিরিশবাবু, মিস্টার গুডউইল এবং মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিংগা ও সিংগারা ভেলু (যাঁহাকে স্বামীজী কিডি বলিতেন) এবং ব্যাংগালোরের জি জি নরসিংহ চারিয়া—ইঁহারাও সকলে

গিয়াছিলেন। এই সময় বর্ধমানের মহারাজা তাঁহার "রোজ ব্যাঙ্ক" নামক বাড়ির এক অংশ সকলের থাকিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি সংঘ স্থাপিত হয়। বাংগালার বাহিরে এইটিই প্রথম সংঘ। মাদ্রাজের অধিবাসিগণ সেখানে তাঁহার একজন গুরুভাইকে পাঠানোর জন্য পূর্বেই অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজী বলিয়াছিলেন, একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান সাধুকে সেখানে পাঠাইবেন, সেই সময় শশী মহারাজের কথাই তাঁহার মনে হইয়াছিল। শশী মহারাজের পূজা ও অর্চনায় যে কতখানি নিষ্ঠা, সেকথা স্বামীজী খুব ভাল করিয়াই জানেন। তাই তাঁহাকে মাদ্রাজে পাঠাইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ রিপোর্টের পঞ্চম পৃষ্ঠায় আছে যে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে পৌঁছিয়া প্রথমে ত্রিশ টাকায় একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া সেখানে কাজ আরম্ভ করেন এবং প্রায় এক বৎসর সেই ভাড়া বাড়িতেই কাজ করিয়া যান। ইঁহার পর স্বামীজীর 'ট্রিপলিকেনে' নামক একজন শিষ্য তাঁহার ক্যাসল কার্নেল নামক প্রকাণ্ড বাড়ির এক অংশে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত শশী মহারাজ সেখানেই থাকেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবরের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি বিবরণী বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছে—"বহুদিন থেকে মাদ্রাজকে কাজের একটি কেন্দ্র করবার জন্য তাঁর একজন গুরুভাইকে মাদ্রাজে পাঠাতে তিনি অতি সহজেই রাজি হলেন। এই কাজের জন্য স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকেই মাদ্রাজে পাঠাতে মনস্থ করলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মার্চ মাসের শেষাশেষি প্রথমে ক্যাসল কার্নেলে প্রতি সন্ধ্যায় গীতার ক্লাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে আইস হাউস রোডের উপরস্থ মঠে ক্লাস করেন।"

শশী মহারাজকে সাহায্য করিবার জন্য স্বামীজী তাঁহার প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দকেও সংঘে পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হইল।

শশী মহারাজ মাদ্রাজ রওনা হইয়া গেলেন। সুতরাং ঠাকুরের সেবা ও পূজার ভার পড়িল বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) উপর। সংগে সংগে ঠাকুরের সন্তানগণের সেবার ভারও পড়িল তাঁহারই উপর, কেননা এতদিন শশী মহারাজ ঐ দুই ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভার বলিতে বুঝায় মঠের রান্নার ব্যবস্থা, আবশ্যকীয় জিনিস কি আছে বা নাই, তাহার খোঁজ নেওয়া এমনকি সাধুদের ধ্যান হইতে তুলিয়া আনিয়া খাওয়ানো। এই কাজ বাবুরাম মহারাজ ঠিক শশী মহারাজের মতই আন্তরিক ভালবাসার সংগে বরাবরই করিয়া আসিয়াছেন যতদিন না তিনি দারুণ কালাজ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাই তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই এক-বাক্যে বলিতেন, "বাবুরাম মহারাজ যেন মঠের ছেলেদের মা ছিলেন।"

রামকৃষ্ণ মিশনের নামকরণ ও নিয়মাবলী

শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে হইল না, হইল দাঁয়েদের বাগানবাড়িতে। ইহাতে কালীবাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল কি না, অনেকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আইনত মালিক যিনি তিনি যেদিক দিয়া বিষয়টির মীমাংসা করিয়াছিলেন, আরও একটি দিক আছে সে বিষয়ে চিন্তা করেন নাই।

আইন সর্বত্রই আছে, এমন কি সর্বত্যাগী সাধুগণ যখন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, সেখানেও নিয়মাবলীর প্রয়োজন আছে। স্বামীজী এপ্রিল মাসের শেষদিকে দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আলমবাজারেই আসিয়া উঠিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন কতকগুলি ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়াছিলেন এবং তিনি ফিরিবার পরও আরও দুএকজন যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আলমবাজারেই আছেন। এতজন সাধু একত্র হইয়াছেন দেখিয়া স্বামীজীর মনে হইয়াছিল, এখন একটা নিয়মাবলী প্রয়োজন।

স্বামীজী চিরদিনই নিয়মের পক্ষপাতী, তা ছাড়া লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এবং সর্বোপরি তিনি যে আর বেশী দিন ইহলোকে থাকিবেন না তাহাও তিনি জানিতেন।

স্বামীজী নিয়মাবলী রচনা করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারী সুধীর তাহা লিখিয়া লইলেন। ব্রহ্মচারী সুধীরই পরে স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

১৩২০ সালের আষাঢ়ের 'উদ্বোধনে' স্বামী শুদ্ধানন্দ 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছিঃ

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চারপাঁচদিন হইল বাড়ি ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, ও সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলসিংগা পেরুমল, কিডি ও জিজি প্রভৃতি।

"স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, 'এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।'

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ,—একটা নিয়ম করা ভাল বৈকি। ডাক সকলকে।' সকলে আসিয়া ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন,—'একজন কেউ লিখ্‌তে থাক্‌, আমি বলি।' তখন এ উহাকে সাম্‌নে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেহ অগ্রসর হয় না। শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণত একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধন ভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার,—আর লেখাপড়াটা—উহাতে মান যশের ইচ্ছা আসিবে। যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্যাদি করিবে, তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই, বরং উহা হানিকর, এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া, আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম।

স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি থাক্‌বে?' অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারীরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব। সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, 'হাঁ'। তখন আমি কাগজ-কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম।

নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন,—'দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে. কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের স্বারা সেই কুনিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।"

এরপর যে নিয়মগুলি লেখা হইল সেগুলি হইতেছেঃ—

১। আলমবাজারের এই মঠই প্রধান মঠরূপে নির্ধারিত হইল। ইহার আনুষঙ্গিক সমুদয় মঠকেই ইহার নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে হইবে।

২। এই মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মাত্র এই মঠসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণকে বুঝিতে হইবে।

৩। সমুদয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মিলিয়া একটি প্রধান অধ্যক্ষ নির্ধারিত করিবেন।

৪। উক্ত প্রধানাধ্যক্ষের সহিত এক দুই বা ততোধিক সহকারী নির্ধারিত হইবেন।

৫। কোন বিষয় নির্ধারিত করিতে হইলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের ¾ অংশের মত হইলেই চলিবে। আপাতত চার বৎসরের জন্য প্রধান অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারীরা সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অমত সত্ত্বেও কার্য করিতে পারিবেন।

৬। প্রত্যেক সন্ন্যাসী দুইটি ও প্রত্যেক ব্রহ্মচারী একটি ভোট দিতে পারিবেন।

৭। মঠে তামাক ব্যতীত অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা নিষেধ। সকলেই পরস্পর সদ্ভাবে কথাবার্তা কহিবেন। যখন কাহারও কিছু আবশ্যক হইবে তিনি কর্মাধ্যক্ষকে জানাইবেন।

৮। ব্রহ্মচারিগণ সন্ন্যাসিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

৯। সকল ধর্ম, ধর্মপ্রচারক ও সকল ধর্মের উপাস্য দেবতার প্রতিই যথাযোগ্য ভক্তিসম্মান রাখিতে হইবে।

১০। যথাসম্ভব সকলেই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কবিবেন। গাত্রবস্ত্রাদি সমুদয় পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

১১। কর্মাধ্যক্ষ দেখিবেন যেন সকলে সমুদয় পরিষ্কার রাখেন এবং যথাকালে আহারাদি পান।

১২। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলকে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিতে হইবে।

১৩। মঠাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী দেখিবেন যেন সকলে প্রাতঃকালে স্নানাদির পর নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী জপ, ধ্যান ও পূজাদি করিতেছেন।

১৪। যথাসম্ভব সকলে একত্র আহার করিবেন। তৎপবে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিবেন।

১৫। তৎপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী পৃথক পৃথক বা দুই তিন জনে একত্রে মিলিত হইয়া শাস্ত্র পাঠ করিবেন।

১৬। অপরাহ্নে পুনরায় পাঠ হইবে। তাহাতে একজন পাঠক থাকিবেন ও সকলেই শুনিবেন।

১৭। সন্ধ্যার পর পুনরায় জপ, ধ্যান ও স্তব পাঠাদি হইবে।

১৮। সমুদয় কার্য ও কথাবার্তা শান্তভাবে করিতে হইবে।

১৯। যাঁহারা বাহিরে ধর্মপ্রচার করিতে যাইবেন তাঁহারা এখানকার মত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা প্রচার বা ভ্রমণ করিতে বাহিরে যাইবেন, তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদের প্রচার বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বলিত অনূ্যন একখানি পত্র মঠে লিখিবেন। যাঁহারা চিঠিপত্রাদি রাখিবেন তাঁহারা ঐগুলি বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন ও মঠাধ্যক্ষের আদেশ ও উপদেশ মত তাঁহাদিগকে পত্র লিখিবেন ও তাহার প্রতিলিপি রাখিবেন।

২০। বাহিরের লোক বাহিরের ঘরে বসিয়া যাঁহার সহিত আবশ্যক কথাবার্তাদি কহিবেন।

২১। মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ মঠে রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন না।

২২। মঠের যে সকল কার্য সকলকে সমবেত হইয়া করিতে হইবে সেই সকল কার্যের পূর্বে ঘণ্টা বাজাইতে হইবে।

২৩। আবশ্যক মত এই সকল নিয়মের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারিবে।

মঠের নিয়ম অনুসারে সুধীর মহারাজের স্বহস্তে লিখিত এই নিয়মগুলি আজিও যত্নের সহিত রক্ষিত আছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সব গুরুতর বিষয়ে একটি মাত্র শব্দের পরিবর্তনও সমস্ত বিষয়েরই পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। অনেকে অভিযোগ করেন যে, এই নিয়মাবলী হইতে দুই একটি শব্দ পরে পরিবর্তিত করিয়া তাহার স্থলে অন্য শব্দ বসানো হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, সেরূপ হওয়া কোন কারণেই সম্ভব নয়, কেননা সত্যের উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভিত্তি স্থাপিত। এবং স্বামীজী যাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "তাঁহার বাণী এবং তিনি স্বয়ং" সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—তিনি যে কথাটি উচ্চারণ করিতেন—যেভাবেই তাহা উচ্চারণ করুন না কেন, তাহাই কার্যত ফলবতী হইত, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইত না।

স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহার ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

"তারপর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান স্নান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্র-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্র-গ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া "ডেলসার্ট" ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'দ্যাখ্, একটু দেখেশুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ্—দেখিস যদি কোন নিয়ম negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive করে দিবি।'

এই সময় স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সমস্ত ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বলরামবাবুর বাড়িতে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ শিষ্যগণকে আহ্বান করা হয়। এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক গঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী পুস্তকে যেভাবে বিবরণ লেখা হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

উদ্‌যোগ সভা, শনিবার ১লা মে ১৮৯৭ খৃঃ (Original Proceedings Book হইতে বাংলায় অনুবাদ) "১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে সন্ধ্যার সময় কলিকাতা ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে ' বলরামবাবুর বসত বাটীতে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থশিষ্য ও ভক্তগণের এক সভা হয়।

আলমবাজার মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসীও ঐ সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের আদর্শ, উপদেশ ও নীতির প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি

হওয়ায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার হওয়ায় ঐ কার্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একটি সংঘ গঠন বাঞ্ছনীয় বোধ হয় এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্র—যেখানে সকলে নিয়মিতভাবে মিলিত হইতে পারেন,—স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়ঃ—

১। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান।

২। পরমহংসদেবের উপদেশাবলী ও আদর্শ যাহাতে জনসাধারণ অবগত হয় তাহার উপায় নির্ধারণ।

৩। এই কার্যের অধিকতর প্রসারকল্পে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান (Sister bodies) সমূহের সঙ্গে কর্মপন্থার আলোচনা। অন্যান্য বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও পরমহংসদেবের প্রতি এবং তাঁর উপদেশের উপর শ্রদ্ধাই যাঁহাদের একমাত্র মিলন ক্ষেত্র এমন সকল লোককে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ সংঘ স্থাপনের ব্যবস্থা হইল।

যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁহাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে লইয়া একটি কার্যপরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হয় এবং বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য খরচের জন্য একটা চাঁদার তালিকাও করা হয়।

স্থির হইল যে, আপাতত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে সমিতির সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও পরিচালনার নিয়মাদির আলোচনা ও নির্ধারণের জন্য আগামী বুধবার সন্ধ্যায় কার্যপরিচালকমণ্ডলীর একটি প্রাথমিক সভা হইবে ইহাও স্থির হইল।

প্রায় চব্বিশ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বুধবারের সভার কার্যবিবরণী।

বুধবার, ৫ই মে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন

স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে সমিতির নাম, উদ্দেশ্য, কার্য-প্রণালী এবং পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী নির্ধারিত হইল।

সেইগুলি এইঃ—

নামঃ—রামকৃষ্ণ মিশন।

উদ্দেশ্যঃ—মানবের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পরমার্থিক প্রয়োজনে সেই সকল তত্ত্ব যাহাতে কার্যত প্রযুক্ত হয়, সেসকল বিষয়ে সাহায্য করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

মিশন বা ব্রতঃ—পৃথিবীর নানা ধর্মমতকে সেই এক চিরন্তন সার্বভৌমিক ধর্মেরই রূপান্তর মাত্র জানিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের

অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুশীলনই হইল এই সমিতির মিশন বা ব্রত।

কার্যপ্রণালীঃ—লৌকিক ও পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার উপযুক্ত লোক তৈয়ার করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেই সকল কেন্দ্রে শিল্প ও কলাবিদ্যাকে উৎসাহদান এবং বেদান্ত ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা জনসমাজে প্রবর্তন করাই হইল এই সমিতির কার্যপ্রণালী।

ভারতবর্ষে কাজঃ—জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিবার উপযুক্ত এমন সব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিক্ষক তৈয়ার করিবার জন্য সমগ্র দেশের বড় বড় শহরে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেই সকল শিক্ষকগণকে দেশেব বিভিন্ন অংশে (যাহাতে তাঁহারা জনসাধাবণের কাছে পৌঁছাইতে পারেন) পাঠাইবার ব্যবস্থা করাই হইল ভারতবর্ষের মিশনের কাজ।

বিদেশে কাজঃ—ভাবতের বাহিরেব দেশসমূহে প্রচারক প্রেরণ, ভারতে স্থাপিত কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভারত বহির্ভূত দেশসমূহের ইতিপূর্বেই স্থাপিত কেন্দ্রগুলির সহানুভূতি ও সহযোগিতা আনয়ন করা এবং নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপন করা।

সমিতির নিয়মাবলীঃ—

মিশনের কলিকাতা কেন্দ্র পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলঃ—

১। যিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে (মিশনে) বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শের প্রসারকল্পে সহযোগিতা করিতেছেন এবং করিবার জন্য যিনি প্রস্তুত এবং যিনি সৎজীবন যাপনের চেষ্টা করিতেছেন তিনিই—অন্য সভ্যরা আপত্তি না কবিলে এই সমিতির সভ্য হইবার অধিকারী।

২। যদি কেহ বাস্তবিকই অপারগ হন, তিনি ছাড়া আর সকল সভ্যকেই মাসিক আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক শাখার সভাপতির, সেই সেই শাখার যে কর্মপদ্ধতি তা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে। (অর্থাৎ শাখা কেন্দ্রের সভাপতির সে বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিবে।)

৪। কার্যপরিচালকমণ্ডলীর, সম্পাদকগণের সহায়ে সমিতির সভা আহ্বান করিবার ও কোষাধ্যক্ষগণের সহায় অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা থাকিবে।

৫। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬॥টার সময় বাগবাজার ১৩নং বোসপাড়া লেনে সমিতির সভা হইবে।

"স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সভাপতি পদে নির্বাচিত হইলেন।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি পদে নির্বাচিত হইলেন।

"স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র অ্যাটর্নি মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার আণ্ডার সেক্রেটারী এবং শিষ্য-শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। (স্বামী শিষ্য সংবাদ ৭৬ পৃঃ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ব্রহ্মচারী কপিল কর্তৃক বাংলা ১৩১৯ সালে প্রকাশিত)।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। উদ্যোগ সভার তারিখ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ১লা মে এবং মিশনের নামকরণ এবং সাধারণ সভাপতি ও কার্যপরিচালক-মণ্ডলী প্রভৃতি নির্বাচন ১৮৯৭ খৃঃ ৫ই মে তারিখে হয়। এখানে দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল ইংরেজী বিবরণীটিও দেওয়া হইল।

"Wednesday, 5th May, 1897" 2nd meeting of the Association.

Under the Presidency of Swami Vivekananda the name, object, method of work of the Association and the Rules for its guidance were fixed upon. These were the following:—

Name:—The Ramakrishna Mission.

Object:—The object of the Society is to propagate the principles propounded by Sri Ramakrishna and illustrated by his own life for the benefit of humanity and to help mankind in the practical application of those principles in their spiritual, intellectual and physical needs.

The mission:—The mission of this society is to carry on the work, inaugurated by Sri Ramakrishna, of fraternising the various creeds of the world knowing them to be only phases of one eternal universal religion.

Method Of Work:—The method of work is by starting centres in different plares to train spiritual and secular educations and by encouraging arts, industries and by popularizing the study of the Vedanta and other systems of spiritual thought as interpreted by the life of Sri Ramkrishna.

The Work In India:—The work in India is by starting centres in the capitals of the Empire to train

Sannyasins (ascetics) and grihasthas (House holders) as edcators of the people and to enable these teachers to reach the people by making them visit different parts of the country

Foreign Work :—To send missionaries to various foreign countries to bring the centres already existing in countries outside of India in sympathy and co-operation with those existing in India and to start other centres.

The Rules of the Association.

The following Rules were unanimously adopted for the guidance of the Calcutta Centre of the Mission :—

(1) Any one who believes in the Mission of Sri Ramakrishna, who is ready to co-operate for the spread of that mission and who endeavours to lead a moral life, would be eligible to the membership of this society, the other members not objecting.

(2) The members should pay a subscription not less than eight annas per month unless any one is specially incapable.

(3) The President of every branch shall have the power of calling meetings through the Secretaries and collecting funds through the treasurer.

(4) A meeting should be held every Sunday at 6-30 P.M. at the premises of No. 13, Bosepara Lane, Baghbazar.

Swami Vivekananda has been elected the general President of the Ramakrishna Mission.

Swami Brahananda has been elected the President of the Calcutta centre of the Mission.—" (Vide original Proceedings Book of the first Ramakrishna Mission, Page 4 to 7).

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এইভাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' এই নাম লইয়া যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জেনারেল প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন স্বামী

বিবেকানন্দ এবং কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি হইয়াছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামী সারদানন্দ তখন বিদেশে ছিলেন।

এখন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং এখন হইতে ৫৮ বৎসর আগেকার সেই দিনটি আমাদের বিশেষভাবেই স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।

স্বামীজী মিশন স্থাপন ব্যাপারে গৃহী ভক্তগণকেই সর্বাগ্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। সভ্য হওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তিনি নিয়মাবলীর এক নম্বরে বলিয়াছেন, 'যিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শের সহযোগিতা করিতে যিনি প্রস্তুত এবং যিনি সৎজীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই এই সমিতির সভ্য হইবার অধিকারী।' ইহার মধ্যে গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর কোন পার্থক্য করা হয় নাই।

তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে কলিকাতা কেন্দ্রের 'সিসটার বডিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অধীন কেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেক কেন্দ্রই মূল কেন্দ্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কেন্দ্র পরিচালনা করিবে, এইরকম অভিপ্রায় তাঁহার উক্তিতে অন্যত্রও দেখা যায়। বাধ্যতা যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই বিশেষভাবে প্রয়োজন তা তিনি যেমন ঘোষণা করিয়াছেন, সেই রকম স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথাও বিশেষভাবেই বলিয়াছেন। দাসসুলভ মনোভাব সর্বথা বর্জনীয়—এইটি তাঁহার বাণীর মধ্যে সকল জায়গায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

আর একটি কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়াছেন, সেটি হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। 'যত মত তত পথ' এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি মটো। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব যেমন ভিন্ন, তেমনি চিন্তাপ্রণালীও এক নহে। এই বিভিন্নতা একই মিলনমন্ত্রে এক হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ দেশে দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার কর্মতৎপরতা দিনে দিনে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভাবই হইতেছে সকল কর্মের প্রেরণাস্বরূপ, ভাবহীন কর্মকেই গীতা বলিয়াছেন কর্মবন্ধন। গীতার এই মহান সত্য কর্মী মাত্রকেই প্রতিক্ষণে স্মরণ রাখিতে হইবে।

'স্বামী শিষ্য সংবাদ' নামক গ্রন্থে স্বামীজীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাঁহার মনের ভাব যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এখানে সামান্য কিছু তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে 'এসব বিদেশীভাবে কাজ করা হচ্ছে' এই কথা বলিয়া যখন অনুযোগ করেন, তখন উত্তরে স্বামীজী বলেন, 'সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয়নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।'

শিক্ষার দিকে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়মপ্রণয়ন হইতেই জানা যায়। ভারতবর্ষের কাজ হইল

শিক্ষক তৈয়ার করা, সন্ন্যাসী বা গৃহী যে-কোনো শ্রেণী হইতেই হউক। আর সেই সকল শিক্ষককে দেশের বিভিন্ন অংশে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার ভারও লইতে হইবে মিশনকেই।

তিনি তাঁহার নিয়মাবলীতে (যেটি বেলুড় মঠের জন্য পরে করিয়াছিলেন) ২১নং নিয়মে লিখিয়াছেন—

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ 'টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' করিতে হইবে।"

তিনি তাঁহার ১৭নং নিয়মে একথাও বলিয়াছেন যে, "খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য যাহারা পুনর্বার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে।" (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হইয়া আবার সুপথে ফিরিতে চায়, তবে তাহাকে সে সুযোগ দেওয়া হইবে।)

এই সকল নিয়মগুলির প্রত্যেকটিই মহামূল্য। ইহার মধ্যে আরও দুটি একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

—বৌদ্ধ ধর্মে যেমন 'সংঘম্ শরণং গচ্ছামি' উক্তি আছে, স্বামীজীর প্রবর্তিত নিয়মে সেইভাবেই 'সংঘ'কে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। ১ম নম্বরের নিয়মে বলা হইয়াছে, 'সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সংঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহ-পরলোক উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইবেন।

১১নং নিয়মে বলা হইয়াছে, 'যদি কাহারও পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সংঘের নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সংঘ যাহা বিধান করিবেন, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে।'

সাধন প্রণালীর ষষ্ঠ নিয়ম এইরূপঃ -'ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি মহত্তর কার্য করেন।'

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইল। যদিও 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ প্রচার'ও বলা হইত, কেননা 'মিশন' শব্দটি বিদেশী।

'মিশন' স্থাপনের বিবরণ তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

প্রথম—উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী-শিষ্য সংবাদ—১৯১২ খৃঃ। প্রকাশক ব্রহ্মচারী কপিল।

এই গ্রন্থের ৭৩-৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—স্বামীজী কয়েকদিন হইতে বাগবাজার ৺বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ একত্রিত হইতে আহ্বান কবায় ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়িতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও এখানে উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠন করা। (এটি প্রথম দিনের অধিবেশনের কথা)।

দ্বিতীয়—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ৩য় খণ্ড। এই জীবনী তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণের সংগৃহীত বিবরণ। ইহাতে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপঃ—"একটি সমিতি গঠন করবার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হওয়ার জন্য স্বামীজী তাঁদের আহ্বান করায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ১লা মে বৈকালে বলরামবাবুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণ একত্রিত হয়েছিলেন।"

তৃতীয়—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বেলুড় মঠ হইতে মিশনের গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রকাশিত রেজেস্ট্রি করা দ্বিতীয় সাধারণ রিপোর্ট, ১—৩ পৃষ্ঠা। ইহাতে আছে,—"একটি সমিতি স্থাপন কববার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হবার জন্য স্বামীজী তাঁদের আহ্বান করায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে কলিকাতা বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে ৺বলরাম বসুব বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণ এবং ভক্তগণ সমবেত হয়েছিলেন।"

এবং অরিজিন্যাল প্রসিডিং বুক অর্থাৎ মূল খাতায় আছেঃ—

In pursunce to a call from Swami Vivekananda a meeting of the Grihastha disciples and followers of Sri Ramakrishna Deva was held on the evening of the 1st May, 1897, at the premises of late Babu Balaram Bose, No. 57, Ramkanta Bose's Street, Calcutta. Several

Sannyasis of the Alambazar Math favoured the meeting with their presence.

৫ই মে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইবার পর ৬ই মে স্বামীজী আলমোড়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার আলমোড়া রওনা হইবার আগেই মিস মূলার ও মিস্টার গুডউইন আলমোড়ায় চলিয়া গিয়াছেন।

৫ই তারিখে মিশন প্রতিষ্ঠা হইবার পর স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্ত্য দেশের এক শিষ্যাকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।......... "আমি কাল আলমোড়া যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটি শৈলনিবাস।

* * "কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গিয়েছে। আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে, প্রধান তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার 'নর্মাল স্কুলস্' (সাধারণ বিদ্যালয়) হবে, ঐ তিন স্থান থেকে আমি ভারতবর্ষে অভিযান করতে চাই।

"আমি আর কয়েক বৎসর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই রামকৃষ্ণেরই হয়ে গিয়েছে।

* * * "আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলাম, এখানে আর এক লোক হয়ে গিয়েছি। এখানে সমস্ত জাতিই আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি বলে মনে করছে—আর সেখানে ছিলাম একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র। এখানে রাজারা আমার গাড়ি টানে—আর সেখানে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে এমন কথা বলতে হবে, যাতে সমস্ত জাতির-আমার সমস্ত স্বদেশবাসীরই মংগল হয়, সেই কথাগুলি দু'চার জনের যতই অপ্রীতিকর হোক্ না কেন।"

এই পত্রে যেন একটি বিদায়ের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই সময় স্বামীজীর শরীর যে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। তাই তিনি ভারতবর্ষের তিনটি স্থানে তিনটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও প্রচারকার্যের কোন হানি না হয়। এই তিনটিকেই তিনি নর্ম্যাল স্কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোনটিকেই প্রধান কেন্দ্র বলেন নাই।

আর সমস্ত দেশেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহাও তিনি অনুভব করিয়াছেন।

এই মে মাসেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম রিলিফের কার্য আরম্ভ হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অন্নাভাবে অনেক লোকই মারা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে সাহায্য কেন্দ্র খোলা বিশেষ প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যতালিকার মধ্যে এই রিলিফের কার্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী যাহাই হোক্ না কেন রামকৃষ্ণ মিশনই অগ্রসর হইয়াছে সাহায্যদানের জন্য সর্বাগ্রে; এই দৃষ্টান্ত

অনুসরণ করার পরে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান সাহায্যদানের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং ইহাতে সমগ্র দেশে জনসেবার একটি আবহাওয়া দেখা দেয়। ছেলেরা এইভাবে সৎকার্যে আগাইয়া যাইবার একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশের নৈতিক উন্নতিও হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। একভাবে রামকৃষ্ণ মিশনই দেশের এই হাওয়া পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ।

মুর্শিদাবাদে রিলিফ কাজের ভার পাইলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং তাঁহার সাহায্যকারী হইয়া স্বামীজীর দু'জন শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দও তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদ রওনা হইলেন। এই ভাবে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা নামক গ্রামে রিলিফের কার্য আরম্ভ হইল। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম রিলিফের কাজ।

স্বামীজী আলমোড়া হইতে এই রিলিফ কাজ কিভাবে চলিতেছে তাহার খবর লইতেছিলেন। তিনি এই সময় লিখিয়াছেন—"অখণ্ডানন্দ মহুলায় অদ্ভুত কর্ম করেছে বটে, কিন্তু কার্যপ্রণালী ভাল বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে সে একটা ছোট গ্রাম নিয়েই তার শক্তি ক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণ কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে,—কই এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হ'তে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান,—চরিত্র এবং বুদ্ধি-বৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার। আমি সে সম্বন্ধে তো কোন কথাই শুনছি না—কেবল শুনছি এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

"ব্র'কে (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) বল বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরো, বোধ হচ্ছে ঐ কার্যে এ পর্যন্ত ফলত কিছু হয়নি, কারণ তারা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের ভিতর দেশবাসীর শিক্ষাবিধানের জন্য সোসাইটি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেনি। ঐরূপ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হ'তে পারবে এবং বিবাহবন্ধনে জড়িত হবে না। এবং তা হলেই ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে আপনাদের রক্ষা করতে পারবে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়, কিন্তু তার দ্বারা লোকের যথার্থ কল্যাণ হয় না, লোকের যথার্থ কল্যাণ যাতে হয় তারই চেষ্টা করতে হবে।

"সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে—একটা ছোট কুঁড়েঘর নিয়ে গুরুমহারাজের মন্দির কর,—গরিবরা সেখানে আসুক—তাদের সাহায্যও করা হোক্,—আর তারা সেখানে পূজাও করুক। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সেখানে 'কথকতা' হোক্। ঐ 'কথকতার' দ্বারা তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। ক্রমে ক্রমে স্থানীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবে, তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ কুঁড়ে ঘরে স্থাপিত মন্দিরটি

একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণতও হ'তে পারে। যারা দুর্ভিক্ষ মোচন কার্যে যাচ্ছে তারা প্রথমে প্রত্যেক জেলার মাঝামাঝি একটা জায়গা ঠিক করুক এবং সেখানে এইরকম কুঁড়েঘরে মন্দির স্থাপন করুক—যেখান থেকে আমাদের সমস্ত কাজ সামান্যভাবে আরম্ভ হবে। * *

"যারা দুর্ভিক্ষ মোচনের কাজ করছে, তাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দান যেন উপযুক্ত পাত্রে পড়ে—জুয়াচোরেরা যেন ঠকিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ষ এইরকম অলস জুয়াচোরে পূর্ণ, আর মজা হচ্ছে এই তারা কিন্তু না খেয়ে মরে না, কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্র'কে বল যারা দুর্ভিক্ষে কাজ করছে, তাদের সকলকে এই কথা লিখ্‌তে—যাতে কোনও উপকার নেই এমন কাজে তাদের টাকা খরচ করতে দেওয়া হবে না, আমরা চাই যতদূর সম্ভব কম খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকাজ করতে।

(We want the greatest possible good work permanent from the least outlay).

"এখন তোমরা দেখছো, তোমাদের নূতন নূতন মৌলিক ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই সমস্ত কাজটাই চুরমার হয়ে যাবে। এইরকম করতে পার, তোমরা সকলে মিলে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটা সভা কর—আমাদের হাতে যে অল্প স্বল্প সম্বল আছে তা থেকে কি করে সর্বাপেক্ষা ভাল স্থায়ী কাজ হ'তে পারে। কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এ বিষয়ে খবর দেওয়া হোক্—সকলেই নিজের মতামত বক্তব্য বলুক—সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক্—বাদ প্রতিবাদ হোক্ তারপর আমাকে তার একটি রিপোর্ট পাঠাও।"

এই পত্রে স্বামীজীর প্রত্যেকেরই স্বাবলম্বন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ এবং স্থানীয় লোকের নিজ নিজ স্থানের সকল সমস্যা সমাধানের এবং সংগঠনের ভার নিজেদেরই লওয়া উচিত এইরকম মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আগেও বলিয়াছিলেন, "আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী।"

গঙ্গাধর মহারাজ মুর্শিদাবাদে মহুলা গ্রামে যখন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য করিতেছিলেন তখন মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার লেভিঞ্জ তাঁহার কাজে সব সময় লোক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই উৎসাহ ও সাহায্যে সেখানে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন বরাবরই এই আশ্রমের কার্যভার বহন করিয়াছেন এবং এই আশ্রমটিই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলাদেশে প্রথম স্থায়ী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন' নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি পত্র বাহির করেন, এই পত্রে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন এই পত্রখানি বাহির হয়। তাহার ভাবার্থ এইরূপঃ— "স্বামী অখণ্ডানন্দজীর দুর্ভিক্ষ রিলিফ কার্য দেখে স্থানীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃপক্ষগণ এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, মুর্শিদাবাদের কালেক্টর মিস্টার

লেভিঞ্জ তাঁকে অর্থ ও লোক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতেন এবং যখনই তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়া হত তিনি তাঁকে (অখণ্ডানন্দজীকে) পরামর্শও দিতেন। সে সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ অসহায় দুটি অনাথ বালককে—যারা অন্নাভাবে মরণাপন্ন—দেখ্‌তে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং সেই থেকে সেই পিতৃমাতৃহীন-দ্বয়কে পিতামাতার স্নেহে পালন করতে থাকেন।

"ঐ দুটি অনাথ বালকের দুরবস্থা মহৎ ও উচ্চমনা লেভিঞ্জের হৃদয়কেও স্পর্শ করে এবং তিনি অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনের জন্য অনুরোধ করে বলেন যে, যদি তাঁর আপত্তি না থাকে তা হ'লে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে জমি দিতেও প্রস্তুত আছেন। ঐ প্রস্তাব অখণ্ডানন্দ স্বামীজীরও (যিনি তাঁর দেশবাসীর সেবার জন্য সকল সময়েও প্রস্তুত) মনে লাগ্‌লো এবং তিনি সম্মত হলেন। তিনি মত দেওয়ায় গভর্নমেণ্ট তাঁকে (অর্থাৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীকে) পঞ্চাশ বিঘা জমি দেন এবং তথায় অনাথ বালকদের থাকবার জন্য একটি আস্তানাও নির্মিত হয়। মহুলা অনাথ আশ্রম স্থাপনের ইহাই ইতিহাস— যেখানে কোমল হৃদয় উন্নতমনা স্বামী অখণ্ডানন্দের অপত্যস্নেহে পালিত আটটি অনাথ বালক আশ্রয় পেয়েছে।"

এই পত্র থেকে বোঝা যায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জমিটি মহুলা গ্রামে যিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণের কার্যে ছিলেন সেই অখণ্ডানন্দ স্বামীকেই দিয়াছিলেন এবং এইভাবে জমিদানে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বা মিশনের সাধারণ সভাপতি ইঁহারা কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বরং স্বামীজী এই সংবাদে আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকে উৎসাহ দিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮৯৭ খৃঃ ২৯শে জুলাইয়ের একখানি পত্র এইরূপঃ—"কল্যাণবরেষু— তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হ'য়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অরফ্যানেজ সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় তা উত্তম ও শ্রীমহারাজ তা অচিরাৎ পূর্ণ করবেন ইহা নিশ্চিত। একটা স্থায়ী সেন্‌টার যাতে হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। * * টাকার জন্য চিন্তা নাই, কল্য আমি আলমোড়া থেকে প্লেনে (সমতলে) নামব, যেখানেই হাঙ্গামা হবে সেইখানেই একটা চাঁদা করব ফেমিনের জন্য, ভয় নাই। আমাদের কলকাতার মঠ যে প্রকার—ঐ নমুনায় প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটি মঠ হবে তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" (পত্রাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ ৩৭নং পত্র)।

এইভাবে প্রথমেই মুর্শিদাবাদে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু তখনও ঠাকুরের অস্থি সমাধিদানের জন্য গঙ্গাতীরের জমি ক্রয় করা হয় নাই। জীবসেবার মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রকৃত সেবা, ইহাই ছিল স্বামীজীর উপদেশের সার মর্ম, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" এই বাণী যেন এই অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া মূর্তরূপে প্রকটিত হইল।

স্বামীজীর প্রত্যেক ভাষণে প্রত্যেক পত্রে এই সুরটিই যেন প্রধান সুর।

তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেনঃ—"বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ!' বলায় কোন ফল নাই, যদি গরিবদের জন্য কিছু করতে না পার। * * * যদি মাংস খেলে লোকে অসন্তুষ্ট হয় তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করবে, পরোপকারের জন্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করাও ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নয়, গেরুয়া মহাকার্যের নিশান। কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' অঞ্জলি দিতে হবে। পড়েছ তো, 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব'—আমি বলি 'দরিদ্রোদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব'।"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে একখানি পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছেনঃ—"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর-দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য? দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ,—আমি ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি—এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মেলে কি?

'সর্বশাস্ত্র পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্যপুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।'

"সত্য নয় কি?

"দাদা, এই সব দেখে বিশেষত দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না। একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম কেপ্ কমোরীন্ অন্তরীপের মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপরে বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি,—লোককে মেটাফিজিক্স্ (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে—তার কারণ মূর্খতা। আমরা চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি—আর দু'পা দিয়ে মাড়িয়েছি। * *

"যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়,—নানা উপায়ে নানা কথা ম্যাপ, ক্যামেরা ও গ্লোব প্রভৃতির সাহায্যে আচণ্ডালের উন্নতি করে বেড়ায় তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না?

"আমরা একটা জাতি হিসাবে আমাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি এবং তাই ভারতে সকল দুর্বলতার কারণ। জাতির ঐ হারানো ব্যক্তিত্ব আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে এবং জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses.

"এই জনসাধারণ,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তাদের পদতলে দলিত করেছে। আবার তাদের পুনরুত্থানের শক্তি, তা তাদেরই ভিতর থেকে জাগ্রত করতে হবে—আর গোঁড়া হিন্দুদের এই কার্য করতে হবে। সকল দেশেই যে দোষসমূহ আছে, তা ধর্মের সংশ্লিষ্ট নয়, বরং ধর্মের বিরুদ্ধেই। সুতরাং ধর্মকে দোষী করা যায় না—দোষ মানুষের।

"এই কাজ করতে হলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই অর্থ। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে ১০।১৫টি লোক পাব, অর্থের চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!! তাই আমেরিকা এলাম, নিজে উপার্জন করবো, ক'রে দেশে ফিরবো। and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life. এবং জীবনের শেষ কটা দিন এই একমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গ করবো।"

স্বামীজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, "মহোৎসব খুব ধুমধামে হয়েছে ভাল কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই মঙ্গল। তবে একটা কথা—মহাপুরুষগণ যখন আসেন, বিশেষ কোন শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নয়। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁদের সেই উপদেশ বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নামের জন্য মারামারি করে,—এই তো পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়—আমি কোন খাতিরে আনি না—তবে তাঁর উপদেশ, জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর অবশ্য মন্দ নয়, তবে ঐটিই all in all (সর্বস্ব) করে ফেলবার tendency আছে লোকের, আমার তাই ভয়। আমি জানি তারা কেন ঐ পুরানো ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠান পদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit চায় work, কোনও outlet নেই (অর্থাৎ অন্তরাত্মা চায় কাজ, বাহির হবার পথ পায় না), তাই ঘণ্টা নেড়ে energy খরচ করে।

"যে আত্মম্ভরি আপনার যশ খুঁজছে, আয়েস খুঁজছে—তার নরকেও জায়গা নেই। আর যে আপনি নরকে গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র - ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহাসন্ধিপুজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে সেই আমার ভাই,—সেই তাঁর ছেলে। এই টেস্ট (পরীক্ষা) যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণত্যেয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়,—তারা তফাৎ যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়।"

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী আর একখানি পত্রে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভাই-দের লিখিয়াছেন—"আমাদের জাতের কোন ভরসা নেই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মনে আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে মিলে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন—ত্যামন ছিলেন—আর আষাঢ়ে গপ্পি,—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে! হরে! বলি একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ—তা নয়, খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হ'ল—কাল তার উপর ভেঁপু হ'ল—পরশু তার উপর চামর হ'ল—আজ খাট হ'ল,—কাল খাটের ঠেঙে রূপো বাঁধানো হ'ল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে—আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প বিশ হাজার মারা হ'ল,—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ,—আর শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র ইত্যাদি। একেই ইংরেজিতে imbecility বলে—যাদের মাথায় ঐ

রকম বোকামো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম দু'বার ঘুরবে, না চারবার—ঐ নিয়ে যারা তাদের মাথা দিনরাত ঘামাতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা। আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া, জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করবে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তাঁরই সেবা—এরই নাম কর্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়,—ওর নাম পাগলাগারদ। ক্রোড় টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি মাখছেন,—এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা মরে যাচ্ছে।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী আলমোড়া হইতে ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে লিখিলেন—"কলকাতার মিটিংএর খরচখরচা বাদে যা বাঁচে ঐ famineএ পাঠাও বা কলকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর। হল্ ফল্ ঘোড়ার ডিম থাক, প্রভু যা করবার তা করবেন। * * ঠাকুর পূজার খরচ দু' এক টাকায় মাসে করে ফেলবে; ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে আর কি না ক্ষীর, সর, মাখন ইত্যাদি ভোগ চড়ানো হচ্ছে। এ মহাপাপ, শুধু জল তুলসী দিয়ে ঠাকুরের পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দেবে—তা'হলে সব কল্যাণ হবে।"

'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' এই কথাটি স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন সাধনার মন্ত্রস্বরূপ। বৈষ্ণবধর্মে "জীবে দয়া" কথাটি আছে, কিন্তু পরমহংসদেব ঐ কথাটি আবৃত্তি করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "দয়া? না, না, দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

স্বামীজীর আলমোড়া হইতে সমতলে নামিবার সময় হইয়াছে জানিয়া আলমোড়ার অনুরক্ত বন্ধুগণ ও ভক্তগণ যাওয়ার আগে তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেজন্য স্বামীজী জিলা স্কুলে একটি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সময় আলমোড়ার ইংরেজ বাসিন্দাগণ কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বামীজীর একটি বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে স্থানীয় ইংলিশ ক্লাবে গুর্খা সৈন্যদলের কর্নেল, কর্নেলপুলি সাহেবের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় স্বামীজী আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মিস মুলার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ এইরূপঃ—

"আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া স্বামীজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের একত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন। মুহূর্তের জন্য বোধ

হইল—বক্তা, বক্তৃতা এবং শ্রোতৃগণ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন আমি, তুমি বা উহা কিছুই নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য সেই আচার্যশ্রেষ্ঠের দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসৃত আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া এক একত্বের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত রহিলেন। যাঁহারা অনেকবার স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনে এইরূপ অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর দোষ-গুণ-সমালোচক শ্রোতাগণের সম্মুখে বক্তৃতাদাতা বিবেকানন্দ থাকেন না—সে সময়ের জন্য যেন সব বিভিন্নতা বা বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়, নামরূপ অদৃশ্য হয়, কেবল এক কৈবল্যমাত্র বিরাজিত থাকে—যাহাতে বক্তা, শ্রোতা ও বক্তব্যবাক্য সবই এক হইয়া যায়।”

বেলুড় মঠের জমি ক্রয়

স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়া ত্যাগ করিয়া ৯ই আগস্ট বেরিলি আসিয়া পৌঁছিলেন। যেদিন আসিলেন সেদিনই জ্বর। কিন্তু সেই জ্বর লইয়াই

স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়া ত্যাগ করিয়া ৯ই আগস্ট বেরিলি আসিয়া পৌঁছিলেন। যেদিন আসিলেন সেদিনই জ্বর। কিন্তু সেই জ্বর লইয়াই
পরদিন তিনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত 'অনাথ আলয়' দেখিতে গেলেন। ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে বেদান্ত চর্চা হয় এজন্য একটি ছাত্র-সমিতিও প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইভাবে তিন চারিদিন চলিল কিন্তু ১২ই তাঁহার জ্বর প্রবল হইয়া দেখা দিল। সেইদিন রাত্রেই তিনি বেরিলি হইতে আম্বালায় চলিয়া আসিলেন।

আম্বালায় তিনি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। এই সময় মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার সিমলা হইতে স্বামীজীর সংগে মিলিত হইলেন।

আম্বালায় অনেক আর্যসমাজী আছেন। স্বামীজী যে কয়দিন এখানে ছিলেন প্রত্যহ ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য আসিতেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্বনাম ছিল মূলশঙ্কর। গুজরাটের এক সামবেদী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পিতা সম্পত্তিশালী এবং অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আট বৎসর বয়সেই পুত্রকে উপনয়ন দেন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। কিন্তু দয়ানন্দের মন স্বভাবতই বিচারশীল ছিল, সেইজন্য যে সকল অনুষ্ঠান তাঁহাকে পিতৃনির্দেশে পালন করিতে হইত সেই সকল অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বালক বয়সেই তাঁহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইত। অবশেষে এক শিবরাত্রির রাতে শিবমন্দিরে পূজার জন্য যখন তিনি রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট ইঁদুর আসিয়া শিবের জন্য নিবেদিত নৈবেদ্য হইতে চাল খাইয়া যাইতেছে অথচ শিব তাহার কোন প্রতিবিধানই করিতে পারিতেছেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া সেই মুহূর্তেই তাঁহার মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস হইল। কেবল তাহাই নয়, হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের উপরও তাঁহার আর শ্রদ্ধা রহিল না।

এই বিদ্রোহী মনোভাব লইয়াই মূলশঙ্কর উনিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং পনেরো বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎ পান। এবং তাঁহার কাছেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই ছিলেন মহা

তেজস্বী এবং সামাজিক কুসংস্কার ও লোকাচারের অনুসরণকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করার বিরুদ্ধে উভয়েই মনে মনে বিদ্রোহী ছিলেন। এই বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য এবং তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার জন্য তিনি অনেকেরই অপ্রীতি-ভাজন হন এবং অনেকবার তাঁহাকে হত্যা করিবারও চেষ্টা করা হয়। অবশেষে হত্যাকারীর হস্তেই তাঁহার প্রাণ যায় কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতবাদ সমস্ত পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লালা লাজপৎ রায় আর্যসমাজী ছিলেন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন প্রচারের জন্য নিজ জীবন আহুতি দিয়াছেন।

একদিক দিয়া যদিও তাঁহারা বহু জনহিতকর কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে সকল সময় সেবার কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, বলিতে গেলে আর্যসমাজীরাই এইভাবের সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পথপ্রদর্শক,—স্ত্রীজাতি যাহাতে সুশিক্ষিত হয় এবং সামাজিক পীড়নে পীড়িত না হয় সেজন্যও তাঁহারা সকল সময়েই সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য অনেক সময় তাঁহারা একদেশদর্শিতা দোষের কবলে পড়িতেন। এজন্য আর্যসমাজের নেতাগণের সহিত স্বামীজীর মাঝে মাঝে বিতর্কও হইয়াছিল। একবার লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজের সহিত তাঁহার বেদের তাৎপর্য লইয়া বিতর্ক হয়। আর্যসমাজের মতে "বেদের কেবল একরকম অর্থই হইতে পারে," এই মতবাদের স্বামীজী প্রতিবাদ করেন এবং এই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "লালাজী, আপনারা যেভাবে কোন বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমরা fanaticism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সাধনে যে ইচ্ছা বিশেষ সহায়তা করে তাহাও আমি জানি। * * * আমার গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমিই ঐরকম প্রচারের বিরোধী। কারণ, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজের বিশ্বাস ও ধারণার সাহায্যে উন্নতি করিতে দিলে যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয় কিন্তু সে উন্নতি দৃঢ়মূল হয়।

(ভারতে বিবেকানন্দ—৪৮১ পৃঃ)

আর্যসমাজিগণের সঙ্গে "শ্রাদ্ধ" সম্বন্ধেও স্বামীজীর একবার বিতর্ক হইয়াছিল। "শ্রাদ্ধ" ব্যাপারটি আর্যসমাজিগণ একেবারেই 'বাজে' বলিয়া মনে করেন, স্বামীজী হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াই অবশ্য এই বিতর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে যদি এই 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের ভিতর যে গভীর একটা আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা আছে সে সম্বন্ধে অনুভূতি না থাকিত তাহা হইলে কখনই তিনি তর্কে যোগ দিতেন না। তিনি একাধারে ছিলেন যোদ্ধা ও সন্ন্যাসী। সেজন্য যাহা যুক্তিসঙ্গত নয়, যাহা পল্লবগ্রাহী মনোভাব হইতে উদ্ভূত সে সকল আত্মম্ভরিতা-প্রসূত মতবাদ তীক্ষ্ণ যুক্তি অস্ত্রে

খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিতেন, অথচ বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার মোহ অথবা বিদ্বেষ ছিল না।

২০শে আগস্ট স্বামীজী আম্বালা হইতে অমৃতসর যান, সেখানে নিকটবর্তী ধর্মশালা নামক স্বাস্থ্যনিবাসে কয়েকদিন থাকিয়া আবার অমৃতসরে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে দুইদিন মাত্র অবস্থান করিয়া রাওলপিণ্ডি যাত্রা করেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে মরি বা বারমুলা। ৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী বারমুলা পেঁছান এবং সেখান হইতে নৌকায় শ্রীনগরে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় শ্রীনগরের চীফ জাস্টিস্ ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে মহা সমাদরে নিজের বাড়ি লইয়া গেলেন।

শ্রীনগর কাশ্মীরের অন্যতম রাজধানী। রাজা রাম সিং ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে রাজভবনে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং স্বামীজীকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজে অন্য সকলের সহিত নিম্নে আসন গ্রহণ করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর জন্য একটি হাউসবোটের ব্যবস্থা করা হয়, কেননা হাউসবোটে থাকিলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এবং নানা স্থান ঘুরিয়া দেখাও হইবে।

২০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী পামপুর নামক স্থানে যান। ২২শে তারিখে অনন্তনাগে গিয়া বিজবেরার মন্দির ও অনন্তনাগ দর্শন করেন এবং ২৪শে তারিখে মার্তণ্ড ধর্মশালা ও সেখান হইতে অক্ষয়বল যান। এই সকল স্থান কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অক্ষয়বল হইতে উলার হ্রদ দিয়া তিনি প্রথমে বারমুলা ও তাহার পর মরিতে ফিরিয়া আসেন। এখানে সেভিয়ার দম্পতি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মরিতে চারদিন থাকিয়া ১৬ই অক্টোবর তিনি আবার রাওলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসেন। স্বামীজীর 'মরি'তে অবস্থান করিবার সময়ে সেখানকার পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালিগণ ১৪ই তারিখে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দান করেন, সেই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী একটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রাওলপিণ্ডিতে স্বামীজী তথাকার উকীল হংসরাজের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনগণ সেখানে সর্বদাই তাঁহাকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত আলোচনার জন্য আসিতেন। এখানে আর্যসমাজের একজন নেতা স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার আলাপ ও আলোচনা হয়, এই আলোচনায় স্বামীজী প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এই আলোচনার সময় জজ নারায়ণ দাস ও ব্যারিস্টার ভক্তরাম এবং আরও অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই তারিখে তিনি সর্বসাধারণের অনুরোধে ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্ম'। ইহার পর তিনি স্থানীয় কালীবাড়িতে ১৯শে তারিখে আর একটি বক্তৃতা দেন।

২০শে অক্টোবর তিনি জম্বু রওনা হন। কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে জম্বু যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

জম্মুতে স্বামীজী পৌঁছিলে রাজকর্মচারিগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার জন্য যে বাসগৃহ ঠিক করা ছিল, সেখানে লইয়া যান। পরদিন তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে রাজপরিবারের সকলে এবং রাজকর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। এখানে একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। মহারাজ নানা বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন এবং স্বামীজী তাহার উত্তর দেন।

মহারাজ যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে ছিল 'সন্ন্যাস' কাহাকে বলে, পাপই বা কি এবং পুণ্যই বা কি, সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় কি না ইত্যাদি। চারি ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই প্রশ্ন ও উত্তর চলিয়াছিল। সামাজিক বিধিনিষেধগুলির উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলেন, অনেক স্থলে এই সকল বিধিনিষেধের কোন মানেই হয় না, যেমন সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করা। বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা না করিলে বিদেশ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই হয় না এবং সেই অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ মূল্য আছে। ইহা ছাড়া হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা প্রচার করিবার জন্যও সমুদ্রপারে গমন একান্ত প্রয়োজন। পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন যে, যেগুলি যথার্থ পাপ, যেমন ব্যভিচার, সুরাপান, পরের অনিষ্ট সাধন, ধর্মের নাম লইয়া কতকগুলি নির্দোষকে শাস্তি দান, মিথ্যাচরণ—এগুলি অনেক সময় পাপ বলিয়াই ধরা হয় না, ইহাতে পুরুষেরা কোন সামাজিক শাস্তি পায় না বা সমাজচ্যুত হয় না, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার খুঁটিনাটি এবং সমুদ্রযাত্রা কিম্বা ঐ রকম কোন সংস্কার লঙ্ঘনের অপরাধই সমাজচ্যুতির কারণ হয়। বস্তুত ধর্মের নামে কতকগুলি কুসংস্কার ও প্রথাকেই মর্যাদা দেওয়া হয়।

২৯শে অক্টোবর স্বামীজী জম্মু হইতে শিয়ালকোটে যান। শিয়ালকোটে তিনি দুটি বক্তৃতা দেন, এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন। স্বামীজীর এই প্রস্তাব অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগস্বরূপ একটি কমিটি স্থাপিত হয় এবং স্বামীজীর ভক্ত স্থানীয় উকীল লালা মুলচাঁদ ইহার সেক্রেটারী হন।

৫ই নবেম্বর স্বামীজী লাহোরে আসেন, লাহোরে সনাতন ধর্মসভার সভ্য-বৃন্দ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং 'রাজা ধ্যানসিংহের হাবেলী' নামক প্রাসাদে লইয়া যান। ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সেখান হইতে তাঁহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া যান।

আমরা স্বামীজীর বিভিন্ন দেশে পর্যটনের সময় দেখিতে পাই, সকল স্থানেই তাঁহার বঙ্গদেশবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। লাহোরেও তাঁহার ছেলেবেলার এক বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া যায়। ইনি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু। বোসের সার্কাস তখনকার দিনে একটি বিখ্যাত সার্কাস ছিল, ভারতবর্ষের সর্বত্রই এবং ভারতের বাহিরেও এই সার্কাস কোম্পানী খেলা দেখাইতে যাইত। স্বামীজী যখন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের

বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন সেই সময় একদিন মতিবাবু সেখানে যান; তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ছেলেবেলায় একই আখড়ায় কুস্তি করিতেন এবং দু'জনে দু'জনকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন।

মতিবাবু দূর হইতে স্বামীজীকে দেখিলেন কিন্তু কাছে যাইবার সাহস পাইলেন না; তাঁহার মনে হইল, এই তেজপুঞ্জ সর্বজনপূজিত সন্ন্যাসীই কি তাঁহার সেই ছেলেবেলার খেলার সাথী নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বামীজী যখন কাছে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মতি, তুই এখানে আছিস?" তখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তবুও তিনি প্রথমে সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই স্বামীজীকে বলিলেন, "ভাই, এখন আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?" তখন স্বামীজীর কণ্ঠে সেই ছেলেবেলার কৌতুক ও আত্মীয়তার সুরই শুনিতে পাইলেন, "হ্যাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস? আমি কী হয়েছি? আমিও সেই নরেন আর তুইও সেই মতি।" এই কথায় মতিবাবুর সঙ্কোচ দূর হইয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইল।

স্বামীজী লাহোরে এগারো দিন ছিলেন এবং ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। "আমাদের সমস্যাগুলি," "ভক্তি," "হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি-সমূহ" এবং আরও দুইটি বক্তৃতা। "ভক্তি" বক্তৃতাটি সার্কাস প্রাঙ্গণে দেওয়া হয়। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে "বেদান্ত" নামক বক্তৃতাটিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছিল, সেই বক্তৃতায় স্বামীজী বেদান্তের বহু তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বেদান্ত সমদর্শী। স্বামীজী ভারতবর্ষের বহু দেশে পদব্রজে পর্যটন করিয়াছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের ভিতর মিশিয়াছেন। তিনি রাজপ্রাসাদে ও কুটীরে বাস করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ধনী ও দরিদ্রদের জীবনযাত্রায় কতখানি পার্থক্য। দেশ যে অজ্ঞতা ও অন্ধ সংস্কারে ধ্বংসের পথে যাইতে বসিয়াছে তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। একদিকে প্রবলের শোষণ ও শাসন, অন্যদিকে দুর্বলের ক্লৈব্য। আবার ইহার মধ্যে সংস্কারক নাম ধারণ করিয়া একদলের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামীজীর মতে ইঁহাদের সংস্কার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"প্রায় শতাব্দিকাল ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজ সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই।"

কেন হয় নাই? ইহার অনেকগুলি কারণই আছে। প্রথম কারণ উচ্চ ও নীচের ভিতর সমস্ত উপলব্ধির অভাব। স্বামীজী বলিয়াছেন, "দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে বর্ণিত ব্যক্তিগণ 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও হইতেছেন সেই শোষিত শ্রেণীর জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।"

স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন, এই সংস্কারকগণের কার্যের মধ্যে "আমিও

ইহাদেরই একজন" এইরূপ মমত্ববোধ নাই, আছে উদ্ধারকর্তার অহমিকা। পাশ্চাত্ত্য লোকহিতবাদের অনুকরণে কতকগুলি স্কুল কলেজ কি হাসপাতাল করিলেই সংস্কার কার্য সার্থক হয় না। পদমর্যাদা বিভেদ রচনা করিতেছে মর্যাদাহীনদের সঙ্গে, ধনের অধিকার বিভেদ রচনা করিতেছে নির্ধনের সঙ্গে এবং বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের অহমিকা বিভেদ রচনা করিতেছে অজ্ঞানী ও মূর্খের সঙ্গে। সর্বত্রই এই বিভেদ বোধ, কোথাও বা স্থূলভাবে আবার কোথায়ও বা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন, "গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাস তোমাদেরই উপর।"

একমাত্র উপায় বেদান্ত। বেদান্তই সমস্ত আপাতদৃশ্যমান ভেদের মধ্যে অভেদত্ব স্থাপনের মন্ত্রস্বরূপ। দুর্বলকে বলীয়ান করিবার বেদান্তই তেজস্কর ঔষধস্বরূপ। স্বামীজী তাই বেদান্ত প্রচারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর লাহোরে এমন একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় যাঁহাকে তিনি বেদান্ত প্রচারের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি লাহোর কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামী। এই তীর্থরাম গোস্বামী স্বামীজীর প্রেরণায় বেদান্ত প্রচারকার্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী রামতীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৬ই নভেম্বর স্বামীজী দেরাদুন চলিয়া যান এবং দেরাদুন হইতে সাহারানপুর এবং তাহার পর দিল্লী আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ি অবস্থান করেন।

দিল্লী হইতে আলোয়ার। এই আলোয়ারে আমেরিকা যাইবার পূর্বে পরিব্রাজকরূপে স্বামীজী একবার আসিয়াছিলেন, এখানে তাঁহার পূর্বপরিচিত অনেক বন্ধু এবং ভক্ত ও শিষ্যের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে এক দরিদ্রা ভক্তিমতী মহিলার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রস্তুত 'চাপাটি' ভক্ষণ করিয়া স্বামীজী পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

আলোয়ার হইতে স্বামীজী জয়পুর গেলেন। এখানে তাঁহার অনেক পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজী খেতরির রাজার বাংলোয় রাজ-অতিথিরূপে ছিলেন। রাজা তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামীজী সেই সময় তাঁহার সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন, "এখানে একদিন আমি ফকিরের বেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। রাজার রাঁধুনি তখন নিতান্ত অশ্রদ্ধায় আমাকে দিনান্তে একবার খাদ্য দিত, আর এখন? এখন সেবার জন্য কতই আয়োজন, পালকের গদিতে শোবার বিছানা। জোড়হাতে সর্বক্ষণ কত লোক দাঁড়িয়ে আছে, কখন আমার কি দরকার হবে সেই আদেশের অপেক্ষায়। এ কথাটি অতি সত্য যে—'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণং।"

জয়পুর হইতে খেতরি ৯০ মাইল। স্বামীজীকে আনিবার জন্য রাজা

বাহাদুর নানাপ্রকার যানবাহন পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং বারো মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

১৭ই ডিসেম্বর স্কুল বাড়িতে এক সভা আহ্বান করা হইল। সেই সভায় নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। রাজা বাহাদুর সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকেও অভিনন্দন দিবার আয়োজন করা হইল। রাজাকে অভিনন্দন দিবার দিন নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে অভিনন্দন পাঠানো হইয়াছিল।

স্বামীজী খেতরির যে বাংলোতে ছিলেন সেখানে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় রাজা বাহাদুর সভাপতি ছিলেন এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ইউরোপীয়ও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। স্বামীজী "বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া 'হিন্দুধর্ম' এখন যে কেবল আচার অনুষ্ঠানেই পরিণত হইয়াছে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি এতই অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া তাহার পর আবার বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

খেতরিতে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি জয়পুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় আজমীর, যোধপুর, কিষেণগড় ও ইন্দোর এবং খাণ্ডোয়াতেও তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল; খাণ্ডোয়ায় স্বামীজীর শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় গুজরাট, বরোদা এবং বোম্বাই হইতে বার বার আহ্বান আসিলেও তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

স্বামীজী ইতিপূর্বে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিয়া যেভাবে সর্বত্র বক্তৃতার মধ্য দিয়া দেশবাসীকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন উত্তর ভারতেও সেইভাবেই প্রচার করেন। এই প্রচারের প্রথম বিষয় ছিল, "বিবাহের মাধ্যমে যতটা সম্ভব জাতি-বিভেদ তুলিয়া দেওয়া, কেননা, এই অসংখ্য জাতি-বিভেদেই দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়ত বিবাহ সম্বন্ধে সংযত হওয়া। এই দরিদ্রের দেশে যতটা কম বিবাহ হয় তাই মঙ্গল। ইহা ছাড়া, শিক্ষার দ্বারা ধনীর ব্যবধান দূর করা, শিক্ষার দ্বারা সর্বসাধারণের ভিতর জ্ঞান ও ধর্মের আলোকপাত, অন্ধ কুসংস্কার এবং গোঁড়ামি যে কতদূর অনিষ্টকর সে সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা। সর্ববিষয়ে দুর্বলতা পরিহার, মতবিরোধের মধ্যেও ঐক্য ও সংহতি স্থাপন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি সর্বত্রই বলিয়াছেন।

এই সকল বক্তব্যের মধ্যে তাঁহার যেটি বিশেষ বক্তব্য ছিল সেটি ভারতবর্ষের যুবকগণকে তাহাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে সচেতন করা, তাহাদের জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করা। 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় তিনি অতি জ্বলন্তভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন,—"আগামী পঞ্চাশ বৎসর ইহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় হবে, আমাদের মহিমময়ী জননী ভারতবর্ষ। * * * আমাদের জাগ্রত দেবতা, আমাদের স্বজাতি! সর্বত্র তাঁর হস্ত, সর্বত্র তাঁর চরণ, সর্বত্র তাঁর কর্ণ। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন। * * * সকল পূজার প্রথম হ'ল বিরাটের পূজা।

আমার—* * চারিদিকে যাঁরা আছেন তাঁদেরই পূজা। * * 'পূজো' এই সংস্কৃত কথাটিই উপযুক্ত কথা, অন্য ইংরাজী কথায় ঠিক ভাব প্রকাশ হবে না। * * আমার দেশবাসিগণই আমার উপাস্য দেবতা, তাঁদেরই পূজো কর্তে হবে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাতুর বা সংগ্রামপরায়ণ হওয়ার পরিবর্তে।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস আসিল, স্বামীজী জানুয়ারীর মাঝামাঝি কলিকাতা ফিরিলেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ ও সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে মাদ্রাজ পেঁছান। তখন রেলপথ ছিল না সেজন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে জাহাজে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমে তিনি আইস হাউস রোডে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। বাড়ির নাম ছিল 'ফ্লোরা কটেজ'। আলমবাজারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পূজা লইয়া ছিলেন, এখানে আসিয়াও তিনি প্রথমেই একটি ঘরে একটি বেদীর উপর ঠাকুরের একখানি ছবি রাখিয়া সেই ঘরটিকে ঠাকুরঘর করিলেন। এইভাবে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা হইল।

ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ হইতে আসেন তখন মাদ্রাজে যে বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন সেই বাড়িতেই জুন মাসে এই মঠ উঠিয়া গেল। এই বাড়িটি একটি আমেরিকান কোম্পানী বরফের গুদাম করিবার জন্য করিয়াছিলেন, সেজন্য নীচের তলার ঘরগুলি খুব বড় বড় ছিল এবং দেওয়ালও খুব পুরু ছিল। বাড়িটি সমুদ্রের ধারে এবং দেওয়াল পুরু, এইজন্য মাদ্রাজের দারুণ গরমেও এই ঘরগুলি ঠাণ্ডা থাকিত। স্বামীজী এই নীচের তলার ঘরেই ছিলেন এবং মঠও সেইখানেই স্থানান্তরিত হইল।

বাড়িটি ছিল খুব বড় এবং তিনতলা, এস বিলাগিরি আয়েঙ্গার নামে একজন অ্যাটর্নি এই বাড়ির মালিক ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি নীচের তলাটি মঠের জন্য বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দেন এবং তিনি তাঁহার উইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে প্রতি মাসে বারো টাকা করিয়া দিবার জন্যও লিখিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের মিশনের কার্য দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছিল। এই সময় স্বামী শিবানন্দ স্বামীজীর ইচ্ছাক্রমে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সিংহল রওনা হন। স্বামীজী তাঁহার যাত্রার পূর্বে ৯ই জুলাই তারিখে তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"একেবারে শিক্ষকের আসন নিতে যেও না, বিনয়ের সঙ্গে সব কাজ করবে, নইলে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। মাদ্রাজে শশীর কাজে কোনরকম আপত্তি, তিরস্কার বা বাধা দেবে না। কারণ, যে কেউ যেখানে যাক, সে যেই হোক্ না কেন, তাকে সেখানে যে আছে তার কথামতই চলতে হবে। যদি শশী সিলোনে যায় তা'হলে সেখানে সে তোমার কথামতই চল্‌বে।" * * *

সিংহলের কার্যবিবরণী মিসেস পিকেট (শ্রীমতী হরিপ্রিয়া) ১৮৯৭

খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় যাহা পাঠাইয়াছিলেন তাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপঃ—"শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী শিবানন্দ, যিনি মানবজাতির প্রতি মাত্র ভালবাসার বশবর্তী হয়ে কয়েক সপ্তাহ সিলোনে এসেছেন, তাঁর কার্যবিবরণী সম্বন্ধে আপনাদের অতি মূল্যবান ও সর্বজনসমাদৃত পাক্ষিক পত্রে কয়েকটি কথা জানাবার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি।

"ভারতবর্ষীয় বন্ধুগণের মাধ্যমে তিনি এখানকার কয়েকজন ইউরোপীয়ান ছাত্রের সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতার সঙ্গেও পরিচয় লাভ করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐ সকল নেতা ইংরাজী ভাষায় উচ্চ-শিক্ষিত। * * *

"যদিও স্বামীজী সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যার সময় ক্লাস করছেন কিন্তু এই সকল ক্লাসে আশানুরূপ লোক হচ্ছে না। তবে কয়েকটি ইউরোপীয়ান ছাত্রের মধ্যে তাঁর কাজ করার অধিকতর সুবিধা হয়েছে। * * * তাঁর এই ক্লেশকর কার্য পরিচালনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি কয়েকজন ছাত্রের বাড়ি গিয়ে তাদের বেদান্ত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। * * *

"স্বামীজী মনে করেন যে, তাঁর এদেশে এখন আসা ভবিষ্যতে আরও উত্তম ও অধিক ফলপ্রদ কাজের প্রথম সোপান মাত্র। যদিও তাঁর ভবিষ্যৎ কাজের সফলতা সম্বন্ধে এখন সঠিক কিছু বলা যায় না কিন্তু তিনি যে কর্মপ্রণালী অবলম্বন করেছেন তা'তে করে মনে হয়, কাজ ভালই হবে। * * *

"ইত্যবসরে আমরা আমাদের সকল শুভেচ্ছুগণের কাছে যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করছি—তাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজীর কাজের প্রতি এমনভাবে সহানুভূতি করুন যা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর হিন্দু ভ্রাতাগণ তাঁর সহায় আছেন। তিনি যে সৎকাজ অক্লান্তভাবে করছেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁরাও সেই সৎকাজের ফলভাগী হবেন।"

এই আবেদন করিয়াছেন একজন ইউরোপীয়ান ছাত্রী, স্বামী শিবানন্দের তিনি শিষ্যা এবং স্বামী শিবানন্দই তাঁহাকে 'হরিপ্রিয়া' নাম দিয়াছিলেন। আবেদনটি পড়িয়া মনে হয়, সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকার্য সে সময় তেমন সফল হয় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমেই স্বামী শিবানন্দ সিংহল কেন্দ্রের কার্য বন্ধ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কেন তাঁহাকে এত অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরে যা জানা যায়, তাহার তাৎপর্য এই যে, তামিল ভাষা তিনি জানিতেন না সেইজন্য জনসাধারণের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তখনকার দিনে সিংহলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইংরেজী জানিত।

এই সময় বিদেশের প্রচারকার্যের ভার ছিল আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দের উপর এবং ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দের উপর, কিন্তু আমেরিকার কার্য এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে একা সারদানন্দজীর পক্ষে তাহা সম্পাদন করা সম্ভব

হইতেছিল না। সেজন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় যান, লণ্ডনের কার্যভার তখন মিস্টার স্টার্ডি ও তাঁহার সহকারিণী মিস মার্গারেট নোবলের উপর রহিল।

বাংলা দেশে এই সময় দিনাজপুরেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। বহরমপুরের দুর্ভিক্ষ তখনও চলিতেছিল, এই দুই জায়গাতেই সাহায্য করার দরকার হইয়াছিল, সেজন্য রামকৃষ্ণ মিশন হইতে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়, এর নাম দেওয়া হইয়াছিল 'আলমবাজার দুর্ভিক্ষ সাহায্য পর্ষৎ'। এই সাহায্য ভাণ্ডারে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতেও স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তেরা সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতকে (সারদা মহারাজ) রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দিনাজপুর পাঠানো হয়। দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার এন বনহ্যাম কার্টারও এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে সাঁওতাল পরগণাতেও অন্নকষ্ট দেখা দেয়, সেখানেও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী বিরজানন্দকে পাঠানো হয়। দেওঘরের সার্বডিভিশনাল অফিসার মিঃ এইচ এইচ হার্ড রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকার্যের সহিত সহযোগিতা করেন।

এইভাবে নবস্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশন সাত মাসের মধ্যেই বাংলার দুটি জেলায় এবং সাঁওতাল পরগণার একটি জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবাকার্য সম্পাদন করে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ গভর্নমেণ্টেরও শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করে।

স্বামী সারদানন্দজীও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্য 'টিউটনিক' নামক জাহাজে ১২ই জানুয়ারী আমেরিকা ত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ড ও প্যারিস হইয়া নেপলস্ হইতে ব্রিন্দিসিতে 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

স্বামীজী উত্তর ভারত হইতে জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ফিরিয়াই জমির সন্ধান করিতেছিলেন, ঠাকুরের জন্মোৎসব আগতপ্রায়, জন্মোৎসবের আগেই একটি স্থায়ী আস্তানা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ভগিনী নিবেদিতাও এই বৎসর ২৮শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে আসেন।

জমির জন্য দু' তিন জায়গায় চেষ্টা করিয়া অবশেষে বেলুড় গ্রামে একটি জমি পাওয়া গেল এবং জমিটি স্বামীজীর পছন্দ হইল। এই জমির অধিকারী ছিলেন একজন বেহারী ভদ্রলোক, তাঁহার নাম বাবু ভগবৎনারায়ণ সিংহ। তাঁহাকে বায়না স্বরূপ ১০০১৲ টাকা দিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল।

তখন পর্যন্ত ঠাকুরের সন্তানগণ আলমবাজারেই ছিলেন, কিন্তু আলমবাজার হইতে গঙ্গা পার হইয়া এতদূর আসা সুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁহারা জমির কাছেই 'নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি বাগানবাড়িতে উঠিয়া গেলেন।

এই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীও একটি উইল করেন। স্বামীজী ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে যত টাকা সংগৃহীত ছিল সমস্তই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর লোকান্তর হয় তাহা হইলে টাকা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে গোলমাল হইতে পারে এবং সেই গোলমালের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে উইল করেন তাহার বাংলা প্রতিলিপি এইরূপঃ—

লিখিতং স্বামী ব্রহ্মানন্দ—দক্ষিণেশ্বর নিবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, সন্ন্যাসী, সাকিম আলমবাজার মঠ, আলমবাজার, জেলা চব্বিশ পরগণা কস্য চ'রমপত্রমিদং—আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আমার ত্যক্ত আমার স্বনামী বা বেনামী নগদ অর্থ, গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি এবং অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমার অভাবে উক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য উক্ত আলম-বাজার মঠ নিবাসী তুরীয়ানন্দ স্বামী ও সারদানন্দ স্বামী সন্ন্যাসীদ্বয় পাইবেন এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ও অধীনে থাকিবে এবং আমি তাঁহাদিগকে এই উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলাম এতদর্থে স্বেচ্ছায় এই শেষ উইল বা চরম সম্পাদন করিলাম।

ইতি ১৮৯৮ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারী
(স্বাক্ষর) স্বামী ব্রহ্মানন্দ

এই উইলের সাক্ষী ছিলেন প্রমথনাথ কর, সলিসিটার এবং ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ বেলুড় মঠের জমি কেনা হইল। ২২ বিঘা জমি এবং তাহার মূল্যের বায়না ১০০১৲ টাকা আগেই দেওয়া হইয়াছিল, বাকী ৩৮৯৯৯৲ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জমিটি ক্রয় করিয়া লইলেন। মিস্ হেনরিয়েটা মুলারই প্রায় সমস্ত টাকাটা দিয়াছিলেন। বিক্রয় কোবলাখানি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ বেলা ১২টা হইতে একটার মধ্যে হাওড়া সাব-রেজেস্ট্রী আফিসে রেজেস্ট্রী হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী

বেলুড়ের জমি কেনা হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা বসবাসের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইলে অনেক কিছুই করিতে হইবে। জমির নিচু দিকের জায়গাগুলি মাটি ফেলিয়া ভরাট করিতে হইবে। একখানা একতলা বাড়ি অবশ্য আছে, কিন্তু সেটি খুবই পুরনো এবং সেই বাড়িতে দুখানা বড় আর দুখানা ছোট ঘর, একটা বারান্দা, আর তা ছাড়া চাকরদের থাকিবার তিনখানা ঘর, সবসুদ্ধ মোট সাতখানা ঘর, আর গেটের কাছে একখানা ভাঙা ঘর। মেরামত না হইলে তাহাতে বাস করা চলিবে না, তাহা ছাড়া ঐ কয়খানা মাত্র ঘরে সংকুলানও হইবে না। সুতরাং আগে জমিটি ভরাট করার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, তারপর পুরাতন বাড়িটিকে যতটা সম্ভব বাসের উপযোগী করিতে হইবে এবং নূতন কযেকখানা ঘরও তুলিতে হইবে।

এদিকে ঠাকুরের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে জন্মোৎসব করা চলিবে না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কোনরকমে সেইখানেই ঠাকুরের জন্মোৎসব সমাধা হইয়াছে, এবার স্বামীজী বিশেষভাবে জনসাধারণ সকলকেই জন্মোৎসবে আহ্বান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেজন্য ঠিক করিয়াছেন, একদিন তিথিপুজা হইবে এবং আর একদিন সাধারণ উৎসব।

জন্মতিথি পূজা নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতেই সম্পন্ন হইল, আর সাধারণ উৎসবের জন্য বেলুড়ের কাছেই বালী নামক স্থানে ৺পূর্ণচন্দ্র দাঁর প্রতিষ্ঠিত রাসমন্দির ও তাহারই সংশ্লিষ্ট বৃহৎ অঙ্গন পাওয়া গেল। সেখানে উৎসব হইলে জায়গার অপ্রতুল হইবে না।

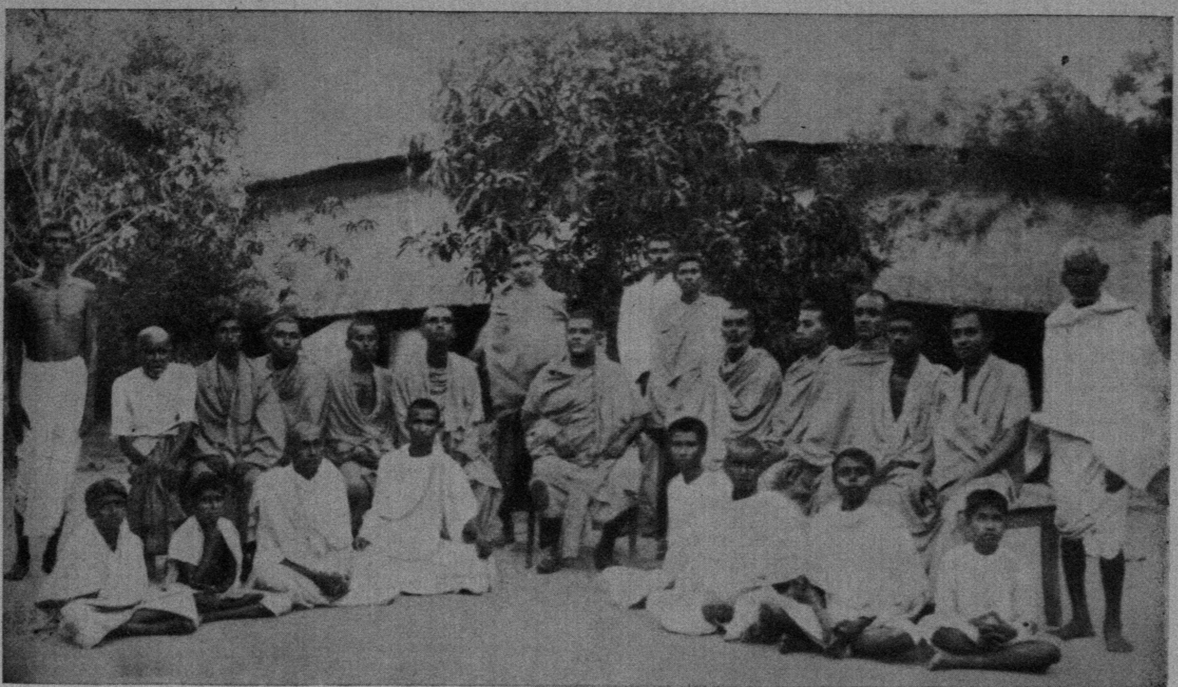
জন্মতিথি পূজার দিন নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে যাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন এমন অনেক ভক্তকে স্বামীজী যথাবিহিত ভাবে উপবীত দান করেন। ইহার পরে অবশ্য নানা সম্প্রদায় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীই একদিক দিয়া এই ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণের পথপ্রদর্শক। অবশ্য কায়স্থসমাজে ইহার পূর্বেই ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল।

স্বামীজী তাঁহার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে এই উপনয়ন প্রদান কার্যের ভার দিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন স্বামী-শিষ্য সংবাদ নামক পুস্তক হইতে তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে, বেদ তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা



স্বামীজীর সময়ে বেলুড় মঠের পোস্তা নির্মাণ
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি কার্য তদারক করিতেছেন।



জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্বামী সারদানন্দ

সব ব্রাত্য হয়ে গেছে। শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে।"

"শিষ্যকে স্বামীজী ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এইরূপ গায়ত্রী মন্ত্র দিবি। ক্রমে দেশের সকলকেই ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে। ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না,' 'ছোঁব না' বলে ইহাদিগকে আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শুনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদেরই মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।" (স্বামী শিষ্য সংবাদ)

ঠাকুরের এই জন্মতিথির পূজার দু' দিন পরে স্বামীজী অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে যে ঘরটি পূজার ঘর করা হইয়াছিল, সেই ঘরে গিয়া পূজার আসনে বসিলেন। পুষ্পপাত্রে যে ফুল-চন্দন ও বিল্বপত্র ছিল সবই তুলিয়া লইলেন এবং ঠাকুরের পাদুকার উপর অঞ্জলি দিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন, তারপর সেখানে যে তাম্রকৌটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূণ্যাস্থি ছিল সেই তাম্রকৌটাটি কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া অপর সকলকে তাঁহার সহিত আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া বেলুড়ের কেনা জমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার পাশে পাশেই চলিতেছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেইখানেই যাব আর থাকব। তা গাছতলাতেই কি আর কুটীরেই কি। সেই জন্যেই আমি তাঁকে নিজে কাঁধে করে নূতন মঠের জমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ওখানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

নূতন জমিতে পৌঁছিয়া একটি বড় আসনের উপর কৌটাটি নামাইয়া রাখিয়া স্বামীজী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। সকলের মনেই এক অপূর্ব ভাব তাঁহাদের এমন ভাবে বিভাবিত করিল যেন তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য এই দৃশ্যমান জগৎ হইতে কোন এক বহুদূর অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন।

আজ সেদিনের সেই দৃশ্যটি যেন দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় রূপে।

সেই গঙ্গাতীর সেই বেলুড়ের সে দিনের পুরাতন বাড়ি। গৈরিকপরিহিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঠাকুরের অস্থি দক্ষিণ স্কন্ধে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠে স্থাপন করিতেছেন।

অস্থির পেটিকা আসনে স্থাপনের পর পূজা আরম্ভ হইল, পূজার পর বিরজা হোম। বিরজা হোমের সময় সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাহারও উপস্থিত থাকার অধিকার নাই, সেজন্য শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী বহুদূরস্থ প্রবেশপথে পাহারা দিতে পাঠাইলেন।

হোম শেষে স্বামীজী চরু অর্থাৎ পায়েস রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন, তারপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আজ হইতে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়ক্ষেত্র করিয়া রাখেন।"

পুণ্যক্ষেত্র? হাঁ, সর্বধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্ররূপ মহাতীর্থ। স্বামীজী ফিরিবার সময় শিষ্য শরচ্চন্দ্রের উপর অস্থিসম্পুট ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ভার দিয়াছিলেন। তখনকার মত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইল, কেননা তখন মঠ বাসের উপযুক্ত হয় নাই। স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে বলিলেন, "ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও অধিকার নেই, কারণ আজ আমরা এখানে ঠাকুরকে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই এই কৌটা তুলে নিয়ে চল্।"

শরচ্চন্দ্র কৌটা মাথায় বহিয়া লইয়া গেলেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে পৌঁছিয়া কৌটাটি ঠাকুরঘরে রাখা হইল।

স্বামীজী তারপর শরচ্চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আজ আমার মাথা থেকে নামলো।"

আরও তিনি বলিয়াছিলেন—"এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিকের জমিতে ঘরবাড়ি করে থাকবে, তার মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলন্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘরদোর হবে। এরকম হলে কেমন হয় বল দেখি?"

শিষ্য বলিলেন,—"মহাশয়, এ আপনার অদ্ভুত কল্পনা।"

স্বামীজী বলিলেন, "কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি—এরপর আরো কত কি হবে। আমি কতক করে যাব। আর তোদের ভিতর নানা আইডিয়া দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব ওয়ার্ক আউট করবি। বড় বড় প্রিন্‌সিপল্ কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথা পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলি ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে প্র্যাকটিক্যাল রিলিজিয়ন।" (স্বামী শিষ্য সংবাদ)

ঠাকুরের জন্মোৎসব দাঁয়েদের রাসবাড়িতে সমারোহে সম্পন্ন হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ মার্চ মাস। ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারে এবং ১৮ই মার্চ শুক্রবার এমারেল্ড থিয়েটার হলে রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি সভা আহ্বান করা হয়। দুটি

সভাতেই স্বামীজী সভাপতিত্ব করেন। স্টার থিয়েটারের সভায় মিস নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) 'ইংলন্ডে ভারতীয় চিন্তা' এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং দ্বিতীয় সভায় স্বামী সারদানন্দ 'আমেরিকায় আমাদের প্রচারকার্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২৫শে মার্চ শুক্রবার মিস মার্গারেট নোবল তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া "ভগিনী নিবেদিতা" নাম গ্রহণ করেন। এই দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।

যাঁহারা নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা একথা নিশ্চয়ই বলিবেন, "নিবেদিতা" এই নাম তাঁহার জীবন যাপনে কি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। এমন সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই পাওয়া যায়। একাধারে বীর্যবতী মহা তেজস্বিনী, অপর দিকে মূর্তিমতী ত্যাগ। অকপটতা, সবলতা এবং মাধুর্য যেন একাধারে এই মহামনস্বিনী মহিলার জীবনে মূর্তরূপ ধারণ করিয়াছিল, আবার অন্যদিকে তিনি অতি কঠোরা জনশিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষের ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁহার কাছে যেভাবে অতি পবিত্র পূজার বস্তু ছিল, যদি অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয় নারী ও পুরুষেরও সেরূপ একান্ত নিষ্ঠা থাকিত, তাহা হইলে ভারতের সকল দুর্দিনের অবসান হইত।

এই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দেই হরিপ্রসন্ন মহারাজ সংসার ত্যাগ করেন। তিনি ঠাকুরের সন্তানগণের মধ্যেই একজন, কিন্তু এতদিন একেবারে গৃহত্যাগ করেন নাই। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়া তিনি বহু বৎসর চাকরি করেন, কিন্তু গৃহেও সন্ন্যাসীর মতই জীবন যাপন করিতেন। বেলুড় মঠে জমি কেনা হইবার পরে তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সঙ্ঘে আসিয়া যোগ দিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি সঙ্ঘে যোগ দেওয়ায় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে এপ্রিল মাস হইতে বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হইয়া গেল।

জমির উপর যে একতলা ছোট বাড়িটি ছিল, তাহার উত্তর দিকের দুখানি ঘরের মেঝে পিচ ঢালা ছিল। কাজেই মেঝেটি বেশ ভালই ছিল। তা ছাড়া ঘর দুখানি বাস করিবার উপযুক্ত ছিল। এখনও সে ঘর দুটি আছে। উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটি পরে 'ভিজিটার্স রুম' হয় এবং অন্য ঘরটিও সাধুদের থাকিবার ঘর হয়। যাহা হউক, ঐ ঘর দুটি মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড জমি কিনিবার পর কিছুদিন বাসগৃহরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে তাঁহারাই বেলুড় মঠের সর্বপ্রথম অধিবাসিনী।

নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে তখন অনেকেই একত্র হইয়াছেন। স্বামীজী তো আছেনই, স্বামী সারদানন্দও আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন, সিংহল হইতে স্বামী শিবানন্দও ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী অখণ্ডানন্দও রিলিফের কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়াছেন। হরি মহারাজ, বাবুরাম

মহারাজ, তুলসী মহারাজ, বুড়ো গোপালদাদা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহারা সকলেই আছেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজ গৃহত্যাগ করিয়া সংঘে যোগ দিয়াছেন, ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি তরুণ সাধুও আছেন। মনে হয়, নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সকল কাজ যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে স্বামীজী এখন সেদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দের হাতে দিয়াছেন ব্যবস্থার ভার, কেননা তিনি সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত, ওদেশের কাজকর্ম চলে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া। এখনও সে অভ্যাস তাঁহার পুরাপুরিই রহিয়াছে।

প্রত্যেককে বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হইল। ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ, নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া সবই নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। তুলসী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ নূতন ব্রহ্মচারিগণের অধ্যাপনার ভার লইলেন এবং বেদ বেদান্ত উপনিষদের নিয়মিত ক্লাস হইতে লাগিল।

এই সময় স্বামীজী মঠের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। নিয়মগুলি কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। মঠ (১) ও (২)। (৩) সাধন প্রণালী। (৪) মত। (৫) ভক্তি। (৬) ঠাকুরঘর। (৭) ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী। ইহা ছাড়া আলমবাজার মঠেও কতকগুলি নিয়ম রচিত হইয়াছিল। সেগুলিতে মঠের জীবনযাত্রার নিয়মাবলী ছিল।

মঠ (১) নম্বরের নিয়মগুলি এইরূপঃ—

১। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিযা নিজেব মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওযার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকাব আব একটি মঠ স্থাপিত হইবে।

২। যেভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে। বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগেব মঠে পুরুষের কোন সংশ্রব থাকিবে না এবং পুরুষদিগের মঠে স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংশ্রব থাকিবে না।

৩। হিমাচলে কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ প্রকার দুইটি মঠ স্থাপিত হইয়া ঐ প্রকার নিয়মে পরিচালিত হইবে।

৪। স্ত্রীমঠ,—যতদিন পর্যন্ত কার্যসম্পাদনে সমর্থা স্ত্রী না পাওযা যায়, ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে; তাহার পর উহারা আপনাদের কার্য আপনারাই করিয়া লইবে।

৫। বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।

৬। ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

৭। প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচার কার্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।

৮। এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাব মাত্রেরই প্রয়োজন। কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখ-স্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকার যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে।

৯। ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধর্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

১০। সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না। কারণ সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ শরীরের ব্যাধিবিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। অতএব, সামাজিক কুরীতির উদ্ঘোষণে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজশরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য।

১১। চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোন কার্যেই সক্ষম হয় না। এই চরিত্র-বলবিহীনতাই আমাদের কার্যপরিণত বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ।

১২। আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠের প্রত্যেক কার্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।

১৩। শিষ্যের গুরুর উপর একান্ত বিশ্বাস থাকা উচিত। সেই প্রকার গুরুও শিষ্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসবান না হইলে শিষ্যের উন্নতি হইতে পারে না। গুরু শিষ্যের উপর বিশ্বাস করিলে শিষ্যের শক্তি স্ফুরিত হয়। শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুরও শক্তি বিপুলতা লাভ করে।

১৪। এই মঠের সমস্ত কার্যই মঠস্থ সর্বাঙ্গের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত হইবে। সর্বসম্মতির অভাবে অধিক সংখ্যকের সম্মতিতে হইবে।

১৫। যে কেহ কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান—ইহাদের এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও অধ্যক্ষের এবং গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ তৎপর, তিনি এই মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।

১৬। মঠের অঙ্গগণ দুইভাগে বিভক্ত—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শব্দে যাহারা আকুমার ব্রহ্মচারী ও যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিবে, তাহাদিগকে বুঝাইবে।

১৭। খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য যাহারা পুনর্বার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে।

১৮। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যে সকল বালককে স্বেচ্ছায় শিক্ষার নিমিত্ত এই মঠে পাঠাইবেন, অথবা যে সকল বালক অনাথ, তাহারাও এই মঠে

গৃহীত ও শিক্ষিত হইবে, কিন্তু মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে না। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন।

১৯। আপাতত, কেবল সদ্বংশজাত হিন্দু বালকই গৃহীত হইবে।

২০। ধর্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না। এই জন্য অর্থ, বিদ্যা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্মের মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে।

২১। এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্ম-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ "টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট" করিতে হইবে; এইটি প্রথম কর্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।

২২। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল—"নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হওয়া"; এই ভেদ নাশ না হইলে কোনও কল্যাণের আশা নাই। এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে।

২৩। অতএব এই মঠে যাঁহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহারা সর্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোনমতেই বাবাজী-দিগের ঠাকুরবাড়িতে পরিণত না হয়।

২৪। ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই চারিজনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই দশজনের কৌতূহল চরিতার্থ হয়; কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।

মঠ (২)

১। প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।

২। সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা ঐক্যবন্ধনের প্রধান কারণ।

৩। আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই; আমরা তাঁহার দাস, আমরাও মান ভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪। এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি। এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে।

৫। এই ভাবটি সদা মনে জাগরূক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে না।

৬। আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ, সেই ভয় একেবারেই ছাড়িতে হইবে।

৭। অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ।

অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে ত একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।

৮। তাঁহার সেবক বা সেবকের সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রে "আমি মন্দ দেখি কেন?" প্রথম ভাবা উচিত।

৯। পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের একতানতাই (Continuance of Policy) মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ আমাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ যে কার্যপ্রণালী পরিচালিত করিবেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহাই যেন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয়েন।

১০। সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙ্ঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহ-পরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১১। যদি কাহারও পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সঙ্ঘের নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ যাহা বিধান করেন, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে।

১২। যে কেহ অপরাধ করিয়া তাহা অস্বীকারপূর্বক সঙ্ঘের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হন, তিনিও ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১৩। কারণ, এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা-বিরাজিত।

১৪। একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।

মত—

১। ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শাস্ত্র করিলে তাঁহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এইমাত্র ফল হইবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইব ও বহু বিবদমান ভাগে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব।

২। অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে ও গীতা যে প্রকার পুরাকালের ছিল সেই প্রকার ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর বেদমতের ব্যাখ্যা।

৩। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারেরাই এক এই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বেদরাশিই এক কথা বলিতেছেন। সেইজন্য আপাতবিসম্বাদী উক্তি সকলের মধ্যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধ উক্তিগুলিকে বলপূর্বক আপন মতানুযায়ী অর্থকরণ দোষে দূষিত হইয়াছেন।

৪। পুরাকালে যে প্রকার একমাত্র গীতাবক্তা ভগবানই এই সকল আপাত-

বিবদমান উক্তি সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন, কালে অতীব বিশালতাপ্রাপ্ত সেই বিবাদ নিঃশেষে ভঞ্জন করিবার জন্যই তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

৫। এইজন্য তাঁহার উক্তিসকলের মধ্য দিয়া না পড়িলে ও তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া না দেখিলে বেদ বেদান্ত বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। অর্থাৎ, এই যে সকল স্থূল দৃষ্টিতে বিসম্বাদী শাস্ত্রোক্তি অধিকারী বিশেষে উপদিষ্ট ও ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নির্দিষ্ট, ইহা শ্রীভগবানই প্রথমে নিজের জীবনে প্রকাশ ও উপদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইবে, তাহা এই কেন্দ্র হইতেই ক্রমশ দূরবিসর্পী প্রভাব-চক্রবাল দ্বারা অনুমিত হইতেছে।

৬। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র এতদিন অজ্ঞানান্ধকারে লুপ্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ উহাকে পুনঃপ্রকাশিত করিল।

৭। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নূতন শাস্ত্র অনাবশ্যক। প্রাচীন অনাদি শাস্ত্র হইতে নূতন আলোক আসিতেছে; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।

৮। ঠাকুরের উক্তিসকল উত্তমরূপে সংগৃহীত ও যে সকল সেবক ঠাকুরের নিকট সর্বদা থাকিতেন তাঁহাদের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে বেদের টীকারূপে পূজিত হইবে।

৯। ঠাকুরের ভাবের অনুকূল বেদার্থ করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা এই ভাব যেন সর্বদা মনে থাকে যে, তাঁহার সমস্ত উপদেশই জগতের হিতের জন্য। যদি কেহ কখনো কোন অহিতকর বাক্য শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, সে বাক্য অধিকারী বিশেষে প্রযুক্ত এবং অন্য লোকে পালন করিলে অকল্যাণকর হইলেও সেই অধিকারীর জন্য মঙ্গলপ্রদ।

১০। ঐ প্রকার ঠাকুরের সমস্ত উক্তির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষে উপদিষ্ট ও সার্বজনিক কল্যাণের জন্য উপদিষ্ট উক্তি বাছিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে সার্বজনিক-কল্যাণ-প্রযুক্ত উপদেশসমূহই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইবে ও জনসাধারণে প্রচারিত হইবে।

১১। অধিকারীবিশেষে উপদিষ্ট উপদেশ সকলও সংগৃহীত হইয়া গোপন-ভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে—যাহা দ্বারা মঠের প্রচারকগণ ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ উপদেশ প্রদানে শিক্ষিত হইবেন।

১২। প্রভুর নিজের মুখের একটি উপদেশ এই যে, যাহারা বহুরূপী একবার দর্শন করিয়াছে, তাহারা বহুরূপীর একটিমাত্র রং-ই জানে। কিন্তু যাহারা বৃক্ষের তলায় বাস করিয়াছে তাহারা বহুরূপীর সকল বর্ণই জ্ঞাত থাকে। এইজন্য যাঁহারা প্রভুর নিকটে সর্বদা বাস করিতেন ও যাঁহাদিগকে

তিনি স্বীয় কার্যসাধনের জন্য পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মতি-ব্যতিরিক্ত কোন উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে না।

১৩। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের পরাকাষ্ঠা সমষ্টিস্বরূপ এরূপ অপূর্ব পুরুষ আর মানব জাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গ-সুন্দর যাঁহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী।

১৪। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য ও তাহার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য।

সাধন প্রণালী—

১। শ্রীভগবান ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন সাধন শিক্ষা দিতেন। এইজন্য সাধন প্রণালীর কোন সার্বজনীন নিয়ম হইতে পারে না।

২। তবে লোকসাধারণের জন্য কিঞ্চিৎ ভক্তি, ভজন ও কর্মপরিণতজ্ঞান (practical Advaitism—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর") শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৩। প্রভুর প্রদর্শিত সমুদয় সাধন প্রণালী পূর্বোক্ত প্রকারে সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য থাকিবে, কারণ ব্যক্তিবিশেষের উপদিষ্ট সাধন অপর ব্যক্তির অনিষ্টকারকও হইতে পারে।

৪। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন প্রয়োজন সেই সকল সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

৫। অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটিতেও ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ সুধায় প্রকৃষ্টরূপে স্রুত হয় নাই।

৬। আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য করেন।

৭। এই শিক্ষার জন্য প্রথমত এই মঠ চতুর্বিভাগে বিভক্ত হইবে। যথা—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ। এবং প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপদেশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

৮। প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপযোগী পুস্তকাদি পাঠ হইবে ও অনুভূতির নিমিত্ত সাধন-শিক্ষিত হইবে।

৯। কিন্তু সকল বিভাগেরই অঙ্গদিগকে কিছু না কিছু কর্মবিভাগের কার্য করিতে হইবে।

১০। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"। অতএব শরীর রক্ষার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে যদি শরীর পাত হয়, পরমকল্যাণ বুঝিতে হইবে।

১১। গীতাদি শাস্ত্র এবং শ্রীভগবান স্বয়ংও বৃথা কঠোর তপস্যার প্রতিপক্ষ

ছিলেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল তপস্যা শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইলেও বিশেষ কল্যাণকর, সকলেরই ঐ সকল তপস্যা অভ্যাস করা আবশ্যক; নতুবা বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করিবে।

১২। আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে, অথবা যোগও নহে; উদ্দেশ্য—ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ।

১৩। অতএব যে কোন উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, আমরা মহাসমাদরে তাহাই গ্রহণ করিব।

১৪। শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণশরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ এখনও তাঁহাকে সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য, অত্যল্পসংখ্যক অসহায় পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সংঘটিত হইত না।

১৫। অতএব এই সঙ্ঘের মধ্যে যদি কেহ শ্রীভগবানের উপদেশের অবিসম্বাদী কোন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সুফল যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে উহাও শ্রীভগবানের আদেশরূপে গৃহীত, আদৃত ও পালিত হইবে।

১৬। শ্রীভগবান কামিনীকাঞ্চনের ন্যায় আব কোন ভাবকে যদি বারম্বার ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন তাহা এই যে, ঈশ্বরের অনন্ত-ভাবকে ইতিউতি করিয়া সীমাবদ্ধ করা।

১৭। যে কেহ ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের অনন্ত-ভাবকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে সে নরাধম তাঁহার দ্বেষী।

১৮। সংকীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সংগে সংগে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণশরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

২০। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।

এই সকল নিয়মের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে স্বামীজীর মনের ভাব ও মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। অপর নিয়মগুলি সংক্ষেপে পরে দেওয়া হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ

ভক্তি এবং ঠাকুরঘর সম্বন্ধে নিয়মগুলির মধ্যে স্বামীজী বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যেন সেগুলি কেবল বাহিরের আড়ম্বর মাত্র না হয়।

ভক্তির ১নং নিয়মে বলা হইয়াছে, 'আচারপূত না হইলে কাহারও ভক্তিতে অধিকার নাই, ইহা বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে।'

২নং। সংকীর্তনের উৎসাহে লম্ফঝম্ফ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে পযুদস্ত করতঃ মূর্চ্ছাগ্রস্থ হওয়াই ভক্তি নহে, ইহাও যেন সকলের মনে থাকে।

৩নং নিয়মে বলা হইয়াছে, "ভক্তির প্রবলতায় যোগের উচ্চসীমায় উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু লম্ফঝম্ফ করিলে বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলে অথবা উক্ত ভাবকালে অলৌকিক দর্শন হইলেই যে জীব সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত, ইহা সিদ্ধান্ত নহে।

৪। ভক্তির প্রভাবে সমাধি উপস্থিত হইয়াছে বা স্নায়ুর তাড়নায় স্বপ্ন সন্দর্শন হইতেছে, ইহা স্থির করিতে হইবে।

এই সমস্ত কথায় প্রকৃত ভক্তিকে অসম্মান করা হয় নাই, কিন্তু এই ভাবের ভজনপথে যে দুর্বলতা আসে সেই সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। সেইজন্য ৭নং নিয়মে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, "অধ্যক্ষদিগের ইহাও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, ভক্ত্যাদি অঙ্গের একটি প্রবল হইয়া অপরগুলিকে নিরস্ত না করে।" (অর্থাৎ ভক্তি ভাবের জন্য কর্ম প্রভৃতি যেন পরিত্যক্ত না হয়)

৮নং নিয়মে বলিয়াছেন, "ভক্তিভাব বৃদ্ধির জন্য ভজনস্বরূপ ভগবানের গুণানুবাদ গীত হইবে এবং উহাতে তালমানাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" (অর্থাৎ ভগবানের গুণানুবাদের গান যেন সুর ও লয়ে গীত হয়)

ঠাকুরঘর সম্বন্ধেও স্বামীজী কোন বাধানিষেধ প্রবর্তন করেন নাই। ১নং নিয়মে বলিয়াছেন "এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গই ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজা করিতে পারিবেন।"

কিন্তু ২নং নিয়মে বলিয়াছেন, "ঠাকুর স্থাপন, পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরমহংসদেবের কোন উপদেশ নাই। ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা কল্পনা করিয়াছি।

৩নং নিয়মে পরমহংসদেবের প্রধান শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "যোগ, ধ্যান, ভজন, জপ ইত্যাদিই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। মঠে বর্তমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই একথা স্বীকার করেন না যে, পরমহংসদেব কাহাকেও মূর্তি স্থাপন, পূজা, ভোগরাগাদির উপদেশ করিয়াছেন।"

৭নং নিয়মেঃ—"মূর্তি পূজাদি অন্যান্য ভাবও যথাস্থানে পরিলক্ষিত

হইবে। কিন্তু প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীই সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে ও সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রযত্নের অধিকারী হইবে।

৮নং। অর্থাৎ প্রত্যেকেই এইটি বিশেষ মনে রাখিবেন যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রণালী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মূর্তিপূজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রধান কর্তব্যের সংগে মূর্তিপূজা প্রভৃতি আর সমস্ত থাকুক হানি নাই।

স্বামীজীর এই নিয়মাবলীতে আর একটি পর্যায়ে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে ৬৩ কোটিরও অধিক হিন্দুর বসতি ছিল, কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রীষ্টান রাজ্যের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে প্রায় ২ কোটি লোক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দুজাতি ও ধর্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নিয়মাবলীতে পর পর যে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দুইটি মহাশক্তি নিরন্তর কার্য করিতেছে। এই দুই মহাশক্তির সংঘর্ষেই জগতের বৈচিত্র্য ও লীলা সংঘটিত হইতেছে।

মানব সমাজেও এই দুই শক্তি জাতিরূপ বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত উৎপাদন করিতেছে ও করিবে।"

স্বামীজীর মতে "বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ এবং এই বৈচিত্র্যরূপ জাতি কখনও বিনষ্ট হইবার নহে।" কিন্তু তিনি বলিয়াছেন "এই বৈচিত্র্যের সংগে সংগে মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় অধিকার-তারতম্য—মানব সমাজে উপস্থিত হইতেছে।"

স্বমীজী বলিয়াছেন, "নিয়ত সংঘর্ষশীল এই দুইটি শক্তির মধ্যে একটি অধিকার-তারতম্যের অনুকূল ও দ্বিতীয়টি তাহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

স্বামীজীর মতে, "বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যে ব্যক্তিবিশেষে ক্রিয়াব বিশেষত্ব থাকিবেই, যথা—কেহ সমাজ শাসনে পারদর্শী, কেহ বা পথের ধূলি পরিষ্করণে ক্ষমবান। তাই বলিয়া সমাজ শাসনে পারদর্শী মানবেবই যে জগতের যাবতীয় সুখ ভোগে অধিকার থাকিবে এবং পথের ধূলি-পরিষ্কারক অনাহারে মরিবে, ইহাই সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ।"

পলিটিক্স সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, "সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা Politics বলে, তাহা কেবল এই ভোগতারতম্য-সমুখিত অধিকারপ্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম।"

আমাদের দেশে ও সকল দেশেই কোন না কোনভাবে 'জাতিভেদ' আছে।

আমাদের দেশে যেভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে জাতিভেদ প্রচলিত আছে, স্বামীজীর মতে তাহা অনিষ্টকর নয়। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে সম্প্রতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ যে দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক ; কিন্তু মৃত্যুর ছায়ারূপ ভোগতারতম্য জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম করিতেছে।"

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, "যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত, তাহার দুর্দশা ততই অধিক। এ সংগ্রামে যে জাতি যে পরিমাণে জয়লাভ করিতেছেন, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছেন।" স্বামীজী বলেন, "এই অধিকার তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে।"

স্বামীজী আরও বলিযাছেন, "অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিযাদি জাতি বিভাগ কোন দোষের নহে; কিন্তু ভোগাধিকার তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।"

এখনকার দিনে দেশ ও বিদেশের সকল জাতিই সকল জাতির সংস্পর্শে আসিতেছে এবং ইহাতে সকলের মধ্যে একটা সাম্য স্থাপনের উপায় নির্ধারণের প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানেই অসমর্থ, এমন অবস্থায় বাহিরের সমস্যা কি করিয়া সমাধান করিবে?

স্বামীজী বলিতেছেন, "বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততদিন তাহার পুনর্জীবনী শক্তি লাভের আশা নাই।"

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারতবর্ষ—এই দুইই অভেদাত্মা। মিশন কোন একক ব্যক্তির মুক্তি বা মঙ্গলের জন্য কার্যতৎপর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীই তাহার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু ভারত যদি নিজেই মৃত্যুর পথে চলে, তবে জগতকে অমরত্বের বাণী সে কি করিয়া শুনাইবে এবং মিশনেরই বা তখন অস্তিত্ব কোথায়?

কিন্তু স্বামীজী দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহার মনে নিরাশার ছায়ামাত্রও নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এই ভারত পুনর্বার জাগ্রত হইবে এবং যে মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে। ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাণপণে ইহারই সাধনে আমরা কটিবদ্ধ।"

তিনি একথাও বলিয়াছেন, "যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিবে সে-ই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য ও ওজস্বিতা লাভ করিবে।"

রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের বর্তমান অবস্থায় কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে?

স্বামীজী বলিয়াছেন, "অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতি বিভাগ নষ্ট করা নহে; কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।"

স্বামীজী তাঁহার দূরদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, আজিকার দিনে তিন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহার কথায়ঃ—"তিন বিপদ আমাদের সম্মুখে —(১) ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত আব সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালের বৌদ্ধধর্ম-বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করিবে। ইহা যদি হয় এই অতি প্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহু কালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় বিপদ এবং তৃতীয় বিপদ,—ভারতবর্ষ বাহ্যদেশীয় ধর্ম অবলম্বন করিবে, অথবা সমস্ত ধর্মভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

স্বামীজী বলিতেছেন, "দ্বিতীয় বিপদ যদি ঘটে, তাহা হইলে ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য জাতির বিনাশ অতি শীঘ্রই সাধিত হইবে। কাবণ যে কেহ হিন্দুধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমবা যে কেবল তাহাকে হাবাই তাহা নয়, একটি শত্রু অধিক হয়। ঐ প্রকার স্বগৃহ-উচ্ছেদকারী শত্রু দ্বারাই মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তৃতীয় কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত, তাহা বিনষ্ট হইলে সে জাতিও নষ্ট হইযা যায়। আর্য জাতির জীবন ধর্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইযা গেলে আর্য জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।"

এই অবশ্যম্ভাবী পতন নিবারণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?

ইহার উত্তরে স্বামীজী বলিযাছেন, "নদীবেগ আপনা হইতেই বাধাহীন পথ নির্বাচিত কবিয়া লয়। সমাজের কল্যাণস্রোতও সেই প্রকার বাধাহীন পথে আপনা হইতেই চলে। অতএব সমাজকেও ঐ প্রকার পথে লইয়া যাইতে হইবে।" (এই কথার তাৎপর্য এই যে, ভারতবর্ষের যেটি প্রকৃত বিশেষত্ব সেইটি যাহাতে বাধাহীন ও বলশালী হয় সেজন্যই চেষ্টা করা।)

এই ভারতবর্ষ স্বগৃহজাত ও বাহ্যদেশসমাগত বহু জাতিতে পরিপূর্ণ। আর্যধর্ম, আর্যভাব ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই। অতএব এই ভারতবর্ষকে প্রথমত আর্যভাবাপন্ন করিলে, আর্যাধিকার দিলে, আর্য জাতির ধর্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহা বিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব। এইজন্য প্রথমত যে সকল জাতি সংস্কারবিহীন হইয়া আর্যধর্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইয়াছে, পুনঃসংস্কার দ্বারা আর্য জাতির ধর্মে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। মনুষ্যের যেখানে অধিকার,

সেইখানেই তাহার প্রেম। নতুবা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধর্ম বলিয়া অন্যান্য জাতি তাহা পরিত্যাগ করিবে। (অর্থাৎ যাহাদের অনধিকারী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহারা ধর্মকে নিজধর্ম বলিয়া মমত্ববোধে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যই তাহারা সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে।) ঐ প্রকার আচণ্ডাল সর্ব জাতিকে ও ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও সংস্কারাদি দ্বারা হিন্দু সমাজকে বিস্তৃত করিতে হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অধুনা শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইয়াও যাহারা নিজ অজ্ঞতায় সংস্কারবিহীন তাহাদিগকে সংস্কৃত করা কর্তব্য।" (১৮নং)

স্বামীজী বলিয়াছেন, এইভাবে প্রচারকমণ্ডলী সর্বত্র শাস্ত্রের ও ধর্মের প্রচার করিয়া জনসমাজের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা জাগ্রত করিবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ইহা একটি প্রধান কার্য।

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, "মুসলমান বা খ্রীষ্টানদিগকেও হিন্দুধর্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। কিন্তু উপনয়নাদি সংস্কার কিছুদিনের জন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক নাই।" (২০নং)

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ভারতবর্ষের হিত ও অহিত দুই-ই করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "যদিও ভোগাধিকারতারতম্য ভারতবর্ষকে গতপ্রাণপ্রায় অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য আলোকের প্রভায় এই ভারতভূমি অধুনা কিঞ্চিৎ প্রতিভাত হইতেছে। ধীরে ধীরে এই সুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য মহাজাতি-সমূহের অধিকার-তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট উদ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বার্তা অস্মদ্দেশীয় পরাহত প্রাণেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিতেছে। মানব-সাধারণের অধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত, সুকৃত প্রণালীর-মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ দেশের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতিসকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্বার চাহিতেছে। এ সময়ে যদি বিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদি জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকে, তবে সে বিদ্যার ও সে ধর্মের নাশ হইয়া যাইবে।" (১৩নং)

সুতরাং এই যুগসন্ধিসময়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে সেই বিদ্যা ও ধর্মের বন্দিত্ব মোচন করিবার ভার লইতে হইবে, সর্বসাধারণের মধ্যে ভারতীয় মহাবিদ্যা ও মহান ধর্মভাবকে প্রচারের দ্বারা বিস্তৃত করিবার ভার লইতে হইবে। এই অতি প্রাচীন মহিমাময় মহাদেশের মহিমা আবার পুনরুজ্জীবিত করিবার ভার লইতে হইবে। আর্যভূমিতে আর্য জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর ভগবানপ্রদত্ত দায়স্বরূপে ন্যস্ত হইয়াছে।

স্বামীজী বলিয়াছেন, "এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনর্বার হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে,—যখন রোগ-শোক মনুষ্যশরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ইন্দ্রিয়সকল আর মনের প্রতিকূলে ধাবমান হইতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায়

লোকস্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে—যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্বকার্যের প্রেরয়িতা হইবে, তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রহ্মণ্য-বিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে। সেই পথে যে জাতিবিভাগ ক্রমশ অগ্রসর করে, তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যে জাতিবিভাগ জাতিভেদনাশের প্রকৃষ্ট উপায় তাহাই সুপরিগৃহীত হইবে।"

যে সকল কারণে জাতি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তাহার একটি কারণ সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন "স্বগোত্রে বা যে সকল গোত্রের সহিত অতি নিকট রুধির সম্বন্ধ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন হওয়াই জাতির শরীরকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্বল-শরীরধারী জাতি কখনও মহান হইতে পারে না, ইহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অতএব হিন্দুদিগের শরীর যাহাতে সমধিক বলবিশিষ্ট হয় তাহার উপায় বিধান করা এক প্রধান কর্তব্য।" (২২নং)

জাতীয় দুর্বলতার আরও কতকগুলি কারণ সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, "জাতিভেদে বিবাহ স্থগিত করা ও এক এক জাতির মধ্যে বহু শাখাভেদ হইয়া তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ হওয়া ও তাহার উপর কৌলীন্য প্রথা দ্বারায় বিবাহের পরিধি আরও সংকীর্ণ হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়া জীবনীশক্তি ও বলের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ আছে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে আদান-প্রদান হয় তাহার উদ্যোগ করা উচিত।" (২৪নং)

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।" যে সম্প্রদায়ে শক্তিরাশি সমাহিত, তাহাবা সমাজকে যে দিকে চালাইবে সমাজ সেই দিকেই চলিবে। পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা ও বিদ্যাধারতাই এই শক্তি সঞ্চয়ের উপায়। যত অধিক উহা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইবে, তত অধিক পরিমাণে আমরা সমাজের উপর কার্য করিতে পারিব।" (২৫নং)

"উহা সাধিত করিতে গেলে একটি মহাবলশালী সমাজের সৃষ্টি করিতে হয়, যাহার প্রাণশক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় ক্রমশ প্রবিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।" (২৬নং)

"লোকভয়ে, অন্নাভাবের ভয়ে, মানহানির ভয়ে, মনুষ্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইলেও নূতন উদ্যমে উদ্যুক্ত হয় না। তাহার উপর যে সমাজ যত অধিক দিন পথবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে নূতন কোন পন্থাবলম্বন করা ততই কঠিন হয়। অতএব এই মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়। যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।" (২৭নং)

তবে কোথায় এই উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হইবে? স্বামীজী এ সম্বন্ধে

এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন,—"মধ্যভারতে হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমন আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে লোক তেমনিই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে যে প্রকারে গঠিত করিবে সে প্রকারেই গঠিত হইবে।" (২৮নং)

এই শিল্প বিদ্যালয় ও কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। লোকের অন্নাভাব দূর করা সর্বপ্রথম কর্তব্য এবং তারপর তাহাদের গড়িয়া লইতে হইবে নূতনভাবে। যেখানে এখনও মানুষের ভিতর আদিম সরলতা রহিয়াছে এবং যেখানে জমি উর্বর ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর সেইরূপ স্থানই স্বামীজী উপনিবেশের যোগ্য স্থান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। হয়তো এই সংকল্প তাঁহার মনে উদয় হইবার সংগে সংগেই কাজও আরম্ভ করিয়া দিতেন, কিন্তু তখন সবে বেলুড় মঠের জমি কেনা হইয়াছে, হাতে একেবারেই অর্থ নাই এবং স্বাস্থ্যও ভাঙিগয়া পড়িয়াছে, তাই আর তাঁর সে সংকল্প কার্যে পরিণত করা হইল না।

বেলুড়ের জমি কেনা হইলে স্বামীজী একটু বিশ্রামের জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ দার্জিলিং যাত্রা করেন, এ সময় তাঁহার শরীর খুবই খারাপ হইয়াছিল। দার্জিলিং গিয়া তিনি গভর্নমেণ্ট প্লিডার এস এন ব্যানার্জির বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ কবিলেন, এই ভদ্রলোক স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে থাকিবেন ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু মে মাসেই কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। সেদিন যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন তাঁহারা হয়তো এখনও সে দিনের কথা ভুলিতে পারেন নাই। প্রত্যেক বাড়িতেই প্রতিদিন বড় বড় ইঁদুর মরিতেছে, বাড়ির অধিবাসীরা প্রাণভয়ে যেখানে সুবিধা পাইতেছেন সেখানেই পলাইয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে জনপরিপূর্ণ কলিকাতা নগরী যেন শ্মশানে পরিণত হইল। পথে-ঘাটে আর লোক চলাচল নাই, বড়লোকেরা কেহ বা কলিকাতার বাহিরে বাগানবাড়িতে কেহ বা অন্য কোন দেশে পলাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাহারা দরিদ্র তাহারা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া কোথায যাইবে? প্লেগ দরিদ্র পল্লীতেই বাসা বাঁধিল, বিশেষ করিয়া অপরিচ্ছন্ন বস্তিগুলি প্লেগরোগীতে পরিপূর্ণ হইল।

স্বামীজী এই সংবাদ পাইবামাত্র দার্জিলিং ছাড়িয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন এবং নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও পেঁছানো মাত্রই কিভাবে প্লেগ রিলিফ কার্যে নামান হইবে তাহার একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু টাকা কোথায়? রিলিফ কাজে অনেক টাকার দরকার, কোথা হইতে সে টাকা আসিবে?

টাকার প্রশ্ন উঠিতেই স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "কেন? যদি দরকার হয়

আমাদের এই নতুন কেনা মঠের জমিটাই বিক্রি করে দেব।”

কিন্তু জমি বিক্রি করিতে হয় নাই। প্লেগ সেবাকার্যে অর্থেরও অভাব হয় নাই, কর্মীরও অভাব হয় নাই।

ঠাকুরের অস্থি সমাধি দিবার জন্য এক টুকরা গঙ্গার ধারের জমির জন্য বারো বৎসর ধরিয়া স্বামীজী যেন সাধনা করিয়াছিলেন, গুরুভাইদের মাথা গুঁজিবার একটুখানি জায়গার জন্য কতই না তাঁহার পরিশ্রম ও প্রয়াস; সেই জমিতে ঠাকুরের অস্থি স্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, “আজ ধর্মক্ষেত্র স্থাপন করলুম”। সেই জমি বিক্রি করিয়া দিতে তাঁহার মনে এতটুকু ইতস্তত ভাবও দেখা যায় নাই। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায় টাকার জন্য জমি বিক্রি করিতে হয় নাই।

গভর্নমেণ্ট এই সময় কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন, যাহাতে মহামারী চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে। স্বামীজী ঠিক করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কাছেই একটা খোলা মাঠে হিন্দু প্লেগ রোগীদের জন্য একটি আস্তানা করিবেন। তাহা ছাড়া সর্বত্র যাহাতে শহর পরিষ্কার করা হয় তাহার জন্য তাঁহার সন্ন্যাসী সেবক দল লইয়া তিনি নিজেও অবতীর্ণ হইলেন।

নিবেদিতা এই সময় এই বস্তিবাসী রোগীদের সেবা ও বস্তি পরিষ্কার কার্যে যেভাবে লাগিয়াছিলেন সে কথা এখনও হয়তো অনেকের মনে আছে। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন এ কাজে নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত। কলিকাতার লোকেরা এক আশ্চর্য দৃশ্য সেদিন দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, গেরুয়া কাপড়পরা সাধুর দল নর্দমা পরিষ্কার করিতেছেন, মেথর ও ধাঙ্গড়ের মত।

লোকে ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে শীঘ্রই প্লেগ কমিয়া গেল এবং গভর্নমেণ্টও তাঁহার সতর্কতামূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন। স্বামীজী তখন সদলে কলিকাতা ছাড়িয়া ১১ই মে তারিখে আলমোড়ার দিকে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে গেলেন হরি মহারাজ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, গুপ্ত মহারাজ, সিস্টার নিবেদিতা, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, আমেরিকার কনসাল জেনারেলের স্ত্রী মিসেস প্যাটার্সন প্রভৃতি।

এই মে মাসে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক সি আর রাজন্ আয়ারের মৃত্যু হয়। এই উৎসাহী যুবক মাত্র ২৬ বৎসর বয়সেই দেহত্যাগ করেন। ইনি একজন গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং অতি দক্ষতার সঙ্গে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকা পরিচালন করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ‘ব্রহ্মবাদিন’ এবং দ্বিতীয় পত্রিকা ‘প্রবুদ্ধ ভারত’। স্বামীজীর কাছ হইতে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য পাইয়া তাঁহার তিন জন গৃহী শিষ্য প্রথমে ‘ব্রহ্মবাদিন’ নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইঁহারা তিনজনেই মাদ্রাজী এবং ইঁহাদের নাম জি ভেঙ্গটরঙ্গ রাও, এস সি নঞ্জুস্ক রাও এবং এম সি আলাসিঙ্গা পেরুমল। পত্রিকাখানিকে পাক্ষিক করাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রথমে পাক্ষিক পরে মাসিকরূপে ‘ব্রহ্মবাদিন’ প্রকাশিত হয়। তাহার পরের বৎসর

Awakened India বা 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত হয়। প্রবুদ্ধ ভারত মাত্র ১২ পৃষ্ঠার একখানি মাসিক পত্রিকা, রাজম্ আয়ার এই পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিন দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা সম্পাদন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া গেল।

মে মাসে রাজম্ আয়ারের মৃত্যু হইল এবং ২রা জুন তারিখে স্বামীজীর শর্টহ্যান্ড লেখক গুডউইন লোকান্তরে গমন করেন। গুডউইন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু চিরকুমার। স্বামীজীর একান্ত সেবক ছিলেন তিনি। তাঁহার মত সুদক্ষ শর্টহ্যান্ড লেখক না থাকিলে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতাই সর্বসাধারণের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

গুডউইন স্বামীজীর ছায়ার মত অনুবর্তী ছিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামীজী ও তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণের জন্য যখন গোপাললাল শীলের বাগানে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল স্বামীজী কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া আলমবাজারের মঠে আসিয়া রহিলেন তখন গুডউইনও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত গুডউইন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"গুডউইন ইংরাজ হিসাবে পরিবর্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আলমবাজারের মঠে আসিয়া দেখিল যে সকলেই একটা কম্বল পাতিয়া মেঝেতে পড়িয়া থাকে এবং হাত দিয়া ডাল ভাত খায়। গুডউইন অবিলম্বে নিজের পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় সাধুদের মত হাতে করিয়া ডাল ভাত খাইতে আরম্ভ করিল, এবং একখানা কম্বল পাতিয়া পশ্চিম দিকের দালানটিতে শুইয়া থাকিত, বিছানা প্রভৃতি কিছুই রাখিল না। অনেকেই নিষেধ করিল এরূপ কঠোর করিলে শরীরের হানি হইবে। * * গুডউইন কোন বাধা শুনিল না, বলিল "স্বামীজী যেরূপ কঠোর করিয়াছিলেন আমিও সেইরূপ করিব।"

"* * একদিন গুডউইন রামতনু বোসের গলিতে মা'র সহিত দেখা করিতে গেল। সঙ্গে গুপ্ত ছিল। গুডউইনের মুখে ও হাতে মশা কামড়াইয়াছে। তাহাতে দাগ হইয়াছে। মা অতি সস্নেহে গুডউইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমার গায়ে যে মশার কামড়ের দাগ। মশারি টাঙ্গাও না কেন?" গুপ্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিল, গুডউইন স্থিরভাবে বলিল,—"স্বামীজী খালি কম্বলে পড়িয়া থাকেন। তাঁহার মশারি নাই, তাঁহাকে মশায় কামড়ায়, সেইটিই আমার বিশেষ কষ্ট। * * * "আমার গায়ে কামড়ানোর জন্য বিশেষ চিন্তিত নই।" এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—"আহা, গুডউইনের কি গুরুভক্তি! নিজের দেহ পাত করে গুরুসেবা করে।"

"একদিন রবিবারে স্বামীজী, গুডউইন ও আর সকলে মিলিয়া আলমবাজারের লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। তখন ভাঁটা পড়িয়াছিল। কূল একটু সরিয়া গিয়াছিল। গুডউইন আগে স্নান করিয়া ঘাটের পৈঠার উপর এক কমণ্ডলু জল ও স্বামীজীর জুতা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্বামীজী স্নান করিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া ঘাটের সিঁড়িতে উঠিলেন। পায়ে কাদা লাগিয়া

গেল। অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কাহারও মনে, কি করা উচিত সে ভাবটি আসিল না। গুডউইন ত্বরিত হস্তে কমণ্ডলুর জল দিয়া স্বামীজীর পা ধুইয়া দিল এবং নিজের উত্তরীয় দিয়া পা মুছাইয়া জুতা পরাইয়া দিল। যেন কোন বিশেষ কাজ নয়, সাধারণ কাজ। * *"

"আমি রাখাল মহারাজের মুখে কাহিনীটি শুনিয়াছি।"

"স্বামীজী, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড হইতে একত্রে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। এডেন বন্দরে জাহাজ লাগিল, স্বামীজী নৌকা করিয়া এডেন বন্দর দেখিতে গেলেন। সঙ্গে সকলেই চলিল। এডেন-এ অধিকাংশই এই ভারতবর্ষের লোক। তাহারা সামান্য দোকান-পাট করে। অনেকদিন পরে কল্কেতে তামাক সাজিয়া খাওয়া স্বামীজী দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত তামাক-প্রিয়। এইজন্য কল্কেতে তামাক সাজিয়া খাওয়ার তাঁর প্রবল ইচ্ছা হইল। একজন দোকানদারের কাছ থেকে কল্কেটা চাহিয়া নিয়া স্বামীজী হাতে করিয়া কল্কেটাতে তামাক খাইতে লাগিলেন। * * গুডউইন এইভাবে স্বামীজীর সাধারণ লোকের সঙ্গে সমানভাবে মেশা যেন পছন্দ করিতে পারিলেন না। স্বামীজী তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং গুডউইনের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই গরীব দুঃখী ন্যাংটা লোকেরাই আমার জাতভাই। * * * তুমি যদি এদের ঘৃণা কর তা'হলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই। আমার গরীব জাতভাইকে যে ঘৃণা করে তাকে আমি পছন্দ করি না। তোমরা জাহাজে করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যাও, আমি একাই ভারতবর্ষে যাইব। * * * এই গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ যখন স্বামীজী পাইলেন তখন তিনি আলমোড়ায় ছিলেন। তিনি সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "পুত্রশোক কি ভয়ংকর! এখন বুঝিতে পারিতেছি পুত্রশোক কি?"

গুডউইন যখন মারা যান তখন তিনি "মাদ্রাজ মেল" পত্রিকার কাজে নীলগিরি উটকামণ্ড পাহাড়ে ছিলেন। আন্ত্রিক জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুডউইনের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র আলাসিঙ্গা তাঁহার মায়ের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। মার্কুইস অব বাথের জমিদারীতে Frome নামক স্থানে গুডউইনের বৃদ্ধা মাতা ও তাঁহার দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী বাস

* স্বামীজীর যে কোন মতের স্বধর্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান ভক্তের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কাশ্মীরের এক মুসলমান মহিলার উক্তি "খোদার কৃপায় আমি মুসলমানী।" কথাটিতে বিশেষভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা অভাব অনটন অথবা এইরূপ নানা কারণে স্বধর্মত্যাগ করিয়াছে বা করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারা আবার স্বধর্মাশ্রয়ে ফিরিয়া আসিয়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যেন অনুভব করে ইহাই তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল।

করিতেন। স্বামীজীও গুডউইনের জননীর নিকট একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—কবিতাটি এখানে দেওয়া হইল :—

"Requieseat in peace"—(J. J. Goodwin)
Speed forth, O soul, upon the star-strewn path,
Speed blissful one! Where thought is ever free,
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings on thee!
Thy service true, complete thy sacrifice
Thy home, the heart of love Transcendent find,
Remembrance sweet, that kills all space and time
Like alter-roses, fill thy place behind.
Thy bonds are broke, thy quest in this is found,
And one with That which comes as Death and Life,
Thou helpful one! unselfish e'er on earth,
Ahead, still help with love this world of strife.

—Vivekananda.

(শ্রীনবেন্দ্র দেবের অনুবাদ)

লভুক সে শান্তিলোকে অনন্ত বিরাম :—
যাও ত্বরা হে বিদেহী,
নক্ষত্রবিস্তৃত তব পথে,
যাওহে আনন্দময়!
—চিরমুক্ত যেথায় কল্পনা,
নাহি বাধা ত্রিকালের,
দৃষ্টি যেথা রোধে না ইন্দ্রিয়;
শাশ্বত অনন্ত শান্তি
মোক্ষবর লভ তুমি প্রিয়!
সার্থক তোমার সেবা,
পূর্ণ তব আত্মদান ব্রত,
পরা-প্রেম-হৃদি-পদ্মে
চিদানন্দে করো গিয়ে বাসা
শুদ্ধ স্মৃতি-সুমধুর
দেশ-কালজয়ী চিরন্তন,
প্রসাদী-ফুলের মত
ভরে থাক্ তোমার আসন।
ঘুচিল বন্ধন তব,
সন্ধান মিলিল এতদিনে,

যাহা মৃত্যু যাহা প্রাণ—
একাত্ম হয়েছে তারি সনে।
বসুধার বন্ধু ওগো, যাও,
চির নিঃস্বার্থ সুহৃদ
ক্ষুদ্র এ পৃথিবর বুকে তব
প্রেম শান্তি এনে দিক!

বিবেকানন্দ

উত্তর ভারতে স্বামীজী

গতবারে গুডউইনের ও পবহরীবাবার দেহান্তরের কথা লিখিয়াছি। এই দুই ঘটনাতেই স্বামীজী মনে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। গুডউইনের মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা আর পূর্ণ হইবার নয়। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমার ডান হাত ভাঙিয়া গেল, বোধ হয় মার ইচ্ছা নয় যে, আর আমি কাজ করি। এবার আমাকে নিজের হাতে লিখিতে হইবে। লেকচার করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।"

গুডউইনের কাগজপত্র যাহা ছিল আলাসিঙ্গা সমস্তই তাঁহার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাগজগুলি গুডউইনের স্বামীজীর বক্তৃতার শর্টহ্যান্ড লিখন। সেগুলির কতক গুডউইন দীর্ঘলিপিতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু বক্তৃতার উপকরণ তখনও দীর্ঘলিপিতে রূপান্তরিত করা হয় নাই। আলাসিঙ্গা না জানিয়া সেইগুলিই তাঁহার মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে সেগুলির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেননা গুডউইনের মৃত্যুর সংবাদ পাইবার পর তাঁহার মা ও বোনেরা কোন ঠিকানা না রাখিয়াই অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে যান তখন সন্ধান করিবার জন্য সেই গ্রামে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন উদ্দেশ পান নাই। এইভাবে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর সহিত লণ্ডনে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর লণ্ডনে বক্তৃতার সময় একটি স্ত্রীলোক নার্সের পোশাক পরিয়া আসিয়া নিবিষ্ট মনে ক্ষিপ্রলিপিতে সমস্ত লিখিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। তাঁহার নিকট সেই বক্তৃতাগুলি থাকা সম্ভব। কিন্তু তাঁহার নাম বা ঠিকানা কেহই জানে না। সময়টা হইতেছে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল।"

যাহা হউক, এখন আমরা স্বামীজীর অনুবর্তন করিব। প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকের মৃত্যুতে পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা স্বামীজীর মাদ্রাজী গৃহস্থ শিষ্যগণ স্বামীজীকে জানাইলেন। স্বামীজী সে সময় সেভিয়ার দম্পতির বাড়িতে আলমোড়ায় ছিলেন। মিস্টার সেভিয়ার তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ঐ কাগজখানির ভার লইতে পারেন। একথা শুনিয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। তখন আলমোড়া হইতেই প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশিত হইবে, ইহাই ঠিক হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে, স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ সম্পাদক ও মিস্টার সেভিয়ার ম্যানেজার হইবেন।

স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ ও স্বামী সদানন্দ ইঁহাদের উভয়ের সঙ্গেই

ভগিনী নিবেদিতার ভারতবর্ষে আসিবার পর প্রথম আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। স্বামী সদানন্দের কাছে স্বামীজীর জীবন কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভগিনী নিবেদিতা তন্ময় হইয়া যাইতেন। সেই কাহিনী তিনি তাঁহার গ্রন্থে অপূর্ব চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় বর্ণনা করিয়াছেন।

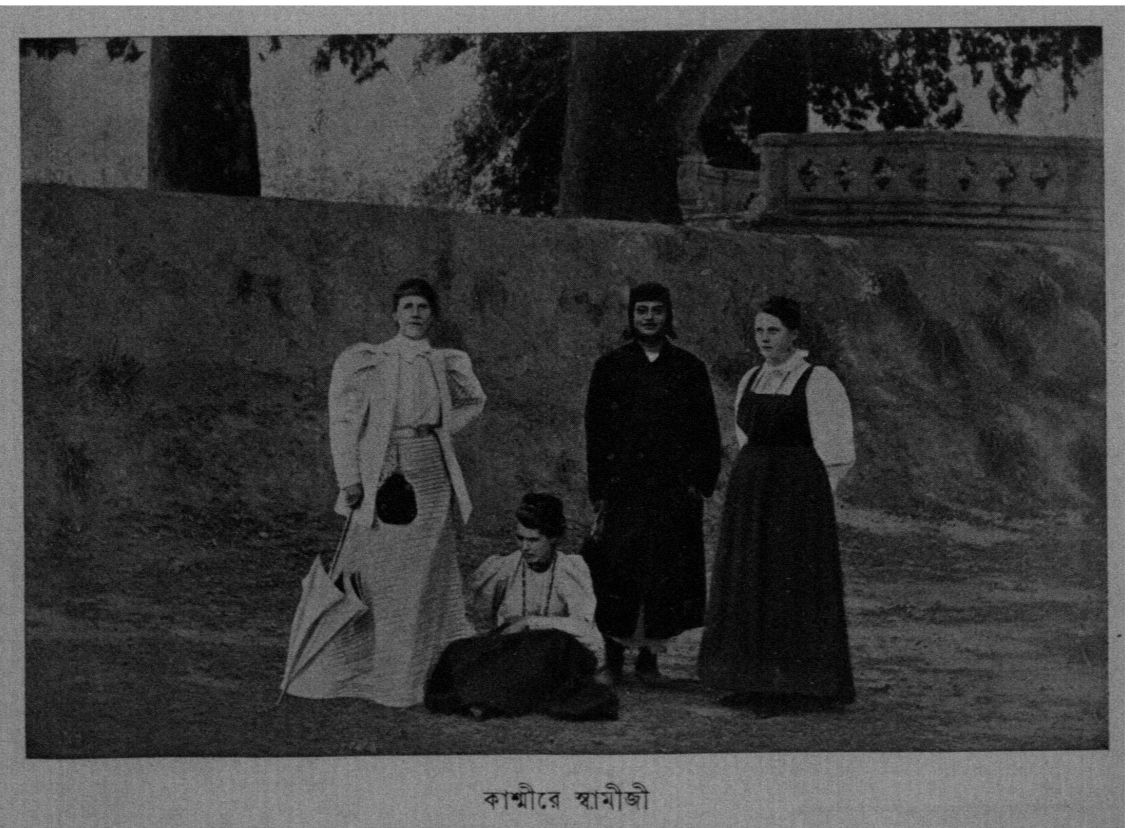
অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই স্বামীজী "জাগো, সকল অমৃতের অধিকারী"—এই গানটি গাহিয়া সকলকে ঘুম হইতে উঠাইতেছেন,—তাহার পর তাঁহার সমস্তক্ষণের কার্যকলাপ—সন্ধ্যার পূর্বে কখনও বা ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কখনও বা জোয়ান অব আর্কের কাহিনী বর্ণনা—আবার কখনও বা কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' হইতে আবৃত্তির সময় গুরু ভ্রাতৃগণ সকলের স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দুলিতে দুলিতে সমস্বরে বারবার "সাধারণতন্ত্রের জয় হউক" "সাধারণতন্ত্রের জয় হউক" কথাটি উচ্চারণ প্রভৃতি সদানন্দ যেন ছবির মত ভগিনী নিবেদিতার মনের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া যাইতেন। কখনও বা স্বামীজী সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির কথায় এমন তন্ময় হইযা যাইতেন যে, সেই মহাপুরুষের উক্তি "এস, এস ভাই মৃত্যু" এই কথাটির মধ্যেই যেন নিমগ্ন হইযা যাইতেন। নিবেদিতা এই সব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং যিনি বক্তা তিনিও মুগ্ধচিত্তে বলিয়া যাইতেন।

নিবেদিতা মঠে আসিবার পর স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে আসেন, তখন তিনি ব্রহ্মচারী, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা লাভ করেন। প্রথম অবস্থায় ইনিই ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও ধ্যানেব প্রণালী সম্বন্ধে স্বরূপানন্দই নিবেদিতার প্রাথমিক শিক্ষাদাতা, নিবেদিতা তাঁহার "দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম" গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব জীবনের ইতিহাস ও সন্ন্যাস গ্রহণের প্রেরণা সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন।

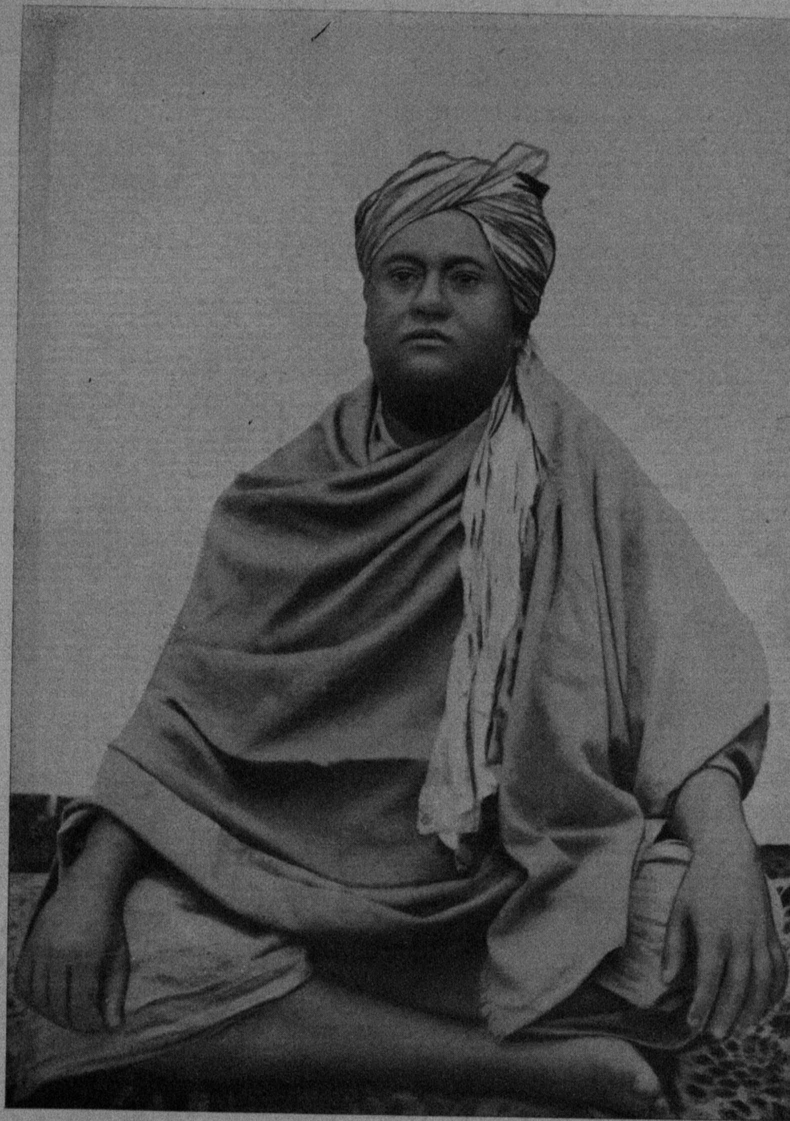
উত্তর ভারত ভ্রমণে ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং অমরনাথ তীর্থে যাইবার সময় স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে একমাত্র নিবেদিতাকেই সঙ্গে লইয়াছিলেন; ভগিনী নিবেদিতার "আচার্যদেবকে যেমন দেখিয়াছি" গ্রন্থখানিতে তাঁহার সেই ভ্রমণ-সময়ের যে একটি ছবি আছে সেটি অপূর্ব ও হৃদয়গ্রাহী। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের অনেক কিছু দান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার এই গ্রন্থখানি এক মহামূল্য দান।

কাশ্মীরের পথে স্বামীজীর সঙ্গে একত্রে যাত্রা ভগিনী নিবেদিতার জীবনের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১১ই জুন তারিখে স্বামীজী আলমোড়া হইতে কাশ্মীরের পথে রওনা হইলেন এবং মিসেস অলিবুল তাঁহাদের আতিথ্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

এই সময় স্বামীজী অত্যন্ত নির্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "আমরা সর্বদা ভৃত্যগণের নিকট হইতে শুনিবার জন্য প্রস্তুত



কাশ্মীরে স্বামীজী



স্বামী ব্রহ্মানন্দ

থাকিতাম যে, স্বামীজীর নৌকা একঘণ্টা পূর্বে নোঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেদিন আর প্রত্যাবর্তন করিবে না।"

বারমূলায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তিনখানি হাউস বোট ভাড়া করিয়াছিলেন, এবং স্বামীজী একা একখানি হাউস বোটে থাকিতেন। তবে প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার সহযাত্রিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, কখনও বা পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী, আবার কখনও বা কাশ্মীরের ইতিহাস, কনিষ্কের কাহিনী এবং অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার প্রভৃতির বিবরণ ছিল এই আলোচনার বিষয়।

নদী দিয়া চলিতে চলিতে দুই তীরের অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ২৫শে জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীরে আসিবার তাঁহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। গতবারে যখন তিনি কাশ্মীরে আসেন তখন কাশ্মীরে একটি মঠ ও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবার সেই জন্য জায়গা মনোনীত করিতে মহারাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই জমি মনোনীত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব কাউন্সিলে উত্থাপিত করিবার কথা ছিল। স্বামীজী ঝিলাম নদীর তীরে একটি জায়গা মনোনীতও করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীবেব রেসিডেণ্ট অ্যাডালবার্ট ট্যাবট সেই প্রস্তাবটি কাউন্সিলে তুলিতেই দেন নাই।

৪ঠা জুলাই আমেরিকার "স্বাধীনতা দিবস"। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার আমেরিকান শিষ্যা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের জন্য তিনি সেই দিবস পালনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার হাউস বোটটি ফুল ও পাতায় সাজানো হইল এবং আমেরিকার জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হইল। সেই নৌকায় তিনি তাঁর আমেরিকান শিষ্যদের ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। এই নৌকা সাজানোর ব্যাপারে নিবেদিতা স্বামীজীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতা শিষ্যারা আগে কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই দিন স্বামীজী '৪ঠা জুলাইর প্রতি' শীর্ষক একটি নিজের রচিত ইংরেজী কবিতা সকলকে শুনাইয়াছিলেন। এই অতি সুন্দর কবিতাটি স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই অনুবাদ হইতে শেষের অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

> "প্রতি পদে দলি শতেক বন্ধ, পরান শঙ্কাহীন,
> তবে তো পূর্ণ করিয়া চেষ্টা উদিল পুণ্য দিন।
> সফল হইল সাধনা ও প্রেম—সার্থক বলিদান,
> সকল বেদনা ধন্য করিয়া সিদ্ধি লভিল স্থান।
> তারপর তুমি মঙ্গলালয় জাগিয়া উঠিলে ধীরে,
> মুক্তিকিরণ বরষি হরষে বিশ্বমানব শিরে।
> চল অবিরাম বাধাহীন পথে—জগৎ করিতে তৃপ্ত,
> গগনকেন্দ্রে হে দেব, ছড়ায়ে মুক্তিকিরণ দীপ্ত।

প্রতি প্রদেশের প্রতি নরনারী উন্নত শির তুলি,
হেরুক আনন্দে বন্ধন-পাশ নিঃশেষে গেছে খুলি।
প্রফুল্ল, নবীন জীবন লভিয়া হউক সফল প্রাণ,
মুক্তির দিন। আজিকে সবারে স্বাধীনতা কর দান।

স্বামীজী এই সময় প্রায়ই মাঝে মাঝে নির্জনে চলিয়া যাইতেন। এই নির্জনতা সম্বন্ধে স্বামীজী একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য এই ঘটনা হইতেই সর্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইউরোপীয়রা ভাবে যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী থাকিলে পাগল না হইয়া পারে না, আর ভারতীয় ধারণা এই যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী না থাকিলে তাহাকে প্রকৃতিস্থই বলা যায় না।"

কাশ্মীরের এই দিনযাপনের ভিতর কত যে আনন্দ ও গভীর অনুভূতি বিজড়িত থাকিত, স্বামীজীর প্রত্যেকটি আচরণ, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কত যে নিগূঢ় ভাব নিহিত থাকিত, নিবেদিতা যেভাবে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাহার রচনায় যেন আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং এই ছবিটি জগতের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে মানবমন এই ছবির অনুভূতিসমূহের গভীর স্তরে অবগাহন করিয়া নূতন নূতন ভাবরত্ন আহরণ করিবে।

তাঁহার দুটি একটি কথা, যেমন—"তোমরা জান আমাদের মধ্যে একটা মত আছে ঈশ্বর শুধু খেলার জন্য আপনাকে জগৎরূপে বিকাশ করেছেন বলে কল্পনা করা হয়। অবতারাদি শুধু লীলার জন্যই এখানে এসে বাস করে থাকেন। খেলা- সব খেলা। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন কেন?—শুধু লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও,—বল এসব লীলা, লীলা। তুমি কিছু করেছ কি?' তারপরেই আর একটি কথাও না বলিয়া তিনি উঠিযা নক্ষত্রালোকে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং নিজের নৌকায় চলিয়া গেলেন। আমরাও গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলাম।

আর একবার স্বামীজী জগতের হিতপ্রয়াসী কোন ব্যক্তির উক্তির উত্তরে তীব্রভাবে বলিয়াছিলেন,—"কোন বাহ্যবস্তুই ভাল হয় না,—তারা কেবল যেমন আছে তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

নিবেদিতা বলিয়াছেন, "তাঁর এই শেষ কথাটি আমার নিকট বেদের মতই সারবান বলে মনে হয়—'তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"আমার মনে আছে, আমাদের আলমোড়ায় থাকার সময়ে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক নিরীহ প্রকৃতির লোক স্বামীজীর কাছে এসে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটি এই,—যদি কেহ বলবানকে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে দেখে, তখন তাহার কি করা উচিত? স্বামীজী এই প্রশ্ন শুনে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হযে তাকে বলেছিলেন,—"কেন, বলবানকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া—

এর আর কথা কি আছে? এই কর্মের বিষয়ে তুমি তোমার নিজের কর্তব্যটুকু ভুলে যাচ্ছ,—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার যে তোমার চিরকালই আছে।"

স্বামীজী অমরনাথ যাত্রার জন্য একাই সোনামার্গের পথে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন জুলাই মাস, নানা স্থান হইতে যাত্রীরা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা অমরনাথ দর্শনের জন্য আসিতেছেন। সেই সময় বরফ পড়ায় সোনামার্গের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া স্বামীজীকে আবার ফিরিয়া শ্রীনগরে আসিতে হইল।

১৫ই জুলাই স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিয়া ইসলামাবাদের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলি এবং ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিয়া কয়েকদিন কাটাইলেন। এইভাবে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত কাটিয়া গেল।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন "আচ্ছাবলের মোগলবাগে একদিন আমরা বাহিরে ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময়ে স্বামীজী প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যাত্রীদিগের সঙ্গে অমরনাথ যাইবেন এবং তাঁহার কন্যাকেও (অর্থাৎ নিবেদিতাকেও) সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সকলেই এই সংবাদে এত আহ্লাদিত হইলেন এবং ঐ শিষ্যার সৌভাগ্যে এত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অমরনাথ যাত্রায় কেহ কোন আপত্তিই উত্থাপন করিলেন না।"

অমরনাথ যাত্রার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইল। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, সেই কয় সপ্তাহ কাশ্মীর তীর্থযাত্রীতে পূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। * * * সকল স্থানেই দেখিলাম নূতন নূতন যাত্রীর দল চলিতেছে। সমস্তই বেশ নিস্তব্ধ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। দুই তিন সহস্র লোক একটি মাঠে ছাউনী ফেলিয়া আবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—উনানের ছাই ছাড়া তাহাদের সেই স্থানে রাত্রিবাসের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে বাজারও চলিয়াছে। প্রত্যেক স্থানে যেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম করিবে, সেখানে তাঁবু খাটানোর কাজ এবং দোকান-বাজার সাজানোর কাজ অসম্ভব ক্ষিপ্রতাব সহিত সম্পাদিত হইতেছে।"

ইসলামাবাদ হইতে তাঁবু প্রভৃতি ভাড়া করিবার পর যাত্রীদলের সহিত স্বামীজী ও নিবেদিতা পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন। সাধুদের তাঁবুগুলি গেরুয়া রঙের ও কোনও তাঁবু আবার ছত্রের আকারের। সাধুর দলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, এমন কি নাগা সন্ন্যাসীও ছিলেন। বিশ্রামস্থানে তাঁবু ফেলিবার পর স্বামীজীর তাঁবুতে দলে দলে সাধুর আগমন হইত, সকলে স্বামীজীকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন এবং যতক্ষণ দিনের আলো থাকিত, ততক্ষণ এই আলোচনা-সভা ভঙ্গ হইত না।

স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের যে সব সময় মতের মিল হইত তাহা নহে। স্বামীজী দেশের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিকারের জন্য সাধুদের অগ্রসর হওয়া উচিত, একথা বলিলে তাঁহারা হয়তো উচ্চৈঃস্বরে "শিব শিব" ধ্বনি করিয়া উঠিতেন।

"সাধুর আবার দেশ-বিদেশ কি? এই তুচ্ছ বাহিরের বিষয় নিয়া চিন্তা করা সাধুদের মোটেই উচিত নয়।"—বিদেশী বলিতে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ানদেরই বুঝায়, তাঁহারা এই 'বিদেশী'গণের সম্বন্ধে বার বার "বিদেশী ও মানুষ" এই কথা যদিও বলিতেছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ঠিক সেই ভাবটি দেখা যাইতেছিল না। তাঁহারা এই মুসলমানগণ কিভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, সেই সমস্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। "এই পঞ্চনদের ভূমি—যাঁহারা ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, এমন বহু লোকের শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে"—অতএব এক্ষেত্রে স্বামীজী যেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব সম্বন্ধে ততটা উদারভাবে আচরণ না করেন—অর্থাৎ আচার আচরণের মধ্যে যেন পার্থক্য রাখিয়া চলেন, ইহাই তাঁহাদের অনুরোধ।

এইসব কথায় বেশ বুঝা যায়, সেই সব সাধুরা স্বামীজীর ব্যক্তিত্বকে বিশেষ-ভাবেই সম্মান দিয়াছিলেন; স্বামীজীর অভিমতের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে সংশয় ছিল না।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "স্বামীজী যখন সাধুদের সহিত তাঁহার এই তীব্র বাদ-প্রতিবাদের বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন পাশ্চাত্যবাসী আমরা একটি মস্ত অসংলগ্নতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই যে, তহশীলদার স্বয়ং এবং এই যাত্রা-সংক্রান্ত বহু কর্মচারী ও ভৃত্য মুসলমান ছিলেন, আর ইঁহারা অবশেষে উক্ত তীর্থে (অর্থাৎ অমরনাথে) উপস্থিত হইলে ইঁহাদের গুহাপ্রবেশে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, একথা কাহারও মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। আবার তহশীলদারজী ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু পরে স্বামীজীর নিকট যথাবিধি শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারও কাহারও কিছু বিসদৃশ বা বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল না।"

কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমান যে কি রকম ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিত, এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায়। শোনা যায়, একবার মহারাজা রামসিংহ তাঁহার সমস্ত প্রজাকেই হিন্দুধর্মে আনয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং মুসলমান প্রজারাও তাহাতে আপত্তি করে নাই, কিন্তু আপত্তি উঠিয়াছিল কাশীর যে সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিবেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে। তাঁহারা কিছুতেই মুসলমানকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিতে রাজী হন নাই।

ইসলামবাদ হইতে তীর্থযাত্রী দল বাওয়ান নামক স্থানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। ইসলামাবাদে নিবেদিতার তাঁবুটি যেখানে খাটানো হইয়াছিল, সেখানে একজন বিদেশিনী মহিলার তাঁবু খাটানো উচিত নয় বলিয়া সাধুরা বিষম আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী কিছুতেই সেখান হইতে তাঁবু সরাইতে রাজী হন নাই। অবশেষে একজন নাগা সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে যখন বলিলেন, "স্বামীজী আপনার অসাধারণ শক্তি আছে ইহা মানি, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা উচিত নয়।" স্বামীজী তখনই তাঁবুগুলি সরাইয়া নিয়া যাইবার আদেশ

দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিনই সন্ন্যাসীগণের আর একেবারেই সে ভাব রহিল না, তাঁহারা নিজেই উদ্‌যোগী হইয়া স্বামীজী ও নিবেদিতার তাঁবু তাঁহাদের কাছাকাছি খাটাইতে বলিলেন এবং সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া ধুনির চারিপাশে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম-আলোচনায় যোগ দিলেন।

স্বামীজী বাহিরের আচার অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু এ-সময় তিনি সমস্ত নিয়মই পালন করিতে লাগিলেন। বাওয়ানে অনেকগুলি পার্বত্য নির্ঝর আছে, তাহার মধ্যে পাঁচটির স্রোত অতি পবিত্র বলিয়া তীর্থযাত্রীদের ধারণা। প্রত্যেকটি নির্ঝর ছোট ছোট নদীতে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীরা একটিতে স্নান করিয়া আবার সেই ভিজা কাপড়েই অন্যটিতে স্নান করিতে যায়, এইভাবে পাঁচটি প্রবাহেই স্বামীজীও ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিলেন।

পহেলগামে একাদশীর দিন একাদশী পালন ও বিশ্রাম। এখানেই মনুষ্য-বসতি শেষ হইল। এত শীত যে, ছোট ছোট নদীগুলি জমিয়া গিয়াছে। ইহার পর চড়াই ও উৎরাইয়ের পথ আরম্ভ হইল। তিন হাজার যাত্রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এই পাকদণ্ডির পথ ধরিয়া চলিয়াছেন।

অবশেষে অমরনাথের গুহার সম্মুখে সকলে উপস্থিত হইলেন। যাত্রীগণের উল্লাসধ্বনি "অমরনাথ জীউ কি জয়" গগন বিদীর্ণ করিল।

স্বামীজী যখন গুহায় প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার যেন বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না। স্বামীজী পরে বলিয়াছেন তাঁহার যেন বোধ হইয়াছিল মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন, যেন ভাবাবেশে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না।

অতি শৈশবে তাঁহার জননী যখন দুরন্ত শিশুকে কোনমতেই শান্ত করিতে পারিতেন না তখন 'শিব', 'শিব' উচ্চারণ করিতেন। সেই মুহূর্তেই অতি চঞ্চল অশান্ত শিশু শান্ত হইয়া যাইত। সেই সময় হইতে তাঁহার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, কোন গিরিগহ্বরে শিবমন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হইবে।—স্বামীজী অমরনাথে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং রক্তের চাপ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, বাঁ চোখে রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। পরে একজন ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে হার্ট ডাইলেটেড (হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি) হইয়া তখনকার মত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি রহিয়াই গেল।

অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজী যেন ভাবমগ্ন হইয়া রহিলেন। গুহা হইতে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে শ্বেত পারাবতশ্রেণী। এইটি একটি শুভদর্শন। নিবেদিতাও গুহার মধ্যে গিয়া অমরনাথ দর্শন করিলেন। এই অমরনাথ দর্শনে কাহারও কোন বাধা নাই। অমরনাথের ইহাই বিশেষত্ব।

ইহার ঘণ্টাখানেক পরে নদীর ধারে একটি পাথরের উপর বসিয়া একজন নাগা সন্ন্যাসী, ভগিনী নিবেদিতা ও তিনি জলযোগ করিতে বসিলেন। এখানে কোন পাণ্ডার জুলুম নাই, যাত্রীগণ নিজের ইচ্ছামত ধর্মাচরণ করিতেছে।

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিলেন, "দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে আজ ইচ্ছা-মৃত্যু বর দিয়াছেন।"

তিনি নিবেদিতাকে আরও বলিয়াছিলেন, "আমি কল্পনা করতে পারি কিভাবে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল। গ্রীষ্মকালে একদিন একদল মেষ-পালক ছেলে তাদের ভেড়ার খোঁজে এদিকে এসে পড়েছিল। এসে তারা এই গুহা আর গুহার মধ্যে ধবলতুষার লিঙ্গ দেখতে পেয়েছিল। তারা ফিরে বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলেছিল যে, এই গুহায় তারা মহাদেবের দর্শনলাভ করেছে। সেই অবধি অমরনাথ লোকসমাজে প্রকাশিত হলেন।"

অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়াও স্বামীজীর তন্ময়তা সমভাবেই রহিল। দর্শনলাভের পূর্বে এতদিন যেন যাত্রীগণ সকলেই শিবধ্যানে মগ্ন ছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "প্রতিপদক্ষেপে আমাদের মনে হইতেছিল যেন আমরা সেই চিরতুষারমণ্ডিত মহান্ পর্বতমালার নিকটস্থ হইতেছি, যাহা একাধারে তাঁহার প্রতিরূপ ও আবাসভূমি। সায়াহ্নে যখন তুষারময় গিরিসংকটের ও দোদুল্যমান সরল গাছগুলির উপর দিয়া বালশশী নয়নপথে পতিত হইত, তখন মহাদেবের কথাই স্মরণপথে উদিত হইত।"

কিন্তু এখন স্বামীজী যেভাবে অনবরত রামপ্রসাদের গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন এবং যেভাবে কালীর কথাই সর্বদাই সকল প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহার সঙ্গীগণের মনে হইল শিবদর্শন করিয়া আসিয়া এখন তিনি শিবের শক্তি স্বরূপা যিনি তাঁহাকেই মনোনেত্রে দর্শন করিতেছেন। স্বামীজী সে-সময় একবার কথার মধ্যে একথাও বলিয়াছিলেন যে, জগজ্জননী যেন প্রত্যক্ষরূপে এই ঘরের মধ্যেই রহিয়াছেন তাহাই তিনি অনুভব করিতেছেন।

স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' (মৃত্যুরূপা মাতা) নামক কবিতাটি এই সময়েই লিখিত হয়। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "আমরা একটি স্থান দর্শন করিয়া বজরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তাঁহার হাতে লেখা "কালী দি মাদার" শীর্ষক কবিতাটি আমাদের জন্য রহিয়াছে। তিনি সে-দিন তথায় আসিয়া কবিতাটি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পরে শুনিলাম, দিব্যভাবের আবেশে লিখিতে লিখিতে লেখা শেষ হইবামাত্র তিনি আবেশের তীব্রতায় ক্লান্ত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন।"

কিন্তু এই সময় স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদিন আর কাহারও দেখা হইল না। তিনি তাঁহার নৌকা-সঙ্গীগণের নিকট হইতে অনেক দূরে নিজেকে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে কাহারও যাইবার অনুমতি ছিল না। কেবল একজন ডাক্তার তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাইতেন এবং তাঁহার কি কি জিনিস দরকার

তাহা জানিয়া আসিতেন। ডাক্তারটি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু স্বামীজীকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ডাক্তারটির নিকট স্বামীজীর সংবাদ পাওয়া যাইত।

"মৃত্যুরূপা মাতা" কবিতাটি ২৮শে সেপ্টেম্বর লিখিত হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবু স্বামীজীর বজরায় গিয়া দেখিলেন তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন, তাই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। ৩০শে তারিখে স্বামীজীর বজরায় গিয়া ডাক্তারবাবু বজরার লোকেদের কাছে শুনিলেন স্বামীজী 'ক্ষীরভবানী' চলিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন কেহ যেন সেখানে তাঁহার কাছে না যায়।

ক্ষীরভবানী একটি পবিত্র কুণ্ড, কাশ্মীরের এটি একটি বিখ্যাত তীর্থ। ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত স্বামীজী ক্ষীরভবানী হইতে ফিরিয়া আসিলেন না। যেদিন ফিরিলেন সেদিন বৈকালে তিনি যখন নৌকায় করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের বজরার কাছে আসিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিবেদিতার মনে হইয়াছিল তাঁহার আকৃতি যেন একেবারেই অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হাতে একগাছি গাঁদা ফুলের মালা ছিল, সেই প্রসাদী মালাটি একে একে সকলের মাথায় স্পর্শ করাইলেন, তাহার পর মালাটি একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি এই মালাছড়াটি মাকে নিবেদন করিয়াছিলাম।" আর তারপর বলিলেন, "হরি ওঁ নয়, এবার মা, মা!"

এই সাতদিন ক্ষীরভবানীতে স্বামীজী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছিল। পরে কয়েকদিন তিনি লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া রহিলেন এবং তাহার পর নাপিত ডাকাইয়া মুণ্ডিতমস্তক হইলেন। এই মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী যেন নূতনরূপে আবির্ভূত হইলেন। যেন একটি মায়ের একান্ত নির্ভরপরায়ণ শিশু। যেন তাঁহার প্রবল কর্মচেষ্টার একেবারেই অবসান হইয়াছে।

১১ই অক্টোবর কাশ্মীর হইতে বারমুল্লা ফিরিবার দিন। সকলে একসঙ্গেই ফিরিলেন, কিন্তু স্বামীজী এ-সময় প্রায় মৌনী হইয়াই থাকিতেন। স্বামীজী পরদিন লাহোর হইতে চলিয়া যাইবেন, আর সকলে কিছুদিন লাহোরেই থাকিবেন এইরকম কথা হইয়াছিল। নিবেদিতার তখন মনে হইয়াছিল, "কে জানে কতদিন পরে আবার তাঁহাদের দেখা হইবে।" যেন স্বামীজী তাঁহাদের কাছ হইতে তখনই বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ১২ই অক্টোবর বুধবার, সেদিন স্বামীজী তাঁহাদের বজরায় আসিয়া অনেকক্ষণ -হইলেন এবং কথাবার্তা বলিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "সেই সব কথাবার্তার বর্ণনা দেওয়ার চেয়ে কথার প্রভাব আমাদের মনে কিভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল সেই কথাই বলা সহজ। কথা শুনিতে শুনিতে সে সময় আমরা যেন এক অন্তরতম পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিলাম।"

এই সময় তিনি জগজ্জননীর কথাই বলিতেছিলেন। তিনি যেন সেই বিশ্ব-জননীর আদরের সন্তান, মা তাঁহাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছেন—সে

আদর হয়ত দুঃসহ যন্ত্রণারূপেই প্রকাশ পায়, কিন্তু তবুও সন্তান বুঝিতে পারে এ তাহার মায়েরই স্নেহের দান। তিনি বলিয়াছিলেন, "তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ থাকিতে পারে।"

তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া "শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)... ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে, তখন হেসে দাও মা হাত চাপড়ি—" এই গানটি বারবার গাহিয়াছিলেন।

আবার তিনি নিজের কবিতা হইতে আবৃত্তি করিলেন,—

"দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ;
মৃত্যুরূপা মা আমার আর!
করালি, করাল তোর নাম
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণপ্রক্ষেপে
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।

আবৃত্তি করিতে করিতে মাঝখানে থামিয়া বলিলেন, "দেখেছিলাম, তা সব সত্য,— বর্ণে বর্ণে সত্য!"

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

"মা সত্যসত্যই তার কাছে আসেন, আমি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি।"

তিনি তাঁহার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও বলিলেন, "আমার আর কোন কামনা নাই। আমি শুধু গঙ্গাতীরে মৌনী কৌপীনমাত্রধারী পরিব্রাজকের জীবন যাপন করতে চাই। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। 'স্বামীজী' চিরদিনের জন্য মরেছে। আমি কে যে জগৎকে শিক্ষা দিবার ভার যেন আমারই বলে মনে করছি? এ তো কেবল আস্ফালন ও বৃথা অহঙ্কার। জগন্মাতার আমাকে প্রয়োজন নাই, আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন আছে।"

"প্রেমই একমাত্র পথ। যদি আমাদের প্রতি লোকে দুর্ব্যবহার করে, তা হলেও আমাদের তাদের ভালবেসেই যেতে হবে। এইরকম করতে করতে শেষে তারা এই ভালবাসার বশ না হয়ে থাকতে পারবে না। এই আর কি?"

ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর যে দিব্যদর্শন হয়, তাহার পর হইতেই স্বামীজীর মন অবিরত এইভাবেই বিভাবিত হইয়া রহিয়াছিল। এবং কাশ্মীর ত্যাগ করিবার সময় পর্যন্ত তাঁহার মনে এই ভাবই পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল।

স্বামীজী চলিয়া গেলেন। চাকর, মাঝি, বন্ধু, শিষ্য, পিতামাতা ও তাহাদের

সন্তান (অর্থাৎ মাঝি ও তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যা প্রভৃতি) সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তার উপর টাঙ্গা গাড়ির কাছ পর্যন্ত চলিল। সর্দার মাঝির চার বৎসরের একটি ছোট মেয়ে এক বারকোষ ফল মাথায় লইয়া ছোট ছোট পা ফেলিয়া তাঁহার পাশে পাশে হাঁটিয়া চলিল। গাড়ির কাছে পোঁছিয়া সকলেই তাঁহার কাছে বিদায় লইল। তাঁহার গাড়ি রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। সকলেই যতক্ষণ গাড়িখানি দেখা যায় সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

"কুমারী পূজা" বেলুড় মঠের একটি বিশেষভাবে পূজার অঙ্গ। স্বামীজী ক্ষীরভবানী কুণ্ডের নিকট যে সাতদিন তপস্যারত ছিলেন সে সাতদিন প্রত্যহ সেখানকার এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের শিশুকন্যাকে ভগবতী কুমারী উমার প্রতীক-রূপে পূজা করিতেন। একটি বিশেষ আশ্চর্য ব্যাপার এই যে পূজার সময় শিশু কুমারীটিও যেন দেবীর গাম্ভীর্য লাভ করে। কেহ কেহ বলেন স্বামীজী নৌকার মুসলমান মাঝির চার বৎসরের মেয়েকে কুমারী উমারূপে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পূজা করিয়াছিলেন।

১৮ই অক্টোবর তারিখে স্বামীজী তাঁহার শিষ্য সদানন্দকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ হইল।

বেলড়ে মঠ স্থাপনের পর

স্বামীজী ভারতবর্ষে চলিয়া আসিবার পর স্বামীজীর আহ্বানে স্বামী সারদানন্দও চলিয়া আসেন। সে সময় স্বামী অভেদানন্দই পাশ্চাত্যের কাজ চালাইবার ভার গ্রহণ করেন।

দিন দিন প্রচারকার্যের প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিকে আইনসংগতভাবে রেজেস্ট্রি করা উচিত বলিয়া স্বামী অভেদানন্দ ও ভক্তমণ্ডলী সকলেই মনে করিলেন ও এসম্বন্ধে সকলেই একমত হইয়া সমিতিটি আইনসংগতভাবে রেজেস্ট্রি করিয়া লইলেন।

রেজেস্ট্রি পুস্তকের অনুবাদ এইরূপঃ 'নিউইয়র্ক শহরে এই বেদান্ত সমিতি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর এই সমিতি স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা আইনসংগতভাবে গঠিত হয়।

উদ্দেশ্য

(১) স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ অথবা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরূপে নিযুক্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই সংঘের অন্য হিন্দু সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক বেদান্ত দর্শনের সত্য ও সার্বভৌমিক তত্ত্বসমূহ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই সমুদয় আলোচনা এবং প্রচার করা।

(২) ঐ স্বামীগণ কর্তৃক আরব্ধ কার্যের প্রচার ও সাফল্যের জন্য সর্বপ্রকার যুক্তিসংগতভাবে সাহায্য করা।

(৩) এবং ঐ সকল কার্যের সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পরিচালন ও সম্পাদন করা।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ট্রাস্টিগণের নামঃ

১। ফ্র্যান্সিস এইচ লেগেট (Francis H Legget) নিউইয়র্ক।
২। বেসে ম্যাকলাউড লেগেট (Besse Macleod Legget) নিউইয়র্ক।
৩। মেরি বি কলস্টোন (Mary B Caulston)
৪। ওয়ালটার গুডইয়ার (Walter Goodyear)
৫। ফ্র্যান্সিস বি গুডইয়ার (Francis B Goodyear)
৬। জর্জ এইচ টমসন (George H Thomson))

এই ট্রাস্টিগণ সকলেই গৃহীভক্ত এবং ইহার দ্বারা বুঝা যায়, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার বিভাগটির সন্ন্যাসিগণ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বৈষয়িক ব্যাপারগুলির ভার গৃহীদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে এই উদ্দেশ্যেই ঐভাবে সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষেও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে একই দিনে বেলুড়মঠ ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। ১২ই নবেম্বর ছিল 'কালীপূজার দিন, ঐদিন জননী সারদাদেবী তাঁহার গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতি সঙ্গিনীগণকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ের মঠের জন্য কেনা জমিতে প্রথম শুভ পদার্পণ করেন।

মা স্বয়ং আসিয়াছেন, ইহাতে বেলুড়ে উৎসব ও আনন্দের সীমা রহিল না। মা ঠাকুরের যে ছবিখানি নিত্য পূজা করিতেন, সেখানি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে যে ছবিখানির নিত্য পূজা করা হইত, সেখানিও আনা হইল। মা সেই দুখানি ছবিই বেদীর উপর স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি ঠাকুরের পূজা করিলেন। স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, সারদানন্দ স্বামী প্রভৃতি জননীকে বেষ্টন করিয়া পূজা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দিনই ১৭নং বোসপাড়া লেনে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজীরা সকলেই তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। মা এখানেও ঠাকুরের পূজা করিয়া শেষে যে প্রার্থনা করিলেন, গোলাপ মা সেই প্রার্থনাটি সমবেত ছাত্রীগণ ও অপর সকলকে শুনাইয়া দিলেন, কেননা মা অতি মৃদুস্বরে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। গোলাপ মা বলিলেন, "শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখানের মেয়েরা যেন আদর্শ মেয়ে হয়।" নিবেদিতা একপাশে জোড় হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, জননীর এই আশীর্বাদ যেন তাঁহার যাত্রাপথের পরম সঞ্চয়, ইহাই হয়তো সে দিন তাঁহার মনে হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়কে গড়িয়া তুলিবার জন্য নিবেদিতা কিভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাহা জানেন।

নিবেদিতা সেদিনের ঘটনা লইয়া বলিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীগণের পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

মায়ের সেদিনের আশীর্বাদ কি আজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে? নিবেদিতা বিদ্যালয়ের উপর দিয়া বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে, নৌকাখানি যেন একদিন ডুবু ডুবু হইতেছিল, কিন্তু সেই নৌকা কি আজ 'প্রসাদ পবনে' পাল তুলিয়া সার্থকতার যথার্থ পথে অগ্রসর হইয়াছে? দেশবাসী কি আজ নিবেদিতার পরম ত্যাগের মহিমা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছেন? স্বামীজীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন 'ভারতীয়া নারী আবার মৈত্রেয়ী গার্গীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা হইবেই', সেই স্বপ্ন কি আজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে অথবা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়াছে? আজ মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছে।

"মা" এই একটি মাত্র শব্দ যে কি শক্তিসঞ্চারিণী মহামন্ত্র, স্বামীজী সব

সময়েই যেন তাহা জীবন্তভাবে অনুভব করিতেন। 'মা' বলিতে স্বামীজী যেন শরীরধারিণী জননীর প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই অনুভব করিতেন। মায়ের তিনি এক দুর্দান্ত সন্তান। তিনি তাঁর এক শিষ্যকে একসময় বলিয়াছিলেন, "মায়ের কাছে দীনহীন ভাব চলবে না, যা চাইবে তা আদায় করে নিতে হবে।"

ঠাকুরের গলায় যখন দারুণ কষ্ট, শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, 'আপনি যদি একটুখানি আপনার মানসিক শক্তিকে অসুস্থ স্থানে প্রয়োগ করে সুস্থ হবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই মুহূর্তেই তো আপনার অসুখ আরাম হয়ে যায়।'

ঠাকুর একথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো! যে মন আমি সচ্চিদানন্দকে অর্পণ করেছি, সেই মন আবার ফিরিয়ে এনে হাড়মাংসের খাঁচায় কি দিতে পারি?"

এইসব কথার সময় স্বামীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি চলিয়া যাইবার পর তিনি নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিলেন, "আপনাকে অসুখটা সারাতেই হবে।"

ঠাকুর বলিলেন, "বলিস কিরে, আমি কি কিছু পারি, মা যা করবেন, তাই তো হবে।"

তখন স্বামীজী বলিলেন, "তবে মাকে বলুন, তিনি যেন অসুখটা সারিয়ে দেন।"

এইভাবে ঠাকুরের উপর মার কাছে বলিবার ভাব দিয়া স্বামীজী বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাকে বলেছিলেন? মা কি বললেন?" অর্থাৎ মার কাছে বলা এবং তাঁর উত্তর দেওয়া ব্যাপারটি এতই সহজ ও স্বাভাবিক।

মায়ের দক্ষিণ হাত দাক্ষিণ্য বিতরণ করে, আবার বাম হাতে রহিয়াছে খড়্গ। স্বামীজীর কাছে অভয়দান ও শাস্তিবিধান দুইই এক। তিনি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁর শাপই বর।" আবার হয়তো ভাবাচ্ছন্ন হইয়া বলেন, "অন্তরঙ্গ ভক্তের হৃদয়-কন্দরে মায়ের রুধির-রঞ্জিত অসি ঝকমক করে।" তিনি "ঘোরা নৃমুণ্ডমালিনী সংহারকারিণী মূর্তির" উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "এস আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর রূপেই আলিঙ্গন করি, তাঁর কাছে কোমল হবার প্রার্থনা যেন না জানাই।"

স্বামীজীর সাধনা পূর্ণ হইল, এত দিনে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল। কতক সাধু তখন নীলাম্বরবাবুর বাগানে এবং কতক মঠবাড়িতে রহিলেন। ৯ই ডিসেম্বর অতি প্রত্যুষে সাধুরা স্বামীজীকে অগ্রবর্তী করিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন, স্নানান্তে নূতন গৈরিক পরিয়া ঠাকুরঘরে সকলে সমবেত হইলেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান ও তাহার পর যথাবিধি পূজা করিয়া সকলে নবপ্রতিষ্ঠিত মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামীজীর আদেশ অনুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবশেষ রক্ষিত তামার কৌটা ফিরাইয়া

আনিয়া এই ঠাকুরঘরে রাখিয়াছিলেন, সেইটি স্বামীজী দক্ষিণ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং বেলুড়মঠের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁশর বাজাইতে বাজাইতে অন্য সকলে চলিলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এদিনও তাঁহার পাশে পাশে চলিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্বামীজী বলিলেন, "আজ ঠাকুরের পুণ্য অস্থি তাঁর প্রতীকস্বরূপ নিয়ে ভবিষ্য মঠে চলেছি। বৎস, স্থির জেনো, যতদিন তাঁর নামে তাঁর অনুগামীরা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, সর্ব মানবে সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করতে পারবে, ততদিন ঠাকুর এই মঠকে তাঁর দিব্য উপস্থিতির দ্বারা ধন্য করে রাখবেন।"

মঠের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ক্রমশ নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ 'উদ্বোধন' নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হইল, স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহার সম্পাদনার ভার লইলেন।

অমরনাথ হইতে আসিয়া অবধি স্বামীজীর শরীর অসুস্থই ছিল, এখন অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সেই জন্য তিনি ১৯শে তারিখে বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলেন। বৈদ্যনাথে পুরন্দর নামক স্থানে অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি ছিল, তাঁহার বাড়িতেই স্বামীজী আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হইতে মঠ পুরাপুরিভাবে বেলুড়মঠে স্থানান্তরিত হইল।

৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিনই তিনি একটি সভা আহ্বান করিলেন, এই সভাটি একটি ঘরোয়া সভা। মঠের কার্যপ্রণালী কিভাবে চলিতেছে এবং ইহার পর কিভাবে তাহার বিস্তৃতি সাধন আবশ্যক এই সভায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইল। স্বামীজী বলিলেন, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মঠবাসিগণের কয়েক জনকে বাহিরে যাইতে হইবে। পূর্ববঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ যাইবেন স্বামীজীর এই নির্দেশ শুনিয়া বিরজানন্দ ভীতভাবে বলিলেন, "আমি যে নিজেই কিছু জানি না, লোককে কি বলিব?" স্বামীজী তখনই বলিলেন, "কিছুই জান না? বেশ, তাহাই সকলকে গিয়া বল, বল যে আমি কিছুই জানি না।" তবুও বিরজানন্দ ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি চাও? নিজে মুক্ত হইবে এইজন্য সাধন করিতে চাও? যে নিজের মুক্তি চায় সে তো দারুণ স্বার্থপর। সাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেওয়া। কখনও ভুলিও না যে সন্ন্যাসীর দুটি ব্রত, একটি সত্য উপলব্ধি আর একটি জগতের হিত। বৎস, যদি পর-কল্যাণ কার্যে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাতেই বা কি যায় আসে?"

ইহার পর শিষ্যদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "শুভ-কর্মে শ্রীভগবানই শক্তি সঞ্চার করেন, তিনিই সব সময় পথ দেখাইয়া দেন।"

কিভাবে সকলকে উপদেশ দিতে হইবে, কেহ দীক্ষা চাহিলে তাহাকে কিভাবে দীক্ষা দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও তাঁহাদের উপদেশ দিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সদানন্দজীকেও গুজরাট পাঠাইলেন।

এই সময় বেলুড় মঠে স্বামীজীর কাছে সর্বক্ষণই লোক সমাগম হইত। কলেজের ছেলেরা অনেকেই আসিত এবং গ্রাজুয়েট যুবকেরাও আসিত। সেই সকল যুবকগণের মধ্যে অতি অল্পই তাঁহার মনের মত হইত। শারীরিক ও নৈতিক দুর্বলতায় দেশবাসী তরুণগণ যেন ক্ষয়ের পথে চলিতেছে, পরানুকরণ প্রবৃত্তি, ইংরেজী শিক্ষার মোহ এবং নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তরুণগণের ভিতর যেন সংক্রামক রোগের ন্যায়ই বিস্তৃত হইতেছিল; কিন্তু সংসর্গের আশ্চর্য প্রভাবে তাহাদেরও মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

স্বামীজীর শরীর এতই অসুস্থ যে তাঁহার পক্ষে এইভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলা তাঁহার শরীরের পক্ষে যে বিশেষ ক্ষতিকর তাহা তাঁহার গুরুভাইরা বুঝিয়াও কিছুই করিতে পারিতেন না। কেননা, স্বামীজীর ইচ্ছায় বাধা দেওয়া তাঁহাদের সাধ্যের অতীত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজী যাঁহাকে 'রাজা' বলিতেন, স্বামীজী 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' বলিয়া যাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতেন, তিনিও স্বামীজীর কোন ইচ্ছাতেই বাধা দিতে পারিতেন না। কিন্তু ইনিই ছিলেন স্বামীজীর পরবর্তী উত্তরাধিকারী, একথা স্বামীজী জানিতেন, তাই ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংগৃহীত যাহা কিছু টাকা স্বামীজী তাঁহারই হাতে দিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী আবার পরে উইল করিয়া সে টাকা রামকৃষ্ণ মঠের তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দের হাতে দেন। তাঁহারা দুইজন এই উইলের একজিকিউটার ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, "রাজা আমাদের মঠের প্রাণ সে আমাদের রাজা।" তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "এখানে একটা ডাইনামো চলেছে, আমরা সকলে তারই অধীনে আছি।"

রামকৃষ্ণ মিশন তখনকার দিনে ছিল যেন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ একই পরিবার। গৃহ-পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসার বন্ধন আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যেও স্বার্থের সংস্পর্শ থাকে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ এবং একান্ত ভালবাসার দৃষ্টান্ত অন্যত্র একেবারেই দুর্লভ। রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি বিভাগ, একটি মিশন ও অপরটি সঙ্ঘ। মিশনের কার্যে গৃহীদিগের যোগ ছিল, এমন কি বলরামবাবুর বাটীতে প্রথম যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণ প্রচার) স্থাপিত হইল তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ই ইহার সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরৎচন্দ্র সরকার সহ-সেক্রেটারী এবং স্বামী শিষ্য-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শাস্ত্রপাঠক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রচার কার্যের ভার সন্ন্যাসিগণের উপর ছিল, কিন্তু

বিভিন্ন স্থানে সেবাকার্যে গৃহস্থগণও সাহায্যকারী হিসাবে যোগ দিয়াছেন।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "সবাই আমাকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আমি জানি রাজা আমাকে কখনও ত্যাগ করবে না।" আমাদের স্বভাবতই এ কথায় মনে হয়, "সবাই আমাকে ত্যাগ করতে পারে," এ কথা স্বামীজী বলিলেন কেন? বোধ হয় প্রথম প্রথম অনেক গুরুভ্রাতা তাঁহার কার্যের সমর্থন করেন নাই। প্রথমত তাঁহারা সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি লইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী গেলেন অন্য দিকে। তিনি বলিলেন, "ছাড় বিদ্যা যাগ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম সে সম্বল"। তিনি বলিলেন,

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বজীবে সেই প্রেমময়,
প্রাণ মন শরীর অর্পণ কর সখা এ সবার পায়।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমরা সব মায়ের সৈনিক এবং তোমরা সব মৃত্যু-ভয়হীন অগ্রগামী দল, পথ করে চল।"

আগে যার বীর্য পরিচয় পতাকা নিচয়,
দন্তে ঝরে রক্তধারা,
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল,
বীরমদে মাতোয়ারা।
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী অন্য বীর তারি
ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীর কায়,
তবু তাহে নাহি টলে।"

তিনি আরও বলিলেন,

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি—চিতা মাঝে,—
পূজা তাঁর—সংগ্রাম অপার সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা—
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান হৃদয় শ্মশান
নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

কিন্তু এই সকল মঠ প্রভৃতি করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে হয়তো কিছু সংশয়ও তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। তাই তিনি নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেখুন এই সব মঠ, এই সেবাশ্রম প্রভৃতি, এসব কি ঠাকুরের ইচ্ছামত হচ্ছে?" গিরিশবাবুকেও তিনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্লেগের সময় প্লেগের সেবাকার্যের টাকার জন্য মঠের জমি বিক্রি করিয়া দিতেও চাহিয়াছিলেন।

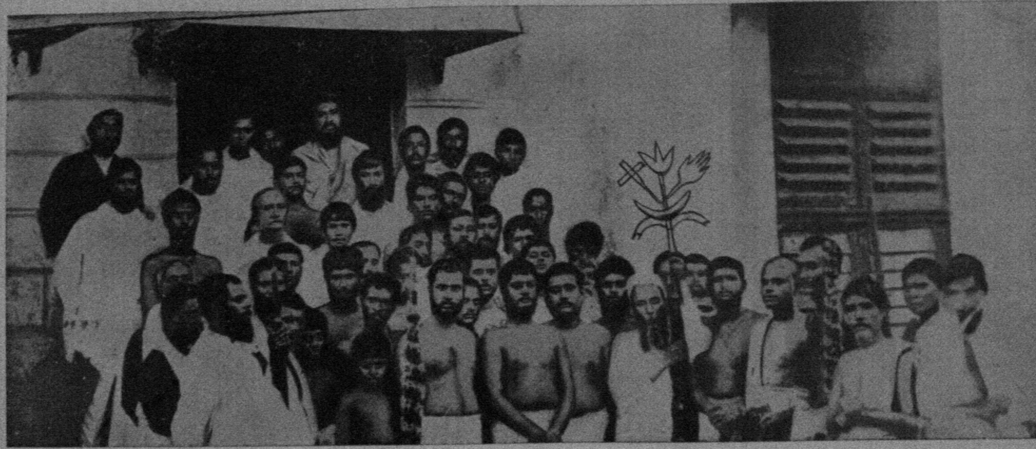
কিন্তু সংঘ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই সংঘ এমনভাবে গড়িতে চাহিয়াছিলেন যেন এর মধ্যে কোনও রকম বিভেদের সূত্রপাত না হয়। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের একটি মহৎ দোষ, আমরা কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না, তার কারণ আমরা অন্যের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না।"

স্বামীজী গণতন্ত্র অপেক্ষা ডিক্টেটরশিপেই অধিক আস্থাবান ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের দেশের জনগণ এখনও স্বাধীন মত দিবার মনোভাব সম্পন্ন হয় নাই। এইজন্য তিনি এমন একজন ডিক্টেটর চাহিয়াছিলেন যিনি তাঁহার অভাবে সংঘকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই তিনি সেইরূপ যোগ্য পরিচালক মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "এমন মেশিন করো যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে।"

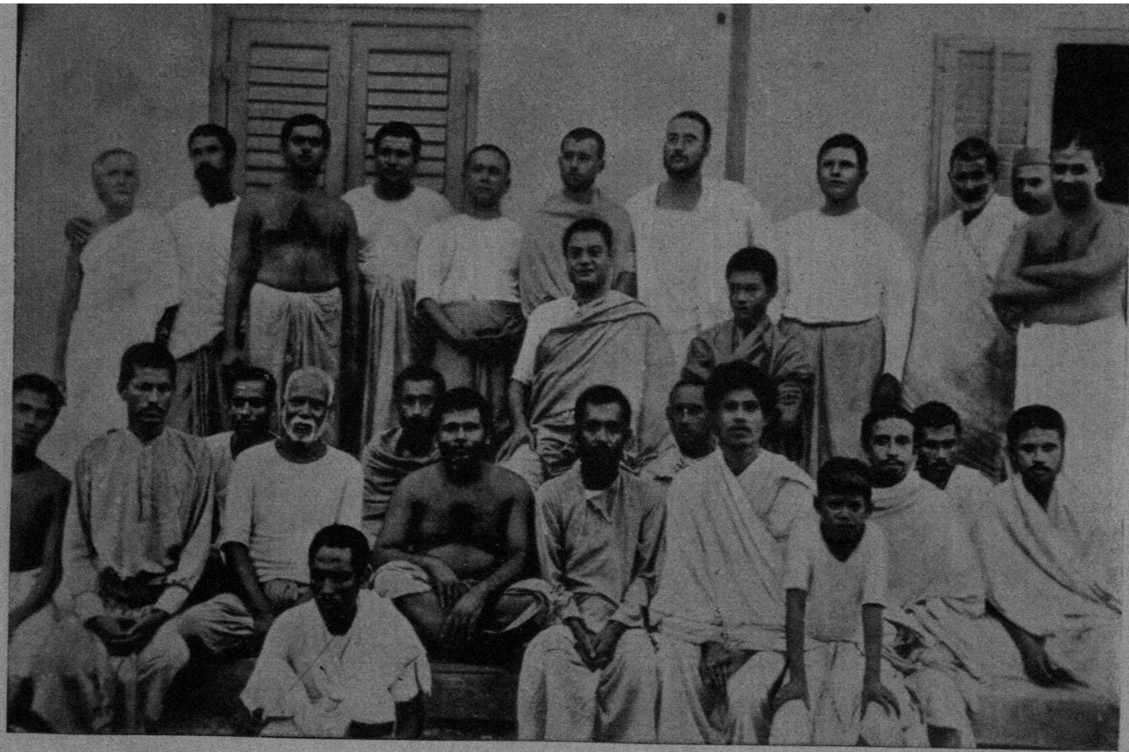
তাঁর গুরুভাইদের সহিত একটি মতভেদের কারণ ছিল শ্রীরমকৃষ্ণের প্রচার সম্বন্ধে। তাঁহার অনেক গুরুভাই চাহিতেন তিনি যেন বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেই প্রচার করেন, কিন্তু তিনি অনেক বক্তৃতায় ঠাকুরের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিতেন না। আমেরিকায় তিনি যে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন তাহা রেজেস্ট্রী করিবার সময় যে উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা হয় তাহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। 'ঠাকুর ঘর' সম্বন্ধে নিয়মগুলির মধ্যে ২নং নিয়মে বলা হইয়াছে "ঠাকুব স্থাপন, পূজো, ভোগরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার কোন উপদেশ নাই, ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা কল্পনা করিয়াছি।"

কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দেখানো যায় কিসে? এ কথাও স্বামীজী বলিয়াছেন ৪নং নিয়মে "প্রভুর উপদেশানুসারে কার্য করাই তাঁহাকে যথার্থ সম্মান করা।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ কি ছিল ইহা লইয়াও কোন কোন গুরুভ্রাতা তাঁহার সহিত বিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন স্বামীজী যেভাবে আদর্শ প্রচার করিতেছেন ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের কোন মিল নাই। একান্ত ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের ধ্যান, তাঁহারই ভজনা, তাঁহাকেই উপলব্ধির চেষ্টা ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনপন্থা, কিন্তু স্বামীজীর এই স্বদেশপ্রেম, এই সর্বমানবের সেবায় কর্মতৎপরতা এগুলি সে আদর্শের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। এগুলি অনেকটা পাশ্চাত্ত্য ভাবের কর্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ এক হিসাবে কর্মবন্ধন।" আবার কেহবা ইহাও বলিয়াছেন, "এ সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস ধর্মের বিরোধী, সর্বত্যাগই সন্ন্যাস ধর্মের মূলমন্ত্র, সর্ব গ্রহণ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার হইতেছে না ইহা লইয়াও অনুযোগের অন্ত ছিল না, এই সব অনুযোগের উত্তরে স্বামীজী কখনও হাস্য-পরিহাস করিয়া উত্তর দিতেন। হয়তো বলিতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করবার কথা বলছো? তুমি আমি তাঁর অনন্ত ভাবের



গিরিন্দ্র, মহিমাচরণ, গঙ্গাধর, হরিশ, বুড়োগোপাল, শশী। বিনোদ, মাস্টার, কালী, নবগোপাল, ভূপতি।
মণি মল্লিক, ফকির, সুরেন্দ্র। অতুল, তারক, ছোট গোপাল, বৈকুণ্ঠ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, শরৎ। অমৃত,
পল্টু, ভবনাথ, নরেন্দ্র, রাম, বলরাম, রাখাল, নৃত্যগোপাল, যোগীন, দেবেন্দ্র প্রভৃতি।



বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর

দণ্ডায়মান — দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নির্মলানন্দ, বিরজানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, সারদানন্দ, বুড়ো বাবা (সচ্চিদানন্দ), উপেন দেব।

বেঞ্চিতে উপবিষ্ট — স্বামী বিবেকানন্দ, নাড়ু মহারাজ।

উপবিষ্ট — ধীরানন্দ, সোমানন্দ, কল্যাণানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, আত্মানন্দ, সদানন্দ, সুরেশ্বরানন্দ, বোধানন্দ, নন্দ মহারাজ, খেঁদা, প্রকাশানন্দ, ব্রজেন, শুদ্ধানন্দ।

কতটুকু বুঝতে পেরেছি যে তাঁকে প্রচার করবার স্পর্ধা রাখি?" আবার হয়তো সিংহ গর্জনে বলিয়া উঠিতেন, "কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বলছে না বলছে কে তা শুনতে চায়? যদি আমার এই ভারতের অগণ্য লোককে, যারা ডুবতে বসেছে,— অনাহারে আর অজ্ঞানের অন্ধকারে তাদের মানুষ করবার জন্য দেহপাত করতে পারি, যদি তাদের কয়েক জনকেও মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি নরকে যেতেও রাজী আছি। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অন্য কারও চেলা নই, যারা নিজেদের ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে আমি তাদেরই চেলা,—ভৃত্য-ক্রীতদাস।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া "জন্মে জন্মে দাস তব দয়ানিধে" এ কথা তিনি বার বার বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গমাত্র উল্লেখে তিনি ভক্তিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, এমন কি সময় সময় সংজ্ঞাশূন্যও হইয়া যাইতেন। আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছেন, "যার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়েছে তার স্নায়ুগুলি এত কোমল হয়ে পড়ে যে, সামান্য ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তোমরা জান, আমি আজকাল প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধে কোন পুস্তক পড়তে পারি না।"

কিন্তু স্বামীজীর গুরুভাইরা শেষে স্বামীজীর মতেই মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) পূজা অর্চনা লইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। ঠাকুরকে প্রতিদিন ফুল দিয়া পূজা করিতে না পারিলে তাঁহার কোনমতেই চলিত না। তাই এর ওর বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকেও পাঠাইলেন মাদ্রাজে, প্রচারকার্য ও জনসেবার জন্য।

গিরিশবাবুকে স্বামীজী 'জি সি' বলিতেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন তখন তিনি গৃহী-ভক্ত ও সন্ন্যাসী সকলকেই আহ্বান করিযা বলিয়াছিলেন, "নানা দেশ ঘুরে আমাব ধারণা হয়েছে সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।" তিনি সকলকেই সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা সকলেই প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্যে সহায় হউন।"

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শাস্ত্রপাঠকের কার্যভার পাইয়াছিলেন, তাই স্বামীজী তাঁহাকে ঋগ্বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পড়ানোর সময় সেখানে গিরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "জি সি তুমি বোধ হয় এ সব পড়ার কোন দরকারই মনে কর না, চিরকাল তো কৃষ্ণ বিষ্ণু নিয়েই কাটিয়ে দিলে।"

গিরিশবাবু বলিলেন, "বেদ পড়ে আমার কি হবে ভাই? বেদ বুঝবার মত আমার বুদ্ধিও নেই, অবসরও নেই। ও সমস্ত তোমার কাজ, তিনি তোমাকে দিয়ে লোকশিক্ষা দেবেন, ধর্মপ্রচার করাবেন, তাই ও সব তিনিই তোমাকে পড়িয়েছেন।

ও সমস্ত জিনিসকে দূরে থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান রামকৃষ্ণের কৃপায় ভবসমুদ্র পার হয়ে চলে যাব।" এই বলে তিনি ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!"

গিরিশবাবু তাঁহার নাটকে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য, নারীর উপর অত্যাচার, বাল-বিধবার জীবনের মর্মস্পর্শী দুঃখের কাহিনী আঁকিয়াছেন, সেগুলি যেন তাঁহার প্রাণ দিয়া লেখা। তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নরেন, তোমার বেদবেদান্তের মধ্যে এ সবের কিছু প্রতীকারের কথা লেখা আছে কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া স্বামীজীর চোখে জল আসিয়াছিল।

সংঘ পরিচালনার ভার স্বামীজী অর্পণ করিলেন ব্রহ্মানন্দ স্বামীর উপর। ব্রহ্মানন্দ স্বামী ছিলেন ঠাকুরের আদরের দুলাল। সাংসারিক জীবনে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, একটি পুত্রসন্তানও ছিল। কিন্তু সে সব ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাবা আনন্দমোহন বার বার তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরাইয়া লইতে পারেন নাই। ঠাকুরের মহাসমাধির পর কাশীপুর হইতে চলিয়া আসিলেন বরানগরে। সেখানেও তাঁহার বাবা তাঁহাকে বার বার লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। বাড়িতে সাধ্বী পত্নী আর শিশুপুত্র রহিয়াছে, কিন্তু কোন আকর্ষণই তাঁহাকে সংসারে ফিরাইযা লইতে পারিল না। ইহার পর শুরু হইল তাঁহার তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা। একবার তিনি ছয় দিন ছয় রাত্রি একাসনে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহারই উপর সকল কার্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, আবার কোন কাজ ঠিক না হইলে সকল রাগ গিয়া পড়িত তাঁহারই উপর।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইউরোপে যাত্রা করিলেন। এ সময় তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছিল যে, চিকিৎসকগণ জানাইলেন—কিছুদিনের জন্য সমুদ্রের আবহাওয়া তাঁহার শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দ গিয়াছিলেন। তাঁহারা 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে রওনা হন।

স্বামীজী রওনা হইয়াছেন এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। মাননীয় আনন্দ চার্লুর নেতৃত্বে একটি সভা আহ্বান করা হইল এবং সভার পক্ষ হইতে স্বামীজীকে যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য মাদ্রাজে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ গভনর্মেণ্ট স্বামীজীর প্রভাব ভয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই কাশ্মীরের মহারাজা মঠের জন্য জমি দিতে অগ্রসর হইলেও রেসিডেণ্ট সাহেব মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন এবং মাদ্রাজেও প্লেগের অজুহাত দেখাইয়া স্বামীজীকে মাদ্রাজে নামিতে দেওয়া হইল না। সুতরাং গোলকুণ্ডা জাহাজ মাদ্রাজের বন্দরে বন্দরে নোঙ্গর করিলেও তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসুক জনগণ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিলেন না। ডেকে

দণ্ডায়মান স্বামীজীকে দূর হইতে দেখিয়াই তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ করিতে হইল।
কিন্তু কলম্বোতে কর্তৃপক্ষ স্বামীজীকে তীরে নামিতে বাধা দেন নাই। মাননীয় কুমারস্বামী ও মিস্টার অরুণাচলম অগ্রবর্তী হইয়া স্বামীজীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র কলম্বোর অধিবাসী অতি আগ্রহের সঙ্গে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাইল।

জাহাজে ছয় সপ্তাহ কাল নিবেদিতা স্বামীজীর সহিত ছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "এই দেড়মাসকালব্যাপী সমুদ্রযাত্রাটিকেই আমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে করি।" এই সময় স্বামীজীর প্রত্যেকটি উক্তি নিবেদিতা তাঁহার মনে যেন খোদাই করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীজী এই সময় গল্পের মধ্য দিয়া অনেক কথাই বলিতেন, আর প্রত্যেকটি কথারই একটি বিশেষ তাৎপর্য থাকিত। নিবেদিতা বলিয়াছেন, "আমাদের আচার্যদেবেব আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই আজ অতীতের ঘটনা, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অন্তরে যে অমূল্য স্মৃতিসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর বিশ্বমানবের প্রতি একান্ত ভালবাসাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

এই ভালবাসা সর্বদাই তাঁহার সকল কার্যে এবং সকল কথায় প্রকাশিত হইত। তিনি কখনও দোষীর দোষ উদ্ঘাটন করিতেন না, বরং কেন যে সে দোষ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাই বুঝাইতেন। দুর্বল ব্যক্তি বা দুর্বল জাতিসমূহের ভিতরও কি কি গুণ আছে তাহা শতমুখে বর্ণনা করিতেন। যখন দেখিতেন যে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ সমর্থনের কেহ নাই তখনই তাহার পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইতেন।

সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুদেব জাতি যাইবে বলিয়া একটা সংস্কার আছে। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সমুদ্রকে হিন্দুগণ মহা পবিত্র বলিয়া মনে করে, সেইজন্য সমুদ্রলঙ্ঘন তাহাদের নিকট বিশেষ অপরাধের কার্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ভাগীরথীর সীমা অতিক্রম করিয়া যখন জাহাজ সমুদ্রে গিয়া পড়িল স্বামীজী তখন যুক্তকরে প্রমাণ করিয়া বলিলেন, "নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগ-বৈরাগ্যভূমি ছেড়ে ভোগৈশ্বর্যের ভূমিতে পদাপর্ণ করতে চললাম।"

স্বামীজী এ যাত্রায় বেশী দিন ইউরোপে ছিলেন না। ৩১শে জুলাই তাঁহারা লণ্ডনে পৌঁছান এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমেরিকায় চলিয়া যান। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় ছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীজী যখন নিউইয়র্ক পৌঁছিলেন, তখন তিনি প্রচার-কার্যের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন। মিস্টার লিনেট ও মিসেস লিনেট স্বামীজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেইদিনই বৈকালে তাঁহারা ১৫০ মাইল দূরস্থ তাঁহাদের পল্লীভবন "রিজ্‌লে-ম্যানরে" স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দকে লইয়া গেলেন। অভেদানন্দও কয়েকদিন

পরে সেখানে আসিলেন। এখানে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হইয়াছিল। নিবেদিতাও সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সেখানে আসিয়া পেঁাছিলেন এবং ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত তাঁহারা সেখানে ছিলেন, তাহার পর নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সংগে লইয়া নিউইয়র্ক ফিরিয়া আসিলেন।

নিউইয়র্কের কাজ বেশ ভালই চলিতেছিল। স্বামী অভেদানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বেদান্ত সমিতির কাজ চালাইতেছিলেন এবং বেদান্ত সমিতির একটি নূতন গৃহও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দও স্বামী অভেদানন্দের সহিত বেদান্ত সমিতির কাজে যোগ দিলেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহারও প্রচারকার্যে বিশেষ খ্যাতি হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের 'শংকরাচার্য' সম্বন্ধে ১০ই ডিসেম্বর তারিখের প্রবন্ধ পাঠটিও সকলের প্রশংসা লাভ করিল। এইভাবে নবাগত স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

স্বামীজী এইভাবে তাঁহার পাশ্চাত্যের কার্যভার তাঁহার সহকর্মীদের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। আমেরিকায় তাঁহার অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত শিষ্য ও শিষ্যা আছেন, স্বামীজীর আগমনে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে দর্শনের জন্য দলে দলে নিউইয়র্ক আসিতে লাগিলেন, স্বামীজীও তাঁহাদের সংগে অনবরত ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন, নিজের দুর্বল শরীর ও ভগ্নস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না। নিউইয়র্কের কাছাকাছি বোস্টন, ডিউয়েট, ব্রুকলীন প্রভৃতি জায়গাগুলিও তিনি ঘুরিয়া আসিলেন।

এ যাত্রা যেন তাঁহার বিদায় গ্রহণের পরিভ্রমণ। তাঁহার অন্তরংগ ভক্তগণ তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যদিও উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু লোকসমাগম প্রতিরোধ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহারা সকলে স্বামীজীকে কিছুদিন কালিফোর্নিয়ায় গিয়া যাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কালিফোর্নিয়ার পথে বহু ভক্ত ও অনুরক্ত জনগণের অনুরোধে তাঁহাকে চিকাগোও নামিতে হইল। এখানে চিকাগোর অধিবাসিগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি কালিফোর্নিয়া যান।

কালিফোর্নিয়ায় স্বামীজী প্রায় সাত মাস ছিলেন। লস এঞ্জেলসে আসিয়া স্বামীজী মিসেস বোল্ডগেটের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড আগে হইতেই এখানে ছিলেন। এখানেও জনসমাগমের অন্ত রহিল না, বহু দূরস্থ নগর হইতেও স্বামীজীকে দেখিবার জন্য লোক আসিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর-সভাও যথারীতি আরম্ভ হইল। এখানে তাঁহাকে কয়েকটি বক্তৃতাও দিতে হইল। ৮ই ডিসেম্বর 'ব্ল্যাংকার্ড বুক' হলে তিনি 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বলিতে গেলে তাঁহাকে প্রতিদিনই লস এঞ্জেলসের কোন না কোন স্থানে বক্তৃতা দিতে

হইত, কিন্তু এত পরিশ্রমেও স্বামীজীর শরীর যে একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই তাহার একমাত্র কারণ এখানকার জলবায়ু স্বামীজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে ওকল্যান্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চের প্রধান ধর্মযাজক ডাক্তার বেঞ্জামিন মিলস্ মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে যান এবং সেখানকার চার্চে পর পর আটটি বক্তৃতা দেন। এই সময় রেভারেন্ড মিলস একটি ধর্ম-মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই এক নূতন ভাবের ও নূতন ধরনের ধর্মপ্রচার এবং যেন এক নূতন আলো তাঁদের মনের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াই এক নবরাজ্যের পথ প্রদর্শন করিতেছে। ডাক্তার বেঞ্জামিন নিজে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,

"A man of gigantic intellect indeed, one to whom our greatest university professors were as mere children."

(ইনি এমন একজন মহাশক্তিমান বুদ্ধিমান যাঁহার কাছে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকগণও শিশুমাত্র।)

ওকল্যাণ্ড হইতে স্বামীজী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি সানফ্রান্সিস্কোয় যান, এখানে স্বামীজী 'গোল্ডেন গেট হলে' 'সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ' নামে বক্তৃতাটি দেন। এই বক্তৃতা দিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

মার্চ মাসে স্বামীজী কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণের সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। এই সময় তিনি রাজযোগ সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিতেন। এই সব বক্তৃতা গুডউইন না থাকাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৮ই এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, সে পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ। সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হইয়া যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

"আমি ভাল আছি—মানসিক খুব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-সচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব করছি। লড়াইয়ে হারজিত দুই-ই হল— এখন পুঁটলী বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মোরা নইয়া—হে শিব, হে শিব! আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু!

"যতই যা' হোক, জো—, আমি এখন আগের সেই বালক বই আর কিছু নয়, যে বালক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক

হ'য়ে শ্নতো আর বিভোর হয়ে যেতো। এই বালক ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি, আর কাজকর্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছ্ তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছ্কালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র! আহা, আবার তাঁর সেই মধ্র বাণী শ্নতে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে—মান্ষের মায়া উড়ে যাচ্ছে—কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে তার জায়গায় প্রভুর সেই মধ্র গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন—'মৃতের সৎকার মৃতেরা কর্ক গে, তুই ওসব ছ্‌ঁড়ে ফেলে আমার পেছনে পেছনে চলে আয়!' যাই, প্রভু যাই!

"হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে অপার নির্বাণ-সম্দ্র দেখতে পাচ্ছি! সময় সময় তা' স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি—সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সম্দ্র! মায়ার এতট্কু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করে না।

"আমি যে জন্মেছিল্ম, তাতে আমি খ্সী আছি—এত যে দ্ঃখ ভুগেছি তাতেও খ্সী। জীবনে কখনো কখনো বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খ্সী। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সম্দ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি তাতেও খ্সী। × × × দেহটা গিয়েই আমাকে ম্ক্তি দিক্ অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মৃক্ত হই—সেই প্রাণো বিবেকানন্দ চলে গেছে—চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গ্র্, নেতা, আচার্য চলে গেছে, রয়েছে আগেকার সেই বালক—প্রভুর সেই চিরশিষ্য, তাঁরই চিরপদাশ্রিত দাস!

"অনেক দিন হল নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার অধিকার আমার নেই। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্প্র্ণর্পে গা ঢেলে থাকতুম, সেই সময়টাই আমার পরম মধ্ময় ম্হ্র্ত বলে মনে হয়, এখন আবার সেই রকম গা ভাসান দিয়েছি। উপরে দিবাকর নির্মল কিরণ ছড়াচ্ছে, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদে পরিপ্র্ণা হয়ে শোভা পাচ্ছেন—দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণীই এখন নিস্তব্ধ, স্থির শান্ত। আর আমি,—আমিও সেই সঙ্গে নিজের ইচ্ছা বিন্দ্মাত্রও না রেখে ধীরভাবে প্রভুর ইচ্ছার্প প্রবাহিণীর স্শীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এট্কু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার সাহস ও প্রবৃত্তি হচ্ছে না—পাছে প্রাণে এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়। × × × এর আগে আমার কর্মের ভিতরে মান যশের ভাবও উঠতো, আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যক্তিবিচারও আসতো, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকতো, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বের স্পৃহা আসতো। এখন সেসব উড়ে যাচ্ছে আর আমি সর্ববিষয়েই উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই মা,, যাই তোমার স্নেহের বক্ষে ধারণ করে—যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ,

অজ্ঞাত অদ্ভূত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর আমার দ্বিধা নাই।”

এই পত্রে তাঁহার তখনকার মনের ভাব স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, কিন্তু বাহিরের ব্যবহারে তাঁহার কোন ভাব পরিবর্তনই দেখা যায় নাই। তখনও তিনি আমেরিকা হইতে চলিয়া যাইবার আগে আমেরিকার প্রচারকার্য যাহাতে স্থায়ীভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

স্বামীজীর জীবনের শেষ অধ্যায়

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ক্যালিফোর্নিয়ার নানা স্থানে 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপিত হইতে লাগিল। এদিকে স্বামীজীর শিষ্যা মিসেস হেইনস্‌বোরা লস এঞ্জেলসের বেদান্ত ক্লাসগুলি চালাইতে লাগিলেন। লস এঞ্জেলস হইতে বার বার আহ্বান আসিলেও সানফ্রান্সিস্কোয় যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা ছাড়িয়া স্বামীজী অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না।

সানফ্রানসিস্কোর বেদান্ত সমিতি নূতন স্থাপিত হইয়াছে, সেটি যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু স্বামীজী আর বেশী দিন থাকিবেন না, সুতরাং নব-প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম এইচ লোগান এবং আরও কয়েকজন সমিতির সদস্য ও সদস্যা স্বামীজী যেন আর একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীকে এখানকার কার্য পরিচালনের জন্য আনিয়া দেন সেজন্য অনুরোধ করিলেন।

আমেরিকায় তখন স্বামী অভেদানন্দজী আগে হইতেই ছিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত আসিয়াছেন, ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইঁহারাই আছেন। অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভার তুরীয়ানন্দের হাতে দিয়া নিজে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেজন্য তাঁহাদের কাহারও সে সময় সানফ্রানসিস্কোয় আশা সম্ভব হইল না।

এই সময় ক্যালিফোর্নিয়াবাসিনী মিস্‌ মিনি সি বুক নাম্নী এক মহিলা একটি স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬০ একর জমি দান করেন। স্বামীজী দান গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ সেই জমিতে 'শান্তি আশ্রম' নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এপ্রিল মাস শেষ হইল, স্বামীজীর শরীর আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি "ক্যাম্প টেলর" পল্লীতে একটি পল্লীভবনে গেলেন, কিন্তু তিন সপ্তাহ পরেই আবার তাঁহাকে সানফ্রানসিস্কোয় ফিরিয়া আসিতে হইল। শরীর তখন এতই অসুস্থ যে, তাঁহার বক্তৃতা দিবার সামর্থ্য ছিল না। ডাক্তার উইলিয়ম ফস্টার নামে একজন সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এই চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি মে মাসের শেষের দিকে "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার" ব্যাখ্যা করিয়া পর পর চারটি বক্তৃতা দেন। যদিও স্বামীজী বেশী বক্তৃতা দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তবুও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার নিকট জনসমাগমের অবধি ছিল না এবং তিনি সকলের সহিতই আলাপ করিতেন। সেই মধুর আলাপে লোকে বিমুগ্ধ

হইয়া যাইত, হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নবদন স্বামীজীকে দেখিয়া কেহ বুঝিতেও পারিত না যে, তিনি কতখানি অসুস্থ।

সেই সময় স্বামীজীর সম্বন্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিদিনই নানাভাবে বর্ণনা থাকিত। "প্যাসিফিক বেদান্তিন" নামক পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য বাহির হইয়াছিল তাহার কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিলামঃ—

"স্বামীজী সুগভীর ভাবের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে স্পন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ভাবরাজি প্রলয়ের কাল পর্যন্ত সর্বদা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে। তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, কি বৃদ্ধ কি ভিক্ষুক, কি রাজা, ক্রীতদাস অথবা পতিতা নারী সকলেই সমান অধিকারে আলাপ করিতে পারে। তিনি বলেন,—ইহারা সকলেই এক পরিবারের অন্তর্গত; তিনি বলেন—আমি ইহাদের সকলের মধ্যেই আমার আমিত্ব দেখিতে পাই এবং আমার মধ্যেও আমি তাহাদের সকলের স্বরূপ অনুভব করি। এই পৃথিবী একই পরিবারসদৃশ, যুগান্তপূর্ব ব্যাপিয়া সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রেই বিরাজমান।"

মে মাসের শেষে স্বামীজী মিস্টার লিগেট ও তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা জুলাই মাসে লণ্ডন হইতে প্যারিসে যাইবেন, স্বামীজী যেন সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। প্যারিসে সে সময় যে ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল স্বামীজী তাহার একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যেন তিনি বৈদেশিক প্রতিনিধিরূপে সভায় যোগ দিয়া একটি বক্তৃতা দান করেন। বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমিক বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যবিষয়ক আলোচনাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

স্বামীজী প্যারিস যাইবেন বলিয়া ক্যালিফোর্নিয়া হইতে নিউইয়র্ক আসিলেন। নিউইয়র্ক আসিবার পথে চিকাগো ও ডেট্রয়েটে নামিয়াছিলেন।

নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির কাজ ভালভাবেই চলিতেছিল, বেদান্ত সমিতির প্রথম সভাপতি মিস্টার লিগেট পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল পারকার সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এপ্রিল মাস হইতে বেদান্ত সমিতিতে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন এবং যোগশিক্ষার ক্লাসও লইয়াছিলেন। স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে ক্যালিফোর্নিয়া যাইতে বলিলেন, কেননা, সেখানেই বিশেষ দরকার। তিনি নিজে এখানে প্রতি রবিবার 'গীতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

৩রা জুলাই স্বামীজী ডেট্রয়েটে যান এবং তুরীয়ানন্দ সেই দিন স্বামীজীর আশীর্বাদ লইয়া ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করেন।

২০শে জুলাই স্বামীজী প্যারিস যাত্রা করেন এবং প্যারিসে লিগেট দম্পতির গৃহে অবস্থান করেন।

এই সময় প্যারিসে বিরাট এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং ধর্মের

ইতিহাস সম্বন্ধীয় সভায় যোগ দিবার জন্য এবং প্রদর্শনীতে যোগ দিবার জন্য নানা দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী প্যারিসে সমবেত হইয়াছিলেন, ইঁহারা অনেকেই স্বামীজীর দর্শনের আশায় মিস্টার লিগেটের গৃহে সমবেত হইতেন।

স্বামীজী পরিব্রাজক নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ, মিস্টার লিগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত-ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃ-সংঘর্ষ-সমুত্থিত-চিন্তা-মতপ্রবাহ সকলকে দেশ-কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখতো।"

প্যারিসে ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যে সব আলোচনা হইয়াছিল স্বামীজী "ভাববার কথা" নামক পুস্তকে সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন। এখানে স্বামীজী দুটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতায় তিনি শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে ওপর্ট নামে একজন জার্মান পণ্ডিতের পঠিত প্রবন্ধের মত খণ্ডন করেন এবং দ্বিতীয় বক্তৃতায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন তত্ত্বসমূহের আলোচনা করেন। গ্রীক সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিল ইহাও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন।

প্যারিসে এই সময় তাঁহার বহু শিল্পী, পণ্ডিত, ধর্মযাজক ও অভিনেতা প্রভৃতির সহিত আলাপ ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত কামান-নির্মাতা হিরম্ ম্যাক্সিম্, গায়িকাশ্রেষ্ঠা ম্যাডাম ক্যালভে এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড প্রভৃতিও আছেন। আর আছেন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু। ইঁহার সম্বন্ধে স্বামীজীর "পরিব্রাজক" পুস্তকের গর্ব ও ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—"আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসরের এ প্যারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসব মহাপ্রদর্শনী। নানা-দেশ-দেশান্তবের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন আজ এ প্যারিসে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নামতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমাব জন্মভূমি!—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুদ্ধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভ-মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক যুব যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন, সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী—বঙ্গবাসী! ধন্য বীর!

বসুজ ও তাঁর সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। ধন্য দম্পতি!"

এই কথাগুলির মধ্য দিয়াই স্বামীজীর মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় গরিমাদীপ্ত মূর্তিটি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। অপূর্ব এক স্বদেশপ্রেম! অল্প কিছুদিন পূর্বে মিস ম্যাক্লিয়ডকে লিখিত পত্রে স্বামীজীর যে রূপ আমরা দেখিয়াছি এ মূর্তিটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এই মূর্তিটিই আমরা তাঁহার টুকরো টুকরো নানা কথার মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। নিবেদিতা লিখিতেছেন, "বাল্যকালে শের শা বাংলার রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করতেন" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন আজও তাহা আমার মনে পড়ে। "এই শের শা, যিনি দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বে ত্রিশ বৎসরব্যাপী এক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা, ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত এবং সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন--এ সমস্তই করেছিলেন। আবার কর্সিকা দ্বীপের দক্ষিণ উপকূল জাহাজ থেকে যখন চোখে পড়লো, তখন স্বামীজী সসম্ভ্রমে অতি মৃদুস্বরে বললেন, এই সেই সংগ্রাম-দেবতার জন্মভূমি।"

নিবেদিতা লিখেছেন, "জিব্রালটার প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমি প্রাতঃকালে ডেকের উপর আসিতেই তিনি আমাকে সাগ্রহে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, 'তুমি তাদের দেখেছ কি? তাদের দেখেছ কি? ওখানে জাহাজ থেকে নামছে আর 'দীন! দীন!' রবে গগন ফাটাচ্ছে।' এই বলিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া তিনি মুরেদিগের বার বার স্পেন আক্রমণের জ্বলন্ত বর্ণনার দ্বারা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।"

ছোট ছোট কাজ, ছোট একটি কথাও তিনি মনের অনুভূতির পাত্রে কিভাবে চিরন্তন করিয়া রাখিতেন স্বামীজীর জীবনকাহিনীতে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, ক্ষৌরকার উপালির কথা "আমি ক্ষৌরকার, নির্বাণ আমার মত লোকের জন্যও।" অথবা খেতরির রাজার হাত কাঁটা গাছের কাঁটায় যখন রক্ত পড়িতেছিল, সেটা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই না আনিয়া স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, "আপনার গায়ে না আঘাত লাগে সেইটাই তো আমাকে দেখতে হবে; আমরা ক্ষত্রিয়, আমরাই তো ধর্মের রক্ষক।"

যেখানে ব্যক্তির মধ্য দিয়া অথবা সমগ্র জাতির বা সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া মহান শক্তির ও মহান ত্যাগের বিকাশ হইয়াছে স্বামীজী সেইখানেই ভাবে অভিভূত হইয়াছেন, যেন সেই শক্তির বা সেই মহান ভাবের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন।

স্বামীজী প্যারিসে প্রায় তিন মাস ছিলেন, ২৪শে অক্টোবর তিনি ভিয়েনায় রওনা হন। কামান-নির্মাতা ম্যাকসিম সাহেব তাঁহাকে যে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন সেই পরিচয়পত্রের দ্বারা ভিয়েনায় অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে

তাঁহার পরিচয় হইল। কিন্তু তিনি বা তাঁহার সঙ্গী পাদ্রী লয়সন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিবার অধিকার পান নাই।

কনস্টাণ্টিনোপল, এথেন্স এবং সেখান হইতে কায়রো—স্বামীজী প্রত্যেক স্থানেই ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি নিয়া আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন এবং এগুলি যেন তাঁহার অনেক দিনের চর্চা-করা বিষয়, এইভাবেই তিনি কথাবার্তা বলিতেন।

মিশরে আসিবার পর তিনি মায়াবতী হইতে মিস্টার সেভিয়ারের দেহান্তরের সংবাদ পাইলেন। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম সেভিয়ারই প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিচালনার ভারও তাঁহার উপর ছিল। এই সংবাদ পাইয়াই স্বামীজী কায়রো হইতে ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য জাহাজে উঠিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠের সাধুরা রাত্রের আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বাগানের মালী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের কাছে গেট খুলিবার জন্য চাবি চাহিল। সে বলিল, গাড়ি করিয়া একজন সাহেব আসিয়াছেন, তিনি মঠে ঢুকিতে চাহিতেছেন। মঠের সাধুরা তাড়াতাড়ি গিয়া গেট খুলিলেন। দেখিলেন, গেটের সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু আরোহী নামিয়া গিয়াছেন। "সাহেবটি গেলেন কোথায়?" ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ। সাহেবের পোশাক-পরা, মুখের উপর টুপিটা একটু নামাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চিনিতে দেরি হইল না।

স্বামীজী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন বলিলেন, "গেট খোলা না হতেই কি করে এখানে এলুম তাই ভাবছিস? পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছি। খাবার ঘণ্টা পড়েছে শুনতে পেলাম, তাই ফটক খোলার জন্য দেরি না করে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে চলে এলম। ভাবলাম, দেরি করলে হয়তো কপালে খাবার জুটবে না।"

অনেক দিন পরে সেদিন খাবার ঘর আনন্দ-কলরবে পরিপূর্ণ হইল। সকল গুরুভাই একত্রে খিচুড়ি খাইতে বসিলেন।

বেলুড় মঠে আসিয়া কয়েক দিন মাত্র থাকিয়া ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজী মায়াবতী যাত্রা করিবেন। এই মায়াবতী আশ্রম তাঁহার বড় আদরের স্থান। হিমালয়ের এক নিভৃত স্থানে আশ্রম করিবেন এ কল্পনা তাঁর অনেক দিন আগেই মাথায় আসিয়াছিল, কর্নেল সেভিয়ার সে কল্পনা বাস্তবে পূর্ণ করিবার জন্য স্বামীজীর সহায় হইয়াছিল। গুডউইন চলিয়া গিয়াছেন, সেভিয়ারও চলিয়া গেলেন। প্রবুদ্ধ ভারত মায়াবতী হইতেই বাহির হইতেছিল। স্বরূপানন্দজী তাঁহার সম্পাদনার ভার লইয়া আছেন এবং সেভিয়ারের অভাবেও যাহাতে আশ্রম ও পত্রিকাটি যথারীতি পরিচালিত হয় সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন। স্বামীজী ইহা দেখিয়া খুশী হইলেন।

সেভিয়ার দম্পতি ভগবানের কার্যে একত্রেই আত্মসমর্পণ করিয়া দেশ ও

বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আজ মিসেস সেভিয়ার তাঁহার চিরদিনের সঙ্গীকে হারাইয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার কোন চেষ্টা না করিয়া নীরবে তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষের দৃষ্টিতে যে নীরব সান্ত্বনা ছিল সে দিকে চাহিয়া মিসেস সেভিয়ার নিজের শোকের কথা ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বামীজী, আপনার শরীর যে একেবারেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে।" স্বামীজী শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "সত্যই আমার দেহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক এখনও আগের মতই সবল ও কার্যক্ষম আছে।"

মায়াবতীর আশ্রমের নাম অদ্বৈত আশ্রম। কিন্তু আশ্রমের কয়েকজন সাধু একটি ঘরকে ঠাকুরঘর করিয়া সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঐ প্রতিমূর্তির নিত্যপূজা করা হইত এবং ভোগরাগ দেওয়া হইত। স্বামীজী আগেই বলিয়াছিলেন যে, আশ্রমের নাম যখন অদ্বৈত আশ্রম, তখন এখানে যেন ঐ রকম পূজার বাহ্যানুষ্ঠান করা না হয়। স্বামীজী কোনদিনই এ ভাবের পূজা অর্চনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বার বার বলিয়াছেন, "ঠাকুরের নির্দেশ পালন করিয়া চলাই তাঁহার প্রকৃত পূজা।" এখানে এইভাবে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের বারণ করিলেন না। কেবল বলিলেন, "যাঁহারা দ্বৈতভাবে উপাসনাই পছন্দ করেন অদ্বৈত আশ্রম তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান নয়।" স্বামীজীর অনিচ্ছা বুঝিয়া মিসেস সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দ ঠাকুরের মূর্তিপূজা ও ভোগদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন একজন সাধু শ্রীশ্রীমাঠাকুরানীর কাছে জানাইয়া ঠাকুরের নিত্যসেবা বন্ধ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাঠাকুরানী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর নিজেই তো অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি অদ্বৈত মতেই সাধনা করেছেন, তাঁর শিষ্যেরা এক দিক দিয়া সকলেই তো অদ্বৈতবাদী, তবে তুমি অদ্বৈতভাবে সাধনায় দুঃখিত হয়েছ কেন?"

শ্রীমার এই কথায় সাধুটির সন্দেহ দূর হইয়া গেল। এর পর স্বামীজী বেলুড়ের মঠে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা ছিল যে, অন্তত আমাদের একটি এমন মঠ থাকবে যেখানে এইভাবে পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান থাকবে না। কিন্তু মায়াবতী গিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধ সেখানেও আসন গেড়ে বসে আছেন, ভাল—ভাল।" (বৃদ্ধ অর্থাৎ পূজা-অর্চনা সম্বন্ধে চিরদিনের সংস্কার)।

কিন্তু আমরা ইহাও দেখিতে পাই, স্বামীজী অমরনাথে গিয়া তীর্থযাত্রার সবগুলি নিয়মই পালন করিতেছেন; আর্দ্রবস্ত্রে পঞ্চকুণ্ডে স্নান, উপবাস, এমনকি মালাজপা পর্যন্ত বাদ দেন নাই। ক্ষীরভবানীতে প্রতিদিন নিজে হাতে পায়স রাঁধিয়া কুণ্ডে ভোগ দিয়াছেন এবং উপবাস প্রভৃতি পূজার কোন অনুষ্ঠানই অসমাপ্ত রাখেন নাই।

মায়াবতীতে থাকিবার সময় স্বামীজীর এক মুহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। প্রত্যহ রাশি রাশি পত্রের উত্তর দিতে হইত। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার জন্য

প্রবন্ধও লিখিতেন। "আর্য ও তামিল", "সামাজিক সভায় মিঃ রানাডের অভিভাষণের সমালোচনা" এবং "থিয়সফি সম্বন্ধে মন্তব্য" এই তিনটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ সে সময় তিনি প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য লিখিয়াছিলেন।

হিমালয় পাহাড়ে তখন অনবরত তুষারপাত হইতেছে। স্বামীজীকে সেজন্য মায়াবতীতে ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়াই থাকিতে হইত। শীতও অত্যন্ত প্রবল। এই বন্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়াই স্বামীজী তাঁহার কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। মঠের অধিবাসিগণকে শিক্ষা দিতেছেন, ভবিষ্যতে কিভাবে কাজ চালাইতে হইবে তাঁহাদের সে বিষয়েও পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী স্বামীজী মায়াবতী হইতে বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার কয়েক দিন পরেই তিনি বেলুড় মঠের সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রেজেস্ট্রি করিয়া দেন।

এই দলিলে সাক্ষী ছিলেন--

(১) সলিসিটর প্রমথচন্দ্র কর (কলিকাতা)

(২) ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম বি

(৩) ত্রৈলক্যনাথ চ্যাটার্জি (কলিকাতা ৪নং হেম করের লেন)

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার সময় হাওড়ার সদর রেজেস্ট্রি অফিস হইতে এই দলিল রেজেস্ট্রি করা হয়। রেজিস্ট্রার ছিলেন রমেন্দ্রলাল মিত্র, স্পেশ্যাল সাবরেজিস্ট্রার।

এই দলিলে বেলুড় মঠের সীমা এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। কিভাবে এই সম্পত্তি প্রযুক্ত হইবে তাহারও দফাদারীভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

স্বামীজী স্বামী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে ইতিপূর্বে ঢাকায় প্রচার-কার্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে স্বামীজীকে বার বার আহ্বান করিতে লাগিলেন কিভাবে তাঁহাদের কাজ চলিতেছে তা একবার দেখিয়া আসিবার জন্য।

এদিকে আবার বুধাষ্টমী আসিয়া গিয়াছে। এই বুধাষ্টমী তিথিতে নারায়ণগঞ্জ লাঙ্গলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নানের একটি যোগ আছে, সেই যোগে ব্রহ্মপুত্র স্নানে কোটি কোটি বৎসরের পাপ মোচন হয়। স্বামীজীর জননী ভুবনেশ্বরী দেবী এই সময় ব্রহ্মপুত্র স্নান করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া স্বামীজীকে সে বিষয়ে জানাইয়াছিলেন। জননীর ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিনীবৃন্দ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন।

স্বামীজী ঢাকায় আসিতেছেন, এই সংবাদ আগেই পৌঁছিয়াছিল এবং একটি অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হইয়াছিল। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমার নারাযণগঞ্জে পৌঁছিবামাত্র দেখা গেল যে, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন। সেখান হইতে সকলে ট্রেনে আরোহণ করিয়া বৈকালে ঢাকায় গিয়া পৌঁছিলেন। স্টেশনে ঢাকার বিখ্যাত উকীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ

স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং স্টেশন জনাকীর্ণ হইয়াছিল। ঘন ঘন "জয় রামকৃষ্ণ," "স্বামী বিবেকানন্দের জয়" ধ্বনি উঠিতেছিল। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সকলে স্বামীজীকে ও তাঁহার সঙ্গের সকলকে জমিদারবাবু মোহিনীমোহন দাসের বাড়ি লইয়া গেলেন।

ইহার পর লাঙলবন্দে ব্রহ্মপুত্র স্নানের পর সকলে আবার ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। ঢাকার ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বিগণের সে সময় বিশেষভাবেই প্রচারকার্য চলিতেছিল। ব্রাহ্মগণের ভিতর আবার সাধারণ, নববিধান এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দল প্রভৃতি বিভিন্ন মতের ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বামীজী ঢাকায় আসিলে ঢাকার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনার জন্য আসিতেন, ইঁহাদের সকলের অনুরোধে স্বামীজী পোগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণে দুটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতাটি "আমি কি শিখিয়াছি?" এবং দ্বিতীয় বক্তৃতাটি "আমার জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম"। ঢাকার একটি স্কুলের প্রকাণ্ড উঠানে এই শেষের বক্তৃতাটি দেওয়া হইয়াছিল। এই দুটি বক্তৃতাতেই স্বামীজী ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মপ্রচাব প্রণালীর তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ব্রাহ্মধর্মের সমাজ-সংস্কারক নামে অভিহিত প্রচারক সম্প্রদায় কিভাবে নিজের দেশকে ও জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিভাবে ধর্মের মধ্য দিয়া বিদেশের ভাব নিজের দেশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, "মূর্তিপূজা" কথাটির ধুয়া তুলিয়া কিভাবে নিজের দেশবাসিগণকে "পৌত্তলিক" আখ্যায় অভিহিত করিতেছেন, সে সম্বন্ধে যখন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার একটি কথারও কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। স্বামীজী যখন বলিলেন, "এই যে মূর্তিপূজা--ইহার ভিতরে নানারকম জঘন্য ভাবও হয়তো কোন কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তবু আমি উহার নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম? যে সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁদেব আমি বলি, -"ভাই, তুমি যদি নিরাকার-উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তবে তাহা কর,--কিন্তু অন্যকে গালাগালি দাও কেন? 'সংস্কার' কথাটির অর্থ পুরাতন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কার করা, জীর্ণ সংস্কার হইয়া গেলে আর তার প্রয়োজন কি? সংস্কারক দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক্। কিন্তু ভাই, তোমরা নিজেদের পৃথক্ করিতে চাও কেন? 'হিন্দু' নাম নিতে লজ্জা পাও কেন?"

প্রত্যেক ধর্মাচরণেই নানা বাহিরের আচার ও অনুষ্ঠান আছে, আরও আছে প্রথা এবং সংস্কার। কতকগুলি হিন্দুধর্মের প্রচারক পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া সেই প্রথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সেগুলি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, স্বামীজী তাঁহাদের সহিত একমত ছিলেন না। কিন্তু অন্যভাবে তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেমন বিবাহিতা নারীর আয়তির-

প্রতীকের প্রতি একটা গভীরতম সংস্কার। গুরুজনগণ কন্যাকে আশীর্বাদ করেন, "বৎসে, তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।" স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রে জাহাজে থাকার সময় একজন পাদরী তাঁহাকে কতকগুলি রূপার বালা দেখাইয়াছিলেন। ঐ বালাগুলি বিবাহিতা তামিল নারীদের সধবার চিহ্নস্বরূপ। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নের জন্য সেই বালাগুলিও তাহাদের বিক্রি করিতে হইয়াছে। এই সময় এই বিবাহের চিহ্ন ধারণ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরাও এই কুসংস্কার মানিয়া চলে, তারাও বিবাহের আংটি খুলিয়া দিতে আপত্তি করে—এই কুসংস্কারের কথা লইয়া বোধহয় কিছু বিদ্রূপও হইয়াছিল। নিবেদিতা লিখিতেছেন—শুনিয়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে খেদপূর্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা ওটাকে কুসংস্কার বলছো? ওর পেছনে যে উঁচুদরের সতীত্বের আদর্শ রয়েছে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?"

ঢাকায় স্বামীজীর থাকার সময় আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। একটি পতিতা মেয়ে, সম্ভবত সে নাচনেওয়ালী, তাহার মাকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। মেয়েটির সর্বাঙ্গে গহনা। তাহারা যখন ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিল, তখন বাহিরে যেসব ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা এরকম মেয়েকে স্বামীজীর কাছে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিলেন, পরে স্বামীজীকে খবর দিলে স্বামীজী তাহাদের লইয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে হাতজোড় করিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীজী যখন বলিলেন, "দাঁড়িয়ে আছেন কেন মা, বসুন" তখন মেয়েটির মা সাহস পাইয়া স্বামীজীকে তাহার প্রার্থনা জানাইল। তাহার মেয়ে হাঁপানীতে ভুগিতেছে, যদি স্বামীজী কোন ঔষধ দেন, আর আশীর্বাদ করেন যেন অসুখটা ভাল হইয়া যায়, সেইজন্য তাহারা আসিয়াছে। স্বামীজী দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তোমার অসুখ সারিয়ে দিতাম। কিন্তু দেখ, আমি নিজেই হাঁপানীতে ভুগছি, নিজের অসুখই ভাল করতে পারি না। তোমরা যদি আশীর্বাদ পেলে খুশি হও, আমি আশীর্বাদ করছি, যেন তোমার অসুখ সেরে যায়।" সেই আশীর্বাদ পাইয়াই তাহারা খুশি হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

পতিতাদের সম্বন্ধে এই যে করুণা এটি তাঁহার বরাবরের স্বভাব। বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে নিজের জীবনীতে স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, স্বামীজী কিভাবে তাঁহার সাক্ষাৎ মাত্র তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার মানসিক অবসাদ দূর করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর সহিত তিনি তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মিশরের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন, "একদিন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। × × একটি অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময়

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কতকগুলি অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝুঁকিয়া আছে, কেহ কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা করিতেছে। স্বামীজী প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। একটি ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা কয়েকটি নারী উচ্চহাস্যে তাঁহাকে আহ্বান করার সংগে সংগে তাহাদের উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পড়িল। আমাদের দলের একজন মহিলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ কবিবার জন্য উদ্যত হইলেন, স্বামীজী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই নারীগণের সম্মুখীন হইলেন।

স্বামীজী বলিলেন, "হায় হতভাগ্য সন্তানগণ! বেচারীরা তাদের রূপের উপাসনায় ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে। আহা, এদের দিকে চেয়ে দেখ!" পতিতা নারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান যীশুখৃষ্টের মতই স্বামীজীর চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, নারীগণ নির্বাক ও লজ্জিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল। একজন নারী অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচ্ছদ প্রান্ত চুম্বন করিয়া গদগদকণ্ঠে স্পেনীয় ভাষায় বলিতে লাগিল—

Hombre de Dios—

Hombre de Dios—

(ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ)। অপর একটি নারী বিস্মিত সম্ভ্রমে দুই হাত দিয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, যেন স্বামীজীর সেই দৃষ্টি সে সহ্য করিতে পারিতেছে না।"

দক্ষিণেশ্বরে দেবী-দর্শনে পতিতা নারীগণের ভিড় হয় বলিয়া একজন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এখানেও ওদের জটলা! আমাদের আর দক্ষিণেশ্বরে আসা চল্‌বে না দেখ্‌ছি।" স্বামীজী শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরা তবে কোথায় যাবে?"

স্বামীজী বলিলেন বটে যে, তাঁরও হাঁপানি, কিন্তু তাঁর সেটা হাঁপানি নয়, হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধির জন্য শ্বাসকষ্ট। কাশ্মীরে অমরনাথে তাঁহার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইতে যাইতে আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং চিরদিনের জন্যই এই বিবৃদ্ধি রহিয়া গিয়াছিল।

ঢাকায় অনেক গোঁড়া হিন্দুও আছেন, স্বামীজী সকলের ছোঁয়া খান, ইহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামীজী হাসিতে হাসিতে তাহাদের একজনকে বলিয়াছিলেন, "বাবু, আমি ফকির, ভিখ্‌ মেগে খাই। আমার মাধুকরী করে সকলের বাড়ি থেকেই খাবার সংগ্রহ করতে হবে। শাস্ত্রেও আছে, সন্ন্যাসীর কোন জাত-বিচার নাই।"

স্বামীজী নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগে যাইবেন, একথা নাগ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। নাগমহাশয় সেকথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাই স্বামীজী সেই কথা রক্ষা করিতে ঢাকা হইতে দেওভোগ গেলেন, কিন্তু নাগ মহাশয় নাই, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেওভোগে পুকুরে স্নান, সাঁতার কাটা—অনেকদিন পরে যেন স্কুল-পালানো ছেলের মত ছাড়া পাইলেন স্বামীজী।

নাগমহাশয়ের সহধর্মিণী নানারকম সুখাদ্য রাঁধিয়া পরিবেশন করিলেন। কিন্তু নাগমহাশয়ের অভাবে দেওভোগ যেন কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবন। নাগমহাশয়ের স্ত্রী স্বামীজীকে একখানি কাপড় দিলেন। সেইখানি স্বামীজী মাথায় জড়াইয়া লইলেন।

স্বামীজী ইহার পর চন্দ্রনাথ তীর্থ ও কামাখ্যা দর্শন করিয়া গৌহাটি ও গোয়ালপাড়া হইয়া শিলং গেলেন।

সার হেনরী কটন ছিলেন তখন আসামের চীফ কমিশনার। ইনি একজন প্রকৃত ভারতহিতৈষী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। স্বামীজীর উপর তাঁহার আগে হইতেই শ্রদ্ধা ছিল, এখন স্বামীজী শিলংএ আসিতেছেন জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কটন সাহেব নিজেই স্বামীজীর বাঙলোয় আসিয়া তাঁহার সংগে দেখা করিলেন এবং কটন সাহেবের অনুরোধে স্বামীজী শিলংএ একটি বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। কিন্তু শর্টহ্যাণ্ডের ব্যবস্থা না থাকায় সে সমস্ত বক্তৃতাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শিলংএ স্বামীজীর শ্বাসকষ্ট বাড়িয়াই গেল, এক একদিন রাত্রে এতই শ্বাসকষ্ট হইত যে, মনে হইত এই মুহূর্তেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। শুইতে পারিতেন না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতে হইত। একদিন রাত্রিকালে যন্ত্রণা যখন সহ্যসীমার অতীত হইয়াছে, তখন স্বামীজী যে তরুণ ব্রহ্মচারী তাঁহার মাথা দুই হাতে ধরিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস, কেন অত অধীর হইতেছ? আমি যে দুঃখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

হয়তো সেই তরুণ শিষ্যের ঐকান্তিক প্রার্থনায় যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল এবং সেই দারুণ রাত্রিও প্রভাত হইল।

আসাম হইতে স্বামীজী বেলুড় মঠে ফিরিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে সে-বার প্রথম দুর্গাপূজা হইল। স্বামীজী তখন খুবই অসুস্থ, ডায়েবিটিস বাড়িয়াছে, পা দুটি ফুলিয়াছে। কিন্তু তবুও দুর্গাপূজার বাধা হইল না। মঠের সামনে গংগাতীরে বসিয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামী যেন একটি দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন—মা দুর্গা যেন দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছেন। বেলুড় মঠ আসিতে হইলে গংগা পার হইয়া আসিতে হয় তাই তিনি গংগার উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া বেলুড় মঠের বেলতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজীও বলিলেন যে, তিনি ভাবচক্ষে দেখেছেন, বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা হইতেছে। স্বামীজী শ্রীশ্রীমার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন যে, তাঁহার নামেই সংকল্প করিয়া পূজা হইবে। মা অনুমতি দিলেন এবং সংগে সংগে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল।

স্বামীজী অসুস্থ, ব্রহ্মানন্দ স্বামীই সমস্ত ভার লইলেন। কুমারটুলি হইতে নৌকায় করিয়া প্রতিমা আনা হইল। মা দুর্গা গংগাপার হইয়াই বেলুড়মঠে আসিলেন। সপ্তমীর আগের দিন শ্রীশ্রীমাও বাগবাজার হইতে

বেলুড়ে আসিলেন। সন্ন্যাসীর পূজার অধিকার নাই, তাই মায়ের অনুমতিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজকের আসন গ্রহণ করিলেন এবং তন্ত্রোক্ত মতে পূজা হইবে, এজন্য স্বামীজীর আদেশে আগেই শিষ্য শরচ্চন্দ্র রঘুনন্দনের একখানি অষ্টবিংশতি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কৌল ও তন্ত্রবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মায়ের অভিমত নাই বলিয়া পূজায় কোন পশু-বলিদান হইল না।

যদিও তখন বেলুড়মঠের এখনকার দিনের মত আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না; কিন্তু পূজায় তিনদিন প্রসাদ বিতরণ যথারীতি হইয়াছিল, সে তিনদিন বালী, উত্তরপাড়া ও বেলুড়ের দরিদ্রগণ পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও অনেক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া পূজায় যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহার পর লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজাও যথারীতি সম্পন্ন হইল।

দুর্গাপূজার পর ঠাকুর বিসর্জন দিবার জন্য নৌকায় করিয়া যখন ঠাকুর লইয়া যাওয়া হইল, তখন ব্রহ্মানন্দ স্বামী ভাবাবেশে প্রতিমার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন, স্বামীজী মঠের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সেই নৃত্য দেখিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের সমস্ত লোক, যাহারা বিসর্জন দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।

স্বামীজীর মা ছেলেবেলায় স্বামীজীর যখন একবার কঠিন অসুখ হয়, তখন মানত করিয়াছিলেন, কালীঘাটে ছেলেকে লইয়া গিয়া, মা কালীর বিশেষ পূজা দিবেন। এতদিন সে মানত শোধ করা হয় নাই। এখন স্বামীজীর অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহার সেই মানতের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি স্বামীজীকে খবর পাঠাইয়া দিলেন যে, মায়ের মানত শোধ দিতে হইবে। মায়ের আদেশে স্বামীজী অসুস্থ শরীরেই মানত শোধ করিবার জন্য কালীঘাটে গেলেন। আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ, তারপর মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীশ্রীকালীর পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেওয়া, তাহার পর নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বের চত্তরে হোম করা—মানতের এই সমস্ত নিয়মগুলিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন স্বামীজী এবং মঠে ফিরিয়া বলিলেন,—"কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব রয়েছে। আমাকে বিলাত-ফেরৎ জেনেও হালদারেরা মায়ের মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেন নি, বরং আগ্রহের সঙ্গেই পূজার কাজে ও হোমের কাজে সাহায্য করেছেন।"

অক্টোবর মাসে স্বামীজীকে বিছানা লইতে হইল। ডাক্তার সাণ্ডার্স তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন, স্বামীজীর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তাই এখন কিছুদিনের জন্য তাঁহার আগন্তুকগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করা হইল। স্বামীজী এতে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলিলেন। কাজ না করিয়া যিনি এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে ইহা একটা দারুণ শাস্তি। সকাল ও সন্ধ্যায় বেদমন্ত্র আবৃত্তি করেন, কখনও বা গুরুভ্রাতাদের সহিত হাস্য-কৌতুক করেন, আবার

কখনও বা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকেন।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি যে এত অসুস্থ, তা যেন বোঝাই যায় না। তরুণ সাধুদের কাছে মহাবীরের মহিমা কীর্তন করেন। রামময় জীবন মহাবীর হনুমান, অপরদিকে দাস্য ও সেবার পরাকাষ্ঠা, আবার অন্যদিকে সাগর লঙ্ঘনেও দ্বিধা নাই। গন্ধমাদন আনিতে হইবে তো পাহাড়টিই কাঁধে করিয়া লইয়া আসিলেন। মহাবীর, মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাসাধক।

'মানুষ গড়া' স্বামীজীর আজীবনের সাধনা। ছেলেরা হোক তেজীয়ান, সাহসী এবং জিতেন্দ্রিয়। মেয়েরা হোক্ অপারকরুণাময়ী মাতৃমূর্তি এবং মহাতেজস্বিনী। একথাও বলিয়াছেন, "কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুসরণ করতে গিয়ে দেশটা তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখ্‌বি খোলকর্তার বাজ্‌ছে। ঢাক-ঢোল কি দেশে আর তৈরিই হয় না? তুরি-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ছেলেবেলা থেকেই করুণ রস আর মেয়েমানুষী বাজনা শুনে শুনে সমস্ত দেশটাই যে মেয়েমানুষ হয়ে গেল? এর চেয়ে আর কি অধঃপতন হবে? কবি-কল্পনাও যে দেশের এ অবস্থা আঁকতে হার মেনে যায়? এখন কিছুদিনের মত এসব কোমল ভাব-উদ্দীপক গীতবাদ্য বন্ধ রাখতে হবে, খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গানে লোকের কানকে অভ্যস্ত করতে হবে। ডমরু-শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্ম-রুদ্র তালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। "মহাবীর, মহাবীর!" "হর হর" "ব্যোম্ ব্যোম্" শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত কর্তে হবে"

'আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রু-জল-পান,
প্রাণপণ যাক্ কায়া।

—শোনাতে হবে সিন্ধুর ভীম-গর্জন, নদীর কুল কুল তান বন্ধ থাকুক কিছুদিন।'

১৯০১ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের নানা দেশ হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছেন কলিকাতায়, তাঁহাদের অনেকেই স্বামীজীর সহিত আলাপ করিবার জন্য বেলুড়মঠে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, স্বামীজীই নব্য ভারতের পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের একজন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার মত কি?" স্বামীজী স্বল্প কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, "সমগ্র ভারতে একতা প্রতিষ্ঠা হয়, এমন একটা প্রতিষ্ঠান অবশ্য আবশ্যক।"

স্বামীজী তাঁহাদের সহিত হিন্দীতেই কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। 'অ্যাডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন, "তাঁর কথিত হিন্দীভাষা যে কোন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসীকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত। যখন তিনি ভারতের পুনরুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহার মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।"

কলিকাতায় একটি বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধেই স্বামীজী বিশেষ

করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন দেশের পক্ষে কতখানি প্রয়োজন, তিনি মর্মে মর্মে তা' অনুভব করিতেন। কিন্তু বেদ-বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিতে প্রথমেই চাই প্রচুর টাকা, তারপরে চাই চরিত্রবান বলিষ্ঠমন ধর্মশীল বেদজ্ঞ অধ্যাপক, অন্তত কয়েকজন অধ্যাপকও প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আর্য-আদর্শ অনুসারে আচার্য, প্রচারক ও সন্ন্যাসী গড়িয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত সন্ন্যাসী গড়িয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া অন্তত অল্পসংখ্যক কয়েকজনকেও সুশিক্ষিত ও একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে গড়িয়া তোলা হইবে। কংগ্রেসের বিদেশের প্রতিনিধিগণ অনেকেই এইরূপ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের দিক দিয়া সে প্রতিশ্রুতির কোন সফলতা দেখা যায় নাই।

স্বামীজী জানিতেন, তাঁহার সময় অতি সংক্ষেপ, তাই মঠের ভিতরেই ছোট করিয়া একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং আংশিকভাবে তাঁহার সে ইচ্ছা কতকটা পরিপূর্ণও হইয়াছিল।

স্বামীজীর শেষবার ভ্রমণ বুদ্ধগয়ায় যাত্রা। তিনি ইতিমধ্যে জাপানে যাইবারও ইচ্ছা করিয়াছিলেন। জাপান হইতে দুইজন পণ্ডিত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে ককজাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বান করিবার বিষয়ে স্বামীজীর উপদেশ লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাক্তার ওকাকুরা। সভ্যতার দিক দিয়া জাপান কিভাবে অগ্রগামী হইয়াছে, স্বামীজী তাহা নিজের চোখেই দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই জাপান ধর্মভাবের দিক দিয়া অগ্রসর হইবার পথে আগুয়ান হইবার জন্য তাঁহারই সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে। তিনি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পরেন? তাই তিনি নিজের শরীরের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া জাপানে যাইবার জন্য তৈরী হইতে চাহিলেন।

কিন্তু সময় ছিল না, জাপান যাওয়া তাঁহার হয় নাই। তবে বৌদ্ধগয়ায় শেষবারের মত গিয়াছিলেন ওকাকুরার আমন্ত্রণে। আসিবার সময় কিছুদিন কাশীতেও থাকিয়াছিলেন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য।

ভগিনী নিবেদিতার কাছে তিনি বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দৃশ্য যেভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি। "সেই আনন্দময় পুরুষ সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া মৃত্যু-প্রতিক্ষা করছিলেন। এমন সময় সহসা এক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহার কাছে দৌড়িয়া আসিল।......তাঁহার শিষ্যেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভগবান দূর হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরিয়ে দিও না। তথাগত সদাই প্রস্তুত আছেন।" তখনই তিনি কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন।" এই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঠিবার কথা বলিতে গিয়া স্বামীজী একটু সময়ের জন্য

থামিয়াছিলেন, আর তাহার পর বলিয়াছিলেন—"দেখ, ওটি আমি পরমহংসদেবের জীবনে স্বচক্ষে দেখেছি।"

পুরুষসিংহ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণও সেই একই ভাবের দ্যোতক। দেহকে যিনি কোনদিনই গ্রাহ্য করেন নাই, দৈহিক পীড়া ও বিলয় তাঁহার কাছে তো উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নয়।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মগ্রহণের দিন এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। ৩৯ বৎসর কয়েক মাস মাত্র তাঁহার এই পৃথিবীতে জীবন যাপনের দিন।

তাঁহার কন্যাসমা শিষ্যা নিবেদিতার তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, "ঈশ্বর করুন যেন আমাদের আচার্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও আমাদিগকে যাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট শুধু একটা স্মরণীয় বস্তু না হইয়া চিরকাল জ্বলন্ত-জাগ্রত-ভাবে সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

স্বামীজীর অন্তর্ধান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে এক সর্বধ্বংসী ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের তুল্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ-মিশন-তরণী ডুবিল না, হাল ধরিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরেব মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনকাহিনী অতি বিচিত্র। ১২৬৯ সালের ৮ই মাঘ তাঁহাব জন্ম হয। চব্বিশ পরগণার শিকরা কুলীনগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান, পিতা হারাণচন্দ্র ছিলেন পল্লীগ্রামেব প্রতাপশালী জমিদার। পিতাব তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অল্প বয়সে মাতৃহীন বলিয়া বিশেষ আদরের পাত্র ছিলেন। পিতা দ্বিতীয়-বার যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সেই বিমাতাও তাঁহাকে ছেলের মতই ভালবাসিতেন।

অল্প বযসেই তাঁহার বিবাহ হয়, বধূ বিশ্বেশ্বরী অতি মধুরস্বভাবা সরলা বালিকা। তাঁহাদের একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছিল। কিন্তু এ বন্ধনও তাঁহার ভগবৎ-প্রাপ্তি উন্মুখ মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই।

তাঁহাব পারিবারিক জীবনে নাম ছিল রাখালচন্দ্র ঘোষ। ছেলেবেলা হইতেই স্বামীজীর পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। স্বামীজী তখন ছিলেন নরেন্দ্রনাথ এবং তিনিও ছিলেন রাখালচন্দ্র। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসার পর এই আত্মীয়তা জাগতিক ভাব হইতে পরিবর্তিত হইয়া জগৎ-অতীত ভাবে পরিণত হইয়াছিল।

রাখালচন্দ্রের শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী ও শ্যালক মনোমোহন দুজনেই ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে যাইতেন, সেই সঙ্গে রাখালও দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাইবার পূর্বেও পরম-হংসদেব যখন রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে আসিতেন, তখন রাখাল নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে সেখানেও গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার "অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান" নামক পুস্তকে তাঁহাদের ছেলেবেলার যে ছবি আঁকিয়াছেন, সেটি

যেন একটি জীবন্ত ছবি। তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রাখাল বিবাহের পর হইতেই পড়াশুনা করিবার জন্য সিমলায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে আমাদের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। (ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কন্যা দশমবর্ষীয়া বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিবাহ হইয়াছিল, ভুবনমোহন মিত্রের পুত্র মনোমোহন মিত্র রামদাদার মাসতুতো ভাই, সেজন্য মনোমোহনদাদাদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্পর্ক ছিল। রামদাদা আমাদের বাড়িতেই মানুষ হইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি যেন বড় ভাই ও আমরা ছোট ভাইবোন—এইভাবে এক পরিবারভুক্তের মতই ছিলাম। সেই জন্যই মনোমোহনদাদাদের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা ও মেশামেশি ছিল। বিশ্বেশ্বরী আমার মেজদিদিকে 'দিদি' বলিত এবং নরেন্দ্রনাথকে নরেনদাদা বলিত)। মনোমোহনদাদা তখন কোন্নগর থেকে সিমলায় আমাদের বাড়ির পাশে বাড়ি খরিদ করিয়া বাস করিতেছেন। রাখাল পড়াশুনার জন্য সেখানে আসিয়া রহিল, এবং আমাদের বড় বাড়ি, পড়িবার জন্য আলাদা ঘর, অনেক ছেলে সেখানে পড়াশুনা করিত, আর বাড়িও পাশাপাশি, সেইজন্য আমাদের পড়িবার ঘরেই সে পড়িবার বন্দোবস্ত করিল।"

তখনকার দিনে অতি সহজেই সকলে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হইত। ক্রমশ রাখাল নরেন্দ্রনাথদের বাড়ির ছেলেই হইয়া গেল, ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁহাকে নিজের সন্তানের মতই মনে করিতে লাগিলেন।

রাখাল অবশেষে শ্বশুরবাড়িতে থাকা ছাড়িয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথদের (অর্থাৎ বিশ্বনাথবাবুর) বাড়িতেই থাকিতে লাগিল। সেই সময় অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয়ের কুস্তির আখড়ায় অনেক ছেলে কুস্তি করিতে যাইত। নরেন্দ্রনাথ এবং রাখালও কুস্তির আখড়ায় যাইত। রাখাল কুস্তি করিয়া আসিয়া প্রতিদিন আধ সের দোকানের খাবার জলখাবার খাইত। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তখন খাবারের দর ছিল ছয় আনা।" রাখাল কিভাবে পড়াশুনা করিত, সে সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা—

"তাহার পড়া ছিল প্রথমে বসিয়া, পরে শুইয়া, তারপর ঘুমাইয়া।"

"রাখালের স্কুলের পড়া তেমন সুবিধা হইল না, পরে সে ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের কাছে কিছুদিন হোমিওপ্যাথী শিখিয়াছিল, অল্পদিন পরে তাহা ছাড়িয়া দিল।"

মহেন্দ্রনাথের পুস্তকে তাঁহাদের ছেলেবেলার সময়ের অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে একটি কাহিনীতে দুইজন জুয়াচোর কিভাবে একটি স্প্রিং দেওয়া কাগজের সাপ আনিয়া 'মনসাদেবীর সাপ' বলিয়া পুজার নৈবেদ্য, কাপড়, পয়সা প্রভৃতি লোকেদের কাছ হইতে আদায় করিতেছিল এবং কিভাবে রাখাল তাহার এই জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলিয়াছিল তাহার কাহিনী আছে।

মহেন্দ্রনাথ আর একদিন রাত্রের ঘটনা এইভাবে লিখিয়াছেন, "১৮৮৪ বা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে আমাদের পড়িবার ঘরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল রাত্রে পাশাপাশি শুইয়া আছে। খানিক রাত্রে দুইজনের ভিতর তর্ক উঠিল। রাখাল বলিল যে, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জিমন্যাস্টিক করা ছাড়িয়া দিয়াছে, সে এখন পীকক্ মার্চ বা ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে পারে না। এই তর্ক উঠিলে এক টাকা বাজি রাখা হইল। অর্ধেক রাত্রে দুইজনে উঠিয়া সম্মুখের দালানে জিম্‌ন্যাস্টিক শুরু করিল। নরেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মারিয়া দালানটাতে ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ করিতে লাগিল আর রাখাল সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে যাহারা শুইয়াছিল, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিলে বকাবকি শুরু করিল, "কি উৎপেতে ছেলে, আদ্দেক রাতে উঠে জিম্‌ন্যাস্টিক শুরু করেছে। ছোঁড়া দুটো মাথাপাগলা, একটু বিবেচনা নেই যে, লোক ঘুমুচ্ছে।"

মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "কথাটা ঠিক। নরেন্দ্রনাথ জগৎটাকে উল্টাদিক হইতেই দেখিয়া যাইল, পায়ে হাঁটিয়া চলিল না, পা উঁচু করিয়া হাত দিয়া চলিল, ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইল এবং নিরীহ রাখাল অনুগত আজ্ঞাবহের ন্যায় সমস্ত জীবনটাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।"

ছেলেবেলা হইতেই দুজনার মধ্যে কি ভালবাসা! এ ভালবাসার যেন তুলনা হয় না। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমরা সকলেই ছোট ছেলে। স্কুল হইতে আসিয়াই দুষ্টামি করা আমাদের এক কাজ। রাখাল যদিও দুষ্টামি করিত, কিন্তু সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না। যাহাকে বলে—witty mischief—হাস্যপূর্ণ দুষ্টামি, সে তাহাই করিত;*** পাড়ার ভিতর সে তাহার মিষ্ট স্বভাবের জন্য সকলেরই প্রিয় হইয়াছিল। *** সিমলার ছেলে বলিয়া আমাদের একটা গর্বের ভাব ছিল এবং আমরা সর্ববিষয়ে মাত্রা অতিক্রম করিয়া কার্য করিতাম, কিন্তু রাখালকে দেখিতাম যে, সে স্থির ও ধীর থাকিত, প্রচণ্ড ভাব তাহার ছিল না।"

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "রাখাল যদিও পাড়ার সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করিত, কিন্তু দেখিতাম যে, নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কুস্তি লড়িতেই হউক, হাসি-তামাসাতেই হউক, রান্না করিতেই হউক, খেলা করিতেই হউক বা বেড়াইতেই হউক, রাখাল নরেন্দ্রনাথের পিছু পিছু থাকিত। *** যেন একজন হইল অগ্রগামী সেনা—ভ্যানগার্ড, আর একজন হইল পৃষ্ঠসেনা—রীয়ারগার্ড।"

রাখালের এই সময় ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল, কিভাবে যে এই সম্বন্ধ একেবারে নিবিড় ও চিরন্তন হইয়া গেল, রাখাল নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "দেখিতাম, রাখাল মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া থাকিত, তাহার যে একটা স্বাভাবিক ধ্যানের ভাব ছিল, তাহা আমরা বুঝিতাম না। ভাবিতাম, বোকা, ভালমানুষ, অতিশয় ভীতু—এইজন্য হয়তো সে খানিকক্ষণ চোখ বুজাইয়া থাকে এবং কি ভাবে।"*** কিন্তু রাখাল যখন পরমহংস মহাশয়ের সংস্রবে আসিল, তিনিই প্রথম বুঝিতে

পারিলেন যে, জপ করা রাখালের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। এইজন্য তিনি বলিতেন, "রাখাল চুপ করে থাকে, বেশী কথাবার্তা কয় না, কিন্তু তার ঠোঁট অনবরত নড়ছে।" রাখালকে সকলে নিস্তেজ ও অল্পবুদ্ধি বিবেচনাহীন মনে করিত এবং তাহাকে কোন কার্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিত না। কিন্তু একমাত্র পরমহংস মহাশয়ই তাহার ভিতরে কি অদ্ভুত শক্তি বীজভাবে নিহিত ছিল, তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন।"

রাখালের সমদর্শিতা এমন ছিল যে, মন্দ ছেলেদের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করিত এবং তাহারাও তাহার মিষ্ট স্বভাবের সংস্পর্শে আসিয়া অশিষ্টতা ত্যাগ করিত। এই রাখাল যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইলেন এবং যখন তিনি বেলুড়-মঠের পরিচালক, তখনও তিনি ভালমন্দ-নির্বিশেষে সকলেরই আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন।

রাখালচন্দ্রের পরিচয় দিতে গেলে প্রথম কথা এই যে, সে ছিল ঠাকুরের পুত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—"এই নাও গো—তোমার ছেলে।"

রাখালও ছিল যেন ঠাকুরের আদুরে ছেলেরই মত। রাখাল প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে আস্তো, শেষে দক্ষিণেশ্বরে এসে আর বাড়ি ফিরে যেতে চাইতই না, দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যেত। রাত্রে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছেই শুইত। মাঝে মাঝে তাঁর মুখে মুখে উত্তরও দিত। ঠাকুর বলেছেন ধ্যানে বসতে চায় না, হয়তো বললে, "ওসব করে কিছুই হয় না মশাই।" ঠাকুর ভাত খেয়ে উঠে রাখালকে পান সাজতে বললেন, রাখাল বলে বস্‌লে—"পান সাজতে জানিনে মশাই।"

ঠাকুর বলিতেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে এখনো দুধ বেরোয়।" নয়তো বলিতেন, "ও বড় দুর্বল, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস্‌নি।"

বাস্তবিক তখন রাখাল দুর্বলও ছিল, মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগিত। তাই ঠাকুর বলরামবাবু বৃন্দাবনে যাইতেছেন দেখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকেও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে রাখালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাকে বাড়িতেও পাঠাইতেন, তখন বলিতেন, "রাখাল এখন পেন্সন খাচ্ছে।"

রাখালের বাবাকেও ঠাকুর নানা মিষ্ট কথা বলিয়া খুশী করিতেন। হয়তো বলিতেন, "আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে দেখেছো? ওর মুখের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে অনবরত ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা, তাই। তা রাখাল যে এখানে আসে, তাতে তোমার অমত আছে?"

রাখালকে শিক্ষা দিতেন, "বাবা হলেন মহাগুরু, সব সময় তাঁকে মান্য করে চল্‌বি।"

একবার রাখাল খুব বকুনিও খাইয়াছিল তাঁহার কাছে, কালীঘরের প্রসাদ

আসিতেই নিজে হাতে তুলিয়া লইয়া নৈবেদ্যের অগ্রমোণ্ডাটি খাইয়াছিল বলিয়া।

আর রাখাল? তাহার মনের ভাব মুখে কিছু প্রকাশ না পাইলেও ভাবে বুঝা যাইত ঠাকুরের উপর তাহার কি গভীর ভালবাসা। বাবা তাকে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই তালা খুলিয়া সে পলাইয়া আসিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরে। এদিকে বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রীর উপর ভালবাসাও আছে, কিন্তু এমন অবস্থা যে, ঠাকুরের সংগছাড়া হইয়া থাকার কথা তাহার যেন কল্পনারও অতীত।

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রাখাল যখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিল, তখন একদিন দুপুরবেলা, মনোমোহনদাদার বাড়ির নিকট একটি বাড়িতে, রাখাল, আমি ও আর একজন ছেলে উপরকার একটি ঘরে বসিয়াছিলাম। কথা প্রসংগে পরমহংস মহাশয়ের কথা উঠিল। দেখিলাম, রাখালের পূর্বভাব সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে এলোমেলো হইয়া পড়িল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং সে অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার খানিকক্ষণ পরে মনটা স্থির করিয়া সে কথা বলিতে লাগিল। পরমহংস মহাশয় তাহাকে কিরূপ ভালবাসেন, সেই বিষয়ে নানা ভাবের কথা কহিতে লাগিল।"

ইতিমধ্যে রাখালের একটি ছেলেও হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে যখন চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরের একটি বাড়িতে আনা হয়, তাহার অল্পদিন পরে রাখালের ছেলের অন্নপ্রাশন হয়।

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "শ্যামপুকুরে আসিবার অল্পদিন পরে রাখাল ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য সকলকে খাওয়াইয়াছিল। ছেলেটির নাম রাখা হইয়াছিল 'সত্যচরণ'। দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন বড় গরম ছিল। শ্যামপুকুরের বাড়িতে থাকার সময় সত্যর অন্নপ্রাশন হইয়াছিল, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে, অন্তত ছয়মাস পূর্বেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। অর্থাৎ রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়। অন্নপ্রাশনের দিনটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক। কেননা, নরেন্দ্রনাথ এতাবৎকাল বাড়িতেও থাকিত এবং পরমহংস মহাশয়ের নিকটেও যাইত; কিন্তু ঐদিন হইতেই নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত গৃহত্যাগ করিল।"

বেচারী বিশ্বেশ্বরী! তাহার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুরের অসুখ বেশী হওয়ার পর হইতে রাখাল আর বাড়ি আসে নাই, তাহার পর ঠাকুর দেহত্যাগ করিলে যখন কাশীপুরের বাড়ির 'লিজ' ফুরাইয়া গিয়াছে, আর দুই মাস পরেই বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে, ছেলেরা তখন কোথায় যায়? যাঁহারা গৃহীভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গে ত্যাগী ছেলেদের ঠাকুরের অসুখের সময় মাঝে মাঝে বিরোধ হইয়াছে। বিরোধের প্রধান কারণ গৃহীভক্তগণ অর্থ সাহায্য করিতেন, ছেলেদের সেই অর্থ খরচ করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের এই দারুণ সময়ে হিসাবপত্র রাখিবার দিকে কাহারও একেবারেই মন ছিল না। অর্থদাতা গৃহীভক্তগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন এবং এ বিষয়ে হয়তো কিছু কঠোর মন্তব্যও করিয়া থাকিবেন। নরেন্দ্রনাথ উগ্রপ্রকৃতি, তিনি বলিলেন—"আপনাদের টাকায়

আমাদের দরকার নাই, আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের সেবা নির্বাহ করিব।" গিরীশবাবু মধ্যস্থ হইয়া তখন এই মীমাংসা করিলেন যে, হিসাবের ভার তিনিই লইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল, সেটি এই, শুশ্রূষাকারী ছেলেরা যখন-তখন ঠাকুরের কাছে গৃহীভক্তগণকে আসিতে দিতে চাহিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, যাহারা শুশ্রূষা করিবে, পালাক্রমে তাহারাই ঠাকুরের কাছে থাকিবে। অযথা ভিড় করিয়া পীড়িতের বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাঘাত করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতেও গৃহীভক্তরা বিরক্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর দেহাবশেষ লইয়াও বিরোধ বাধিল। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রামদাদা ও সুরেশ মিত্র প্রভৃতি বলিলেন,—"ছেলেরা সকলে যে যার বাড়িতে যাক্। নরেন আইন পড়ুক। শরৎ ও শশী কলেজে গিয়া পড়ুক। রাখালের স্ত্রী-পুত্র আছে, সে বাড়ি যাক্। আর যাদের চাকরি করবার ইচ্ছে আছে, তাদের চাকরি ক'রে দেওয়া হবে। কেবলমাত্র তারক, বুড়োগোপাল ও লাটু এই তিনজনের থাকিবার কোন স্থান ছিল না। সুরেশ মিত্র বলিলেন, "এদের থাকবার জন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হোক্।" রাখাল নিতান্ত ভালমানুষ, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কোন কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না।"

নরেন্দ্রনাথ রাখালকে বলিলেন, "সেই যে মাড়োয়ারীটা তাঁর কাছে আস্‌তো, তুই তার কাছে যা, বলগে যা আমরা সাধু হয়ে থাক্‌বো, সে তার বন্দোবস্ত করুক।"

নরেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, আইনের বইও পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সর্বদাই উন্মনা, কখনো গিরিশবাবুর কাছে কখনও বা বলরামবাবুর বাড়ি গিয়া যদি একটা আস্তানা করা যায়, সেইজন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর কাশীপুর হইতে চলিয়া আসিবার সময় ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসগুলি ও যে তাম্রপাত্রে তাঁহার দেহাবশেষ ছিল, সে সবই বলরামবাবুর বাড়ি আনিয়া 'গোপনে' রাখা হইল।

তুলসী মহারাজ ব্যাঙ্গালোরের মোকদ্দমার স্টেটমেণ্টের সময় বলিয়াছেন যে, রামবাবুই সেগুলি দাবী করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ ইহা লইয়া কোন ঝগড়া না হয় সেজন্য দিয়া দিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অভেদানন্দ স্বামী অর্থাৎ কালী মহারাজ সেগুলির বেশীর ভাগ আলাদা করিয়া রাখিয়া অল্প ভাগ রামবাবুকে দেন এবং সেই পুণ্য দেহাবশেষ রামবাবু কাঁকুড়গাছির বাগানে সমাধিদান করেন।

এ সময় রাখাল কোথায় ছিলেন? সম্ভবত তিনি মনোমোহনবাবুর বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন, কেননা তখনো কোন আস্তানা ছিল না। বরানগরের বাড়ি যখন ভাড়া করা হইল, তখনই ঠাকুরের শয্যা, আসন ও পুণ্য দেহাবশেষ সঙ্গে লইয়া সকলেই সেখানে গিয়া ক্রমশ একত্র হইলেন এবং রাখালও সেই সঙ্গে বরানগরে চলিয়া গেলেন।

রাখাল এবার পুরাপুরি সাধু হইলেন। যদিও সন্ন্যাস অনুষ্ঠান তখনও

বাকি ছিল। "ধীর গম্ভীর, অল্পভাষী,—কণ্ঠস্বর করুণাপূর্ণ—আর সর্বদাই জপ করিতেছে। পূর্বেকার রাখালের আর কোন চিহ্ন রহিল না। সে যেন সহসা কঠোর তপস্বী রাখাল হইয়া গেল।"

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—"রাখাল যখন বরানগর মঠে ছিল, বিশ্বেশ্বরী তখন অনবরত খামে করিয়া চিঠি লিখিত, তখন পোস্টকার্ড হয় নাই। রাখাল কখনো চিঠি খুলিয়া পড়িত, কখনও বা হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া বালান্দা-মাদুরের (চ্যাটাইগোছের) নীচে গুঁজিয়া রাখিত, কোন উত্তর দিত না। কি ভয়ংকর কঠিন সমস্যা। স্ত্রী মিনতি করিয়া বার বার বাড়িতে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, অন্তত একটিবারও দেখা পাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছে, অল্পবয়স্কা স্ত্রী, বাপের বাড়ি থাকে কি শ্বশুরবাড়ি থাকে, তাহারও ঠিক নাই।"

বেচারী বিশ্বেশ্বরী। বাপের বাড়ি মা নাই, বাপ নাই। শ্বশুরবাড়ি নিজের শাশুড়ীও নাই, আবার কোলে একটি ছেলে। বুদ্ধদেব গোপাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, কিন্তু গোপা ছিলেন রাজবধূ। আর মহাপ্রভুও ত্যাগ করিয়াছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কিন্তু রাখালের এই যে ত্যাগ, এ যেন সে-সব ত্যাগ হইতেও অতি-কঠোর ত্যাগ। স্ত্রী ছিল তার প্রিয়তমা, ছেলেও ছিল নয়নের মণি, তবুও ত্যাগ তাকে করিতেই হইয়াছিল। কেননা গৃহে ফেরা আর তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বিশ্বেশ্বরী যখন বুঝিল স্বামী আর ফিরিবে না, তখন খাওয়া ও ঘুমানো সবই ছাড়িল। "মেঝেতে শুইয়া থাকিত এবং জপ করিত। মাঝে মাঝে সে ছেলেটার দিকে চাহিয়া থাকিত।" এমনভাবে মানুষ কতদিন বাঁচিতে পারে? বিশ্বেশ্বরীও বাঁচিল না। তিন বৎসরের শিশুকে অনাথ করিয়া সে জীবনের দুঃখজ্বালার হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরীর মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া রাখালের সঙ্গে বিবাহের পর গিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা, স্বামীর ধর্মলাভের বাধা হবে না, সহায় হবে।" রাখাল ছিল ঠাকুরের মানসপুত্র, তাই শ্রীশ্রীমাকে টাকা দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিতে বলিয়াছিলেন। বাস্তবিকই সে স্বামীর ধর্মের পথে বাধা হয় নাই, হয়তো সহায়ই হইয়াছিল। সাধ্বী পত্নীর পুণ্যেই স্বামীর যাত্রাপথ সহজ হইয়াছিল।

রাখাল ভগবান লাভের জন্য অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল এবং বিশ্বেশ্বরীর তপস্যাকেও আমরা কঠোর তপস্যাই বলিব। "যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়া মানুষ থাকিতে পারে না, রাখালও তেমনি জপ ছাড়া থাকিতে পারিত না।" মহেন্দ্রবাবু রাখালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আর পতিপ্রাণা বিশ্বেশ্বরীর কাছে ছিল স্বামীর চিন্তাই নিশ্বাস ও প্রশ্বাস।"

রাখালের বাবা আসিয়াছিলেন বরানগরে মঠে রাখালকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "গরমীকাল, দিনটা রবিবার।

রাখালের পিতা হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বরানগর মঠে আসিয়াছিলেন এবং তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া সেখানে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তিনি বৈভবশালী ব্যক্তি ও রাখালের পিতা, এইজন্য তাঁহাকে একটু দুধ দেওয়া হইয়াছিল এবং তরকারির মধ্যে অল্প পরিমাণ আলুর দম দেওয়া হইয়াছিল। গুপ্ত (সদানন্দ) ও আমি তাঁহার দেখাশুনা করিতে লাগিলাম। সকলের আহারের পর তিনি একাকী আহার করিতে বসিলেন, আমরা দুইজনে কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আহারান্তে গুপ্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বলিল, 'আপনার পুত্র সাধু, আপনিও কেন সাধু হয়ে এখানে থাকুন না?' তিনি বলিলেন, 'ও গুপ্তু, আমি যে বিভবশালী লোক। আমাকে তেল মাখিয়ে দেবে কে? আমার যে নানারকম আহারের জিনিস চাই। তোমাদের এ খাওয়া খেয়ে কি থাক্‌তে পারব?' যাইবার সময় তিনি মঠের খরচের দরুণ গুপ্তের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া যান।"

"বরানগর মঠে প্রথম অবস্থায় রাখালের পিতা তাহাকে একজোড়া বার্নিশকরা ঘোড়তোলা জুতা দিয়া যান। রাখাল কয়েক মাস সেই জুতা ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু আমার পায়ে জুতা না থাকায় আগ্রহ করিয়া সেই জুতা আমাকে পরাইয়াছিল এবং সে নিজে শুধু পায়ে রহিল।"

এই সময় মহেন্দ্রবাবু প্রায়ই বরানগর মঠে থাকিতেন, তাহার পড়িবার বই পর্যন্ত ছিল না, "দাঁ-বাবুদের বাড়ি গিয়া পুরানো বই চাহিয়া আনিয়া তাঁহার পড়া করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিযাছেন, "অপর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বলরামবাবু এই সময় টাকা পাঠাইয়া দেওয়ায় আমি পরীক্ষার 'ফি, দিতে পারিয়াছিলাম।"

বলরামবাবু রাখালকে তাঁহার গায়ের একটা পুরানো চিনা-কোট দিয়াছিলেন। রাখাল বলিত, জামাটি অতি পবিত্র; কেননা বলরামবাবুর দেওয়া পুরানো জামা।

বিশ্বেশ্বরীর চিঠি অনবরত আসিত বলিয়া রাখাল অস্থির হইয়া উঠিত, কখনও বা বরানগবের মঠ ছাড়িয়া কয়েকদিন বলরামবাবুর বাড়ি গিয়া থাকিত, আবার কখনও বা বলরামবাবুদের উড়িষ্যা দেশের জমিদারী কোঠারে কিম্বা বৃন্দাবনের জমিদারীর ঠাকুরবাড়িতে চলিয়া যাইত, যাহাতে আর স্ত্রীর কাকুতি-পূর্ণ পত্র না পাইতে হয়। রাখালের একবার বৃন্দাবন থাকিবার সময় বিশ্বেশ্বরী স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, রাখাল যেন দেহত্যাগ করিয়াছে, এই স্বপ্ন দেখিয়া তাহার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হয় যে, সে আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করে।

"কোঠারী হইতে একবার রাখাল পুরী গিয়াছিল, সেবার শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া রাখাল ভাবাবেশে অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ এই ভক্তির প্রাবল্যে ক্রন্দন ও নৃত্য প্রভৃতি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি ইহা লইয়া অনেক বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "রাখাল যে ভীতু, জগন্নাথের খরতালের মত বড় বড় চোখ দেখে ভয়েই কেঁদে ফেলেছে।"

রাখাল এই সময় অনেকবার বৃন্দাবন গিয়াছিল, ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে

থাকিয়া তপস্যায় কাটাইত। এই সময় রাখাল একদিন বলিয়াছিলেন "—এক আসন, এক জপ, এক উদ্দেশ্য, এইটি না করলে আসন জাগ্রত হয় না।"

সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইয়া গিয়াছে, এখন আর 'রাখাল' নন, এখন হইলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজী ডাকিতেন 'রাজা' বলে, কেননা ঠাকুর কখন কখন রাখাল রাজাও বলিতেন তাঁকে। এবার তাঁর 'রমতা সাধু' হইয়া প্রব্রজ্যার সময় আসিল। নানা দেশে কখনো একা কখনো কোন গুরুভাইয়ের সঙ্গে, কখনো বা শ্রীশ্রীমার সঙ্গী হইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিলেন। স্বামীজী যখন প্রব্রজ্যায় বাহির হন, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখাও হইত। স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গ এড়াইবার জন্য কখনো 'বিবিদিধানন্দ', কখনো বা 'সচ্চিদানন্দ' নাম লইয়াছিলেন। তবুও তাঁর মাঝে মাঝে গুরুভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া যাইত। কখনো কখনো কিছুদিন সকলে একত্রেও ছিলেন। হরিদ্বার ও ঋষিকেশে থাকিবার সময় অনেকেই একত্রে ছিলেন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ সান্যাল মহাশয়ও তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

তখন তীর্থের পথ খুবই দুর্গম ছিল। হৃষিকেশ ছিল নিবিড় জঙ্গল, হরিদ্বারেও জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গলে মাঝে মাঝে বুনো হাতির দলও বাহির হইত। সাহারাণপুর পর্যন্ত রেলপথ ছিল, হরিদ্বার গমনের জন্য রেলের রাস্তা তখনও হয় নাই, কিন্তু সাধুরা পায়ে হাঁটিয়াই দুর্গম তীর্থে যাইতেন, তীর্থ ভ্রমণ সাধুদের একটি ব্রত ছিল। তখনকার একটি প্রবাদ বাক্য—

"রম্‌তা সাধু বহতা পনি,
ঐসে ন কোই মৈল লখানি।"

এই তীর্থযাত্রায় অনশন, অসুস্থ হইলে বৃক্ষতল আশ্রয় এসব তো ছিলই, মাঝে মাঝে জীবন সংশয় বিপদও হইত। যে সময় সমুদ্রে 'সার জন্ লরেন্স' জাহাজ ডুবিয়া যায়, সেই জাহাজে স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি জাহাজ হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ একজনের কথা ছাড়িয়া যেন আর একজনকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করাই যায় না। দুজন যেন দুজনকে লইয়াই সম্পূর্ণ হইয়াছেন। সেই দুজনের একজন যখন চলিয়া গেলেন, পড়িয়া রহিল তাঁহার অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা, তখন ব্রহ্মানন্দ সেই পরিকল্পনাকেই স্বামীজীর প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন।

একান্তভাবে উৎসর্গই অজেয় শক্তির উৎস। স্বামীজী যখন বিদেশে ছিলেন আলমবাজার মঠে ব্রহ্মানন্দ ভ্রাতৃমণ্ডলীর নায়করূপে সমস্ত ভার লইয়া ছিলেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই ব্রহ্মানন্দ স্বামী সকলকে লইয়া লাগিয়া গেলেন তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজনে। সকলেই অবশ্য তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রণী হইয়াছিলেন তিনি।

এই সময় তাঁহার মাতৃহীন ছেলেটির মারা যাওয়ার খবর পাইয়াছিলেন।

তাঁহার বাবাও তাহার অল্পদিন পরে মারা যান। ছেলে কোনদিন বাপের স্নেহ পাওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞান হইয়া বাবাকে চোখেও দেখে নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সেই কঠোর তপস্বীর মনেও কি দারুণ আঘাত লাগে নাই? মহেন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বহু দিন পরে বেলুড় মঠে একদিন কথার ছলে মহেন্দ্রবাবু স্বামী ব্রহ্মানন্দের ছেলের অন্নপ্রাশনের দিনের উল্লেখ করিবার সময় ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মুখ যেন হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

স্বামীজীর চিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিবার খবর কালীপূজার দুই এক দিন পরে স্টেটসম্যান পত্রে সিস্টার সারউইন মেরী স্নেলের লিখিত বক্তৃতার যে বিবরণ বাহির হয়, তাহাতেই সকলে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর স্বামীজীর নিকট হইতে সমস্ত-বিবরণ-সম্বলিত পত্র আসিয়া পৌঁছিল,' সেই সংগে আসিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে একটি বাংলা চিঠি। চিঠির প্রথমে অনেক অনেক 'দণ্ডবৎ' 'লগুড়বৎ' লেখা ছিল, (এইটি ছিল স্বামীজীর রাজা মহারাজের সংগে রহস্যালাপ) শেষে স্বাক্ষর ছিল 'তোমার নরেন'। তাঁহারা দুজনে যখন দুজনকে প্রণাম করিতেন একজন বলিতেন 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' আর একজন বলিতেন, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।'

স্বামীজী ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া টাকাকড়ি সব কিছু ব্রহ্মানন্দ স্বামীকেই দিয়াছিলেন, আবার দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার সময় তাঁহার নামেই সব কিছু লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাহাতে সম্মত হন নাই।

বিদেশে থাকা কালেই স্বামীজী মিশনের প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করিবার পর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকেই তিনি সভাপতিরূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ, রাগিলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না, তাই ঠিকমত কাজ না হইলে সব ঝোঁকটাই গিয়া পড়িত রাজা মহারাজের উপর, পরে আবার ক্ষমাও চাহিতেন।

বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া কাশীতে স্বামীজী প্রায় দু' মাস ছিলেন, তার আগেই জনকতক উৎসাহী যুবক কাশী সেবাশ্রমের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তখনও তাহার নামকবণ হয় নাই। স্বামীজী তাহার নামকরণ করিলেন, সেবক ছেলেদের উৎসাহ ও উপদেশ দিলেন, ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বলিলেন, 'রাজা, কাশীর এই প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রাখিস।'

এইরকম আরও অনেক ভার স্বামীজী রাজা মহারাজকেই দিয়া গিয়েছিলেন, যেমন নিজের গর্ভধারিণীর ও পাবিবারিক ব্যাপারের সম্বন্ধে। বলিয়াছিলেন, 'তুই আমার মার আর বাড়ির বন্দোবস্ত করে দিস। তাঁর তীর্থ দর্শনের বড়ই ইচ্ছা তুই তাঁকে তীর্থ দর্শন করাস'। স্বামীজীর এ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী বেলুড় মঠের শত সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও অনবরত হাইকোর্টে গিয়া স্বামীজীর জ্ঞাতিদের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, গৌরমোহন

মুখার্জি'র স্ট্রীটে স্বামীজীর জননীর জন্য বাড়ি ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুরী যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ জননীর ও বাড়ীর দেখাশুনার ভার রাজা মহারাজের হাতে দিয়াছিলেন, তাই তিনি ভুবনেশ্বরী যখনই ডাকিতেন, তখনই আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। জগদ্ধাত্রী পূজাব সময় তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, কেননা স্বামীজী তাঁহার মার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় একবার নিজেই সমস্ত করেন।

বেলুড় মঠের মত প্রতিষ্ঠান, স্বামীজীর দেহান্তরের পর চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অর্থাভাব দেখা দিল, কেননা স্বামীজী যতদিন ছিলেন, নানাভাবে অর্থাগম হইত, লোকে খাবার জিনিসও দিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর তেমনভাবে টাকা আসে না। অথচ প্রতিষ্ঠানটি লোকসংখ্যার দিক দিয়া খুবই বড়। শিবানন্দ স্বামী কাশীতে আছেন, তুরীয়ানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথে জাহাজে আছেন। এদিকে আবার বালি মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্সের জন্য মোকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বেলুড় মঠ আসলে ধর্মস্থানই নয়। হুগলী কোর্টে এই মোকদ্দমা হয়, সেজন্য ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে অনবরত হুগলী ও বেলুড় যাতায়াত করিতে হইয়াছে। খরচ ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, অবশেষে বেলুড় মঠেরই জয় হইল এবং যে নজির স্থাপিত হইল, তাহাতে কাশী, কনখল প্রভৃতি সকল স্থানের রামকৃষ্ণ মিশনের মঠগুলি ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইল।

স্বামীজী বেলুড়ে মাদ্রাজে এবং মায়াবতীতে মঠ করিয়া গিয়াছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন মিসেস সেভিয়ার, কেননা সিস্টার সেভিয়ারই ঐ মঠ স্থাপন করেন। কাশী ও কনখলে সেবাশ্রমের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। এদিকে বেলুড় মঠ পরিচালনেরও ভার ছিল। বিশেষভাবে সংঘ-পরিচালনী শক্তি না থাকিলে কিছুতেই এ সমস্ত একসঙ্গে চালানো সম্ভব হইত না। স্বামীজী গণতন্ত্র অপেক্ষা ডিক্টেটরশিপ বা সর্বময় কর্তৃত্বই এদেশের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, ব্রহ্মানন্দ স্বামীও সেই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা সে সময় বেলুড় মঠের পক্ষে গণতন্ত্রের মতে চলা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

অনেক লোক একত্র থাকিলে সাধু অথবা গৃহী যাহাই হোক না কেন, মাঝে মাঝে ছোটখাট গোলমাল হইয়াই থাকে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, অন্যের নিকট যে ব্যাপারটি গুরুতর বলিয়া বোধ হইত, ব্রহ্মানন্দ স্বামী অতি সহজেই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সদয় ব্যবহার সকলকেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও নির্ভরশীল করিত। তাঁহার অত্যাশ্চর্য সংগঠন শক্তি ছিল। এই সংগঠন শক্তিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের সভাপতিত্বের সময় রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ দিকে দিকে প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে মঠে বা মিশনে কোন বিশৃঙ্খলাই হয় নাই।

তাঁহার অর্থনীতির জ্ঞানও আশ্চর্যরকম ছিল। নিজে ধনীর সন্তান হইয়াও একেবারে সর্বত্যাগী, অথচ কিভাবে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইবে এবং সেই সংগৃহীত অর্থ কিভাবে মিশনের প্রচার ও উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইলে রামকৃষ্ণ মিশন দিনে দিনে দেশব্যাপী প্রসারতা লাভ করিবে, সেবিষয়ে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা ছিল। মহেন্দ্রবাবু তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মানন্দকে যদি একটি রাজ্য চালাইবার ভার দেওয়া থাকিত, তবে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সে ঐ রাজ্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে চালাইতে পারিত।" আসলে এই যে ভার, এটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট 'পরম তপস্যা' বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তাই তিনি কায়মনোবাক্যে এই ভার বহন করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ ভারতবর্ষের সকল দেশেই বিস্তার লাভ করুক স্বামীজীর ছিল ইহা সংকল্প, সেই সংকল্প কার্যে পরিণত করিয়াছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজী ছক আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ গঠনকার্যের ভার লইলেন। এই গঠনকার্যে সকল সাধুগণই সহায়তা করিয়াছিলেন। সকলেই একমত, একভাব ও একই মহান উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কার্য করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই যে বিরোধহীনভাবে সুশৃঙ্খলায় কার্য পরিচালিত হইয়াছিল, ইহার মূলে ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রেরণা, নির্দেশ, প্রভাব এবং সকলের প্রতি সমদর্শিতা ও সস্নেহ ব্যবহার।

কাশীর সেবাশ্রম প্রথমে জনসাধারণ দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা মিশনের পরিচালনের অধীনে আসে। ইটালীর উপেন্দ্রনাথ দেব ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে সেবাশ্রমের জন্য কিছু টাকা দিয়াছিলেন। সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনেক ঝামেলা পোহাইতে হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয়, শিবানন্দ স্বামীর উপর ইহার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তখন আশ্রম ভাড়া বাড়িতেই ছিল। পরে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অক্লান্ত চেষ্টায় সেবাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর তিরোধানের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কয়েক বৎসর কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। মঠের ঠাকুরের ঘরে অথবা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘরেও তিনি প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, বলিতেন, ঠাকুর ঘরের ভিতর সাক্ষাৎরূপেই রহিয়াছেন, তাঁহার বিনা আদেশে হঠাৎ ঘরে ঢুকি কি করিয়া?

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কনখলের সেবাশ্রম স্থাপন করা হয়, কলিকাতার এক ভদ্রলোক সে সময় সেবাশ্রম স্থাপনের জন্য দু হাজার তিন শো টাকা দিয়াছিলেন, পরে তিনিই আবার কয়েক বৎসর পরে টাকাটি ফিরাইয়া চাহিলেন। কেবল তাই নয় অনেক কটু কথাও বলিলেন।

তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় বিপদ কাটিয়া গেল। কনখল হইতে কল্যাণানন্দ স্বামী জানাইলেন যে, ভজনলাল লোহিয়া নামে এক ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি দুইজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছ হইতে আশ্রম স্থাপনের সমস্ত টাকাই সংগ্রহ করিয়া

দিবেন। এইভাবে কনখলের আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাজা মহারাজ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ক্যালিফোর্নিয়া পাঠান।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মঠ ও মিশন রেজিস্ট্রি হয়। তখন মঠের আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। মঠের কাজ দুইভাগে বিভক্ত হয়, একভাগ মিশন ও অন্য ভাগ মঠ। এই সময় বেলুড় মঠের ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। তখন হইতেই রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হইল, কেননা ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহী কেহ রহিলেন না। গৃহস্থ ও ভক্তগণ ৫৲ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিয়া মেম্বর থাকিতে পারিবেন এবং মঠের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারিবেন। আর যাঁরা একশো টাকা দিবেন, তাঁহারা আজীবন সদস্য থাকিতে পারিবেন, ইহাই স্থির হইল।

মঠ ও মিশন পৃথক হওয়াতে প্রচার বিভাগ এবং মঠ দুই আলাদা হইল; আয়-ব্যয়ের তহবিলও আলাদা হইয়া গেল। এক বিভাগের ভার লইলেন সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামী, অন্য বিভাগের ভার লইলেন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ। বস্তুত স্বামী সারদানন্দই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের কার্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার পর হইতে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্তই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি ছিলেন। দুই বৎসর সময় পর্যন্ত প্রত্যেক সভাপতির কার্যকাল, ইহার পর আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়।

১৯০১, ৮ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া কোর্টে স্বামীজীর মঠের দেবোত্তর দলিল রেজেস্ট্রী হওয়ার চারদিন পরেই মঠের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রথম অধিবেশন হয় ১৯০১ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী। মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির এগারোজন ট্রাস্টির মধ্যে সেদিন আটজন উপস্থিত ও তিনজন অনুপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ট্রাস্টিগণের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন মাদ্রাজস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকার্যের ভার নিয়া মাদ্রাজে ছিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তি আশ্রমে ছিলেন এবং স্বামী অভেদানন্দ যুক্তরাজ্যে বেদান্ত প্রচারকার্যে ছিলেন। আটজন ট্রাস্টি উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য যে অপরিসীম যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভাব প্রচারের জন্য যাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের বাসের জন্য একটি স্থান তাঁহারই চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এই অধিবেশন আরম্ভ করা হয়।

তারপর ট্রাস্ট-ডিড পড়া হইবার পর তাহার মর্মার্থ ট্রাস্টিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন প্রবীণ সাধু অদ্বৈতানন্দ।

ইহার পর সভাপতি নির্বাচন। সভাপতির জন্য তিনটি নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল। (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, (২) স্বামী সারদানন্দ, (৩) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ভোটের ফল এইরূপ হয়ঃ—

প্রস্তাবিত নাম	পক্ষে	বিপক্ষে
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৫	৩
স্বামী সারদানন্দ	১	৭
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	২	৬

ইহার পর স্বামী প্রেমানন্দ প্রস্তাব করেন যে, স্বামী সারদানন্দ সেক্রেটারী এবং স্বামী নির্মলানন্দ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হইবেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন, এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ কোনরকম পদে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই। স্বামীজীর দেহত্যাগের কয়েকদিন পরেই এই অধিবেশন হয়।

সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, এবং উপস্থিত সভ্যগণ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী অখণ্ডানন্দ।

অধিবেশনের প্রথম প্রস্তাব ছিল স্বামীজীর প্রাইভেট ফণ্ড, যাহার টাকা সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট গচ্ছিত আছে, সেই অর্থের সম্বন্ধে। গভর্নমেণ্ট পেপারে টাকা ছিল ৩৭০০, এবং নগদ ছিল ১৭০০্। দেখা গেল, টাকাটি ঠিকমতই আছে।

প্রস্তাবে বলা হইল যে, স্বামীজীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে টাকাটি তাঁহার মাকে দেওয়া হইবে, কিম্বা তাঁহার ইচ্ছানুসারে খরচ করা হইবে।

এ টাকা হইতে বাদ যাইবে

শান্তিরাম ঘোষের কাছে স্বামীজীর ধার ... ... ৯্
স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের জন্য মশারি কিনিতে দেন ... ২০্
স্বামী অদ্বৈতানন্দের চোখ অস্ত্র করিবার ফি দেওয়ার
জন্য স্বামীজীর নির্দেশ ... ... ৩০্

মোট ৫৯, টাকা

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, ইউনাইটেড স্টেট নিবাসিনী মিসেস এস সি বুল স্বামীজীকে একটা ৭৫০, টাকার চেক দিয়াছিলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, মিসেস সি ক্রিয়েনেস্টিভ্যালেলের আমেরিকা ফিরিবার জাহাজ ভাড়ার জন্য। জাহাজ ভাড়াটি যদি মিসেস সেভিয়ার কি স্বামীজীর অন্য কোন বন্ধু দিয়া দেন তাহা হইলে ঐ টাকাটাও স্বামীজীর মাকেই দেওয়া হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হিসাবের প্রণালী ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যায়। ঐ টাকা দিয়া পরে ব্রহ্মানন্দ স্বামী স্বামীজীর মাকে তীর্থ করাইয়াছিলেন এবং মামলা মোকদ্দমা করিয়া জ্ঞাতিদের হাত হইতে সমস্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এর জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

স্বামীজী যখন ইউরোপে ছিলেন তাঁহার মার যা কিছু করিবার ব্রহ্মানন্দ স্বামীই করিতেন।

প্রত্যেক ব্যাপারের জন্য আলাদা আলাদা অর্থভাণ্ডার। "শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব ফাণ্ড", "স্বামীজীর জন্মোৎসব ফাণ্ড" এই দুইই সম্পূর্ণ আলাদা। যে কোন ভক্ত উৎসবের জন্য টাকা দিলে সেটি স্বামীজীর জন্মোৎসব ফণ্ডে জমা হইবে, ঠাকুরের জন্মোৎসব ব্যাপারের সঙ্গে সে টাকার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এ বিষয়ে স্বামীজীর কঠোর নির্দেশ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাকে অনাহারে মরতেও হয়, তবু অন্য বাবদের টাকা থেকে এক পয়সাও খরচ করবে না।"

মঠ আর মিশন দুই আলাদা। তাই যদি কোন ভক্ত প্রণামী দেন বা ঠাকুর-সেবার জন্য টাকা দেন সেটি মঠের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে, আর জনসাধারণ

জনহিতকর কার্যের জন্য যে টাকা দান করিবে সেটি হইবে মিশনের টাকা। সে টাকার পাই পয়সার হিসাব পর্যন্ত হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠের বিশেষ অর্থকষ্ট হইয়াছিল। সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ কি উপায়ে টাকা সংগৃহীত হইবে দিবারাত্র সেই চিন্তা করিতেন। অবশ্য তাতে তাঁহার সাধনভজনের ব্যাঘাত হইত না। এটিও তাঁহার একরকম ভগবৎভজন ছাড়া আর কিছু নয়।

অর্থ-সংগ্রহ না হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসার হইতে পারে না, আর্ত সেবার কাজ চলিতে পারে না, নূতন নূতন পরিকল্পনাও কার্যে পরিণত হইতে পারে না। এজন্য সকলের আগে চাই অর্থ।

তাই প্রত্যেকটি অধিবেশনেই এই অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে, এই মে মাসেই আরও তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল।

কিন্তু অপূর্ব দক্ষতা ছিল এ বিষয়ে সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের। প্রত্যেক কাজই তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরই প্রথম যে জন্মতিথি সেই পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

স্বামীজী গরীব দুঃখীদের খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন। স্বামীজীর জীবনের শেষ সময়ে বেলুড় মঠ পরিষ্কার করিতে যে সব সাঁওতালরা আসিয়াছিল, হুঁকা হাতে করিয়া তাহাদের সহিত তামাক খাইতে খাইতে গল্প আরম্ভ করিতেন। একদিন তাহাদের একজনকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?"

সে বলিল, "নারে বাপ্, এখন যে আমাদের বিঁয়া হ'ইছে, তুদের ছোঁয়া নুন খেলে আমাদের জাত যাবেক।"

"বিঁয়া হ'ইছে" মানে এখন আমি বিবাহিত। সুতরাং স্বামীজী বলিলেন, "নুন দেওয়া তরকারি খাবি কেন? আলুনি তরকারি, লুচি আর দই মিষ্টি খাবি, তাতে তো জাত যাবে না।" তাহারা রাজী হইল। তখন স্বামীজীর নির্দেশে আলুনি তরকারি, লুচি ও নানারকম মিষ্টি ও দই দিয়া সেই সব সাঁওতাল ভোজন করানো হইল। স্বামীজী নিজে দাঁড়াইয়া তাহাদের খাওয়ার তদারক করিয়াছিলেন। তাহারা এইসব খাবার খাইয়া খুবই খুশী, "আরে স্বামীজী বাপ্, এমন জিনিসটা তুরা কোথাকে পেলিরে।" আর স্বামীজীও খাওয়াইয়া ততোধিক খুশী, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ তোরা, জ্যান্ত নারায়ণের ভোগ হচ্ছে, দেখে যা।"

রাজা মহারাজের সে সব কথাই মনে ছিল, এ তো সেদিনের কথা। স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক পুরানো কথাও তাঁহার মনে গাঁথা হইয়া আছে। রাজা মহারাজ ভোজের ফর্দ করিতে বসিলেন। বলিলেন, "লুচির দরকার নেই, গরিবেরা ভাত-তরকারিই খেতে ভালবাসে। মাছের মুড়া দিয়ে ডাল রান্না হোক্, মাছ আলু

কপি দিয়ে একটা তরকারি আর রাঙা আলুর টক হোক্। আর দৈ আর বোঁদে, এই হ'লেই হবে।" গোপাল ঢুলী ঢোল কাঁধে লইয়া বালী হইতে হাওড়া পর্যন্ত ঢেরা দিয়া দিল। অনেক দূর হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু সকলেই আহারে পরিতৃপ্ত। বেলুড় মঠে এইটিই স্বামীজীর প্রথম জন্মতিথির উৎসব।

স্বামীজী বেলুড় আর মাদ্রাজে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মায়াবতীর মঠও স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে স্থাপিত হইয়াছে। কাশীতে অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, সেবাশ্রমও একরকম চলিতেছে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামী দেখিলেন মিশনের তত্ত্বাবধানের ভিতর না আসিলে কাশী সেবাশ্রম ঠিকমত চলিবে না, তাই সেটির জন্য একটা জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কাশী সেবাশ্রম আর অদ্বৈতাশ্রম পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হইল। সেবাশ্রমে সেবাকার্যের যাঁহারা কর্মী তাঁহারা সেবাশ্রম হইতেই আহার পাইবেন, কিন্তু অদ্বৈত আশ্রম তপস্যা ও সাধনার স্থান, সেখানে যাঁহারা তপস্যা করিতে আসিবেন তাঁহাদের নিজের আহার্য ভিক্ষা করিয়া নিজেদেরই সংগ্রহ করিয়া নিতে হইবে, ইহাই হইল নিয়ম। স্বামী শিবানন্দ সেখানে অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, এবং খুবই অর্থকষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইল। ব্রহ্মানন্দ স্বামী অদ্বৈত আশ্রমের যাহাতে একটি অর্থভাণ্ডার হয় সেজন্য কাশী গিয়া গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কনখলে স্বামীজীর শিষ্য কল্যাণানন্দজী তিনটি চালাঘর তুলিয়া সেই চালাঘরেই অসুস্থ সাধুদের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছিলেন। কলিকাতার এক ভদ্রলোক জমি কিনিবার জন্য যে টাকা দিয়াছিলেন (পরে আবার তিনি টাকাটা ফিরাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে পনেরো বিঘা জমি কেনা হইয়াছিল। দুজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের অর্থসাহায্যে সেখানে পাকা বাড়ি তোলা হইল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে রাজা মহারাজ বাড়ি তৈরীর কাজে পাঠাইলেন।

এইভাবে বৃন্দাবনেও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানের যিনি ভার লইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল হরেন্দ্রনাথ। তিনি তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, ব্রহ্মচারী ছিলেন। ইনি স্বামীজীর বংশের সন্তান, এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমে অনেক রোগী আসিতেন, তাঁহাদের ইনি চিকিৎসা করিতেন এবং বৃন্দাবনের অধিবাসিগণের বাড়িতেও চিকিৎসা করিতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, ১৩ই ডিসেম্বর একটি অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে স্বামী সারদানন্দ তিনজন সাধুর নামে 'মিস্‌কন্‌ডাক্টের' অভিযোগ আনেন। ইহার মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ, অন্যজন উদ্বোধন পত্রিকার ম্যানেজার স্বামী সত্যকাম এবং তৃতীয়জন ক্যালিফোর্নিয়া লস্‌ এঞ্জেলসের আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত স্বামী সচ্চিদানন্দ (নং ২)।

হরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অভিযোগ আসে যে, তিনি চিকিৎসা করিতে যে সব বাড়িতে যাইতেছেন তাহার এক বাড়ির কোন তরুণী বিধবার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথকে ট্রাস্টিগণের সম্মিলিত মতানুসারে বৃন্দাবন হইতে

বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি ঐ মেয়েটিকেই বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে হরেন্দ্রনাথ বেলুড় মঠে একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করিতে আসেন। বেলুড়ের ঘাটে যখন তিনি নৌকা হইতে নামিতেছেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ দোতলা হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার একজন সেবককে তাঁহাকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এবং তিনি যখন উপরে আসিয়া বারান্দায় রাজা মহারাজের পায়ের তলায় উপুড় হইয়া পড়িলেন, রাজা মহারাজ তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলি? একটা চিঠি লিখেও তো বুড়োকে মনে করিস নি?" তখনই তাঁহার জন্য মাছ আনিতে লোক পাঠাইলেন, বলিলেন, "ও বৃন্দাবনে মাছ খেতে পায় না, ওর জন্য ভাল মাছ আন।" হরেন্দ্রনাথের ডাকনাম ছিল 'নন্দুবাবু'। রাজা মহারাজ তাঁহার সেই ছেলেবেলার নাম 'নাদু' বলিয়াই ডাকিতেন এবং ইতিমধ্যে এই যে ঘটনাগুলি ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কিছুই যেন ঘটে নাই, এইভাবেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর—যখন তিনি 'রাখাল' ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ ছিল, কাহাকেও তিনি ত্যাগ করিতেন না। বিশেষত, হরেন্দ্রনাথের ব্যাপারটিকে তিনি হয়তো দোষ বলিয়াই মনে করেন নাই।

স্বামী সত্যকামও তাঁহার কাছে আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী তখন কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন, সত্যকামও কাছাকাছি কোন স্থানে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে জানাইয়াছিলেন যে, যদি রাজা মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দান ও ক্ষমা করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ক্ষমা করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু একটি শর্তে। সে শর্ত এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সে আশ্রয় পাবে, কিন্তু আমার কাছেই তাকে থাক্‌তে হবে, আমার বিনানুমতিতে একদিনের জন্যও আমার কাছ থেকে অন্য কোথাও যেতে পারবে না।" কিন্তু সত্যকাম এই শর্তে রাজী হইতে পারিলেন না, তিনি হরিদ্বারেই রহিয়া গেলেন। ইহার পর হরিদ্বারের কতকগুলি নাগা সাধুর সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা বাঁধে, দাঙ্গার পর নাগা সাধুরা ফেরারী হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন, সেই সময় সত্যকাম গভর্নমেণ্টের ইন্‌ফরমার হইয়া অনেকগুলি সাধুকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহার স্বভাব যথার্থই তেমন সৎ ছিল না, উদ্বোধনে থাকার সময় শ্রীশ্রীমাও তাঁহাকে সংশোধন করিতে পারেন নাই।

লস্‌ অ্যাঞ্জেলসের স্বামী সচ্চিদানন্দ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে মিশনের বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিকে ছিলেন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় অতি কোমল স্বভাবের এবং অপরদিকে ছিলেন কঠোর শাসক। তাঁহার গাম্ভীর্যের কাছে অতি সাহসীও সহসা অগ্রসর হইয়া কোনও কথা বলিতে পারিত না, আবার বালকের

মত চপলতা ও পরিহাসপটুতা শেষ বয়স পর্যন্তও ছিল। এমন কি মৃত্যু-শয্যাতেও তিনি সকলের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করেছেন।

প্রথম জীবনে তাঁহার কঠোর তপস্যা পুরাকালের তপস্বীদের তপস্যার সমতুল্য, আবার কর্মজীবনেও তিনি শত সহস্র কর্মের মধ্যে মাঝে মাঝে একেবারে সব ছাড়িয়া তপস্যায় চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে জন্মগত 'জাপক' বলিয়াছিলেন, সেটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনেকেই; সকল কর্মের মধ্যেই তাঁহার মন যেন দুইভাগে ভাগ হইয়া থাকিত। এক ভাগ একনিষ্ঠ কর্মতাপস, আর এক ভাগ ছিল সর্বদা ভগবৎভাবে নিমগ্ন সাধক।

তিনি বার বার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া সমস্ত অবশিষ্ট জীবনকাল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, কেবল একবার কোন কারণে যথারীতি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন না হওয়াতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাধু স্বামী অদ্বৈতানন্দ বিনা ভোটেই প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতানন্দ প্রেসিডেণ্ট হন এবং ঐ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষে ২৮শে নভেম্বরই তিনি দেহত্যাগ করেন, তারপর স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবার প্রেসিডেণ্ট হন।

তাঁহার শেষবার পুনর্নির্বাচন হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ। এই ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই তিনি অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছেন। কাশী সেবাশ্রমের বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য তিনি কাশী গিয়া সেখানে থাকিয়া সেখানকার বিশৃঙ্খলা দূর করেন, সেই বৎসর ঠাকুরের জন্মতিথিতে, স্বামীজীর জন্ম-তিথিতে এবং নিজের জন্মতিথিতে তিনি অনেককে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য এবং দীক্ষা দিয়াছেন। প্রথম তিন বৎসর তিনি কাহাকেও দীক্ষা বা সন্ন্যাস দেন নাই, কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি বহুজনকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সভাপতিত্বের প্রত্যেকটি বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে এক একটি উন্নতির সোপান। ব্রহ্মানন্দ স্বামী সারদানন্দ স্বামীর সহযোগিতায় উদ্বোধন মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ১নং মুখার্জি স্ট্রীটে এবং উদ্বোধন পত্রিকার দারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যেও যাহাতে পরিচালনার ব্যাঘাত না হয় সেজন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্বোধনের বাড়ি তৈরীর ভার স্বামী সারদানন্দই লইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী ওখানে থাকিবেন এইজন্য সারদানন্দ ধার করিয়াও বাড়ি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং ধার শোধ করিবার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন।

উদ্বোধন পত্রিকাখানিই রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙলা ভাষায় প্রচার পত্রিকা। স্বামী ত্রিগুণাতীত ক্যালিফোর্নিয়া চলিয়া যাইবার পর দারুণ অর্থাভাবে পত্রিকাখানি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ পত্রিকার ভার লইলেন, কিন্তু আরও দুইজন সহকারীর প্রয়োজন। উদ্বোধন মঠের আর্থিক অবস্থা তখন এতই খারাপ যে, দুইজন কর্মীর আহার দিবার সঙ্গতিও তাঁহাদের নাই। সে সময় বাগবাজার নিবাসী ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ মহাশয় সেই দুইজন কর্মী সাধুর ভার লইয়াছিলেন। পরে এই উদ্বোধন কার্যালয় হইতেই স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-

প্রসঙ্গ প্রভৃতি বাঙলা গ্রন্থ এবং স্বামীজীর রচনার অনুবাদ পুস্তকাবলী (স্বামী শুদ্ধানন্দ এই সমস্ত অনুবাদ করিতেন) এবং আরও অনেক বাঙলা বই প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেভাবে অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে, উদ্বোধন পত্রিকার প্রাথমিক ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন আমেরিকা যান, তখন উদ্বোধন একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। উদ্বোধনের নিজস্ব আস্তানা ছিল না, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনের সারদা প্রেস হইতে গিরীন্দ্রমোহন বসাকের তত্ত্বাবধানে পত্রিকাখানি কোন রকমে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার পর উদ্বোধন কার্যালয় ৩০নং বোসপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়, ইহার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর উদ্বোধন পত্রিকার স্বামী সারদানন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ১নং মুখার্জি লেনে 'মায়ের বাড়ি'তে স্থায়ীভাবে কার্যালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়। এবং স্বামী সারদানন্দ তাঁহার পরিচালনা ও প্রবন্ধ সম্ভারে পঞ্চম বর্ষ হইতে পত্রিকাটিকে নূতনভাবে পুনর্গঠন করেন।

১৯১০ খৃস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে স্বামী সারদানন্দ প্রস্তাব করেন যে, ট্রাস্টিগণের সমক্ষে কতকগুলি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর নাম তালিকাভুক্ত করা হোক্। নামগুলি এই ঃ—

সন্ন্যাসী সদস্য ঃ নির্মলানন্দ, বিরজানন্দ, কল্যাণানন্দ, প্রকাশানন্দ, পরমানন্দ (কেষ্টন), সাধনানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সত্যকাম, প্রিয়নাথ, পূর্ণানন্দ (মাষাবতী), অম্বিকানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, গিরিজানন্দ, সান্ত্বনানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, সোমানন্দ।

ব্রহ্মচারী সদস্য ঃ জ্ঞান, গণেশন, রাসবিহারী, শচীন্দ্রনাথ, কপিল, বিশ্বচৈতন্য, প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), প্রকাশ, যদুনাথ, লালমোহন, রামচন্দ্র, তিনকড়ি, নির্মল, তেজনারায়ণ, রুদ্র চৈতন্য, চন্দ্রনাথ, গুরুদাস (ইনি অ্যামেরিকান), হরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানানন্দ, গঙ্গারাম, অতুলকৃষ্ণ।

ব্রহ্মচারীরা প্রায় সকলেই পরে সন্ন্যাস নিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থানে স্থানে জনসাধারণও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, পরে তাহার অনেকগুলি রামকৃষ্ণ মিশনেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দই এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজেই ছিলেন, কিন্তু পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসেন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, পীড়িত হইয়া কলিকাতায় তিনি উদ্বোধন মঠেই ছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কনখলের সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা হয়। সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কনখলে ছিলেন, তিনিই এই দুর্গাপূজা করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চের অধিবেশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শেষ সভাপতিত্ব করেন। এই সময় বেলুড় মঠের কিছু ঋণ হইয়াছিল। এই ধার শোধ দিবার জন্য সেবার ১৪টি আশ্রম থেকে এইভাবে টাকা দাবী করা হয়ঃ

১। উদ্বোধন আফিস	...	২০০৲
২। গদাধর আশ্রম	...	২০৲
৩। মাদ্রাজ মঠ	...	৫০৲
৪। ব্যাঙ্গালোর মঠ	...	১০০৲
৫। কোয়ালাপুর মঠ	...	৫০৲
৬। মায়াবতী আশ্রম	...	২০০৲
৭। ঢাকা মঠ	...	৫০৲
৮। ভুবনেশ্বর মঠ	...	১০০৲
৯। বেনারস অদ্বৈত আশ্রম	...	২০৲
১০। এলাহাবাদ মঠ	...	২০৲
১১। বিবেকানন্দ আশ্রম	...	১০৲
১২। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি	...	৫০০৲
১৩। সান ফ্রান্সিসকো বেদান্ত সমিতি	...	৫০০৲
১৪। বোস্টন বেদান্ত সমিতি	...	৫০০৲

এই প্রতিষ্ঠানগুলি সে সময় রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামী পরমানন্দের আনন্দ আশ্রম পরে মিশন হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল।

মিশনের বাহিরের ও ভিতরের যে সব ঝড় ঝাপ্‌টা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিলে একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মত নেতা না থাকিলে হয়তো সে সময় রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হইত।

বহু বিপ্লবী ছেলে মিশনের অনুরাগী হইয়া সেবাকার্য প্রভৃতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই সেবাকার্য পরিচালনের ভার প্রধানত স্বামী সারদানন্দের উপরেই ছিল। সেজন্য বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা হইত। কোন কোন বিপ্লবী ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়াছিল। এদিকে স্বামীজীর গ্রন্থগুলির অনুবাদ উদ্বোধন আফিস হইতে বাহির হইতেছিল এবং সেগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এইসব কারণে ইংরাজ গভর্নমেন্টের বিরূপ দৃষ্টি মিশনের উপর পড়িল।

সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় ছিলেন না, স্বামী সারদানন্দকেই সমস্ত ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইয়াছিল। বিপ্লব আন্দোলনের মূলে যে স্বামীজীর প্রভাব বিশেষভাবেই আছে, ইহা গভর্নমেন্টের প্রচারিত অ্যাডমিন্‌-স্ট্রেশন রিপোর্টে ঘোষণা করা হইল। তাহাতে লেখা হইল "নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক এক ভদ্রলোকই এই প্রতিক্রিয়ার মস্তিষ্ক।"

নিবেদিতাকেও এই একই কারণে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বাহির করিতে হইয়াছিল, কেননা হয়তো নিবেদিতার কার্যাবলীতে রামকৃষ্ণ মিশন বিপন্ন হইবে।

শচীন, সতীশ ও প্রিয়নাথ এই তিনটি ছেলেকে স্বামী সারদানন্দ আশ্রয় দিয়াছিলেন, দেবব্রতও উদ্বোধন-মঠে ছিলেন। ইঁহারা পুলিসের সন্দেহভাজন, পুলিস সব সময় ইঁহাদের উপর নজর রাখিত। ইঁহাদের উপর হইতে পুলিসের নজর দেওয়া যাতে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়, তাহার জন্য স্বামী সারদানন্দ মাননীয় পি সি লায়নের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদের বুঝাইয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল যখন বাংলা দেশ হইতে চলিয়া যান, তাহার আগে একটা বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ মিশনকে বিপ্লবীদের আড্ডা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, স্বামী সারদানন্দ বম্বে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাইবার ফলে তিনি কথাটি ফিরাইয়া নেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সবগুলি সংবাদপত্রই গভর্নমেণ্টের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় খুব জোরের সহিত গভর্নমেণ্টের এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এবং সে যাত্রা রামকৃষ্ণ মিশন বিপদ কাটাইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠান যখন প্রসারলাভ করে, তখন নানাভাবে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হয়, কাশী সেবাশ্রমেও এইরকম একবার খুবই গোলমাল হইয়াছিল। অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রম দুটি আশ্রম পাশাপাশি এবং দুটিতে বরাবরই কোন না কোন বিষয় লইয়া বিরুদ্ধ ভাব চলে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই রকম বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে সেবাশ্রমের মধ্যে দুইদল হইয়া গেল এবং কাজের ব্যবস্থা লইয়া দুই দলে বিরোধ বাধিল—ইহার পর তৃতীয় দলস্বরূপে রহিলেন অদ্বৈতাশ্রম। ইহাতে বিরোধ আরও প্রবল হইতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দ এই বিরোধের মীমাংসার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহার দিনলিপিতে প্রত্যেকটি ঘটনাই টোকা থাকিত। এই বিরোধের বিবরণটিও সেখানেই পাওয়া যায়।

শরৎ মহারাজ কাশী রওনা হইলেন ৮ই অগ্রহায়ণ—সঙ্গে ছিলেন সান্যাল মহাশয়, যোগীনমা ও স্বামী ভূমানন্দ। সান্যাল মহাশয় গৃহী-সাধু হইলেও শরৎ মহারাজ ইঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন এবং সব সময় ইঁহার পরামর্শ লইতেন।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "শরতের রক্ত মাছের রক্তের মত, কিছুতেই তাতে না।" বাস্তবিক তাঁহার মত এমন ধীরবুদ্ধি সাধু খুব কমই দেখা যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে তাঁহার দানই সর্বাগ্রগণ্য, একথা অসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তিনি ছিলেন স্বামীগতপ্রাণ, আবার ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি, তাহার তুলনা হয় না। গুরু-ভ্রাতাগণকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন এবং সহজে কাহারও দুর্বলতা দেখিতেন না। কিন্তু এই ভালবাসার দিক দিয়া তাঁহার নিজেরও একটু দুর্বলতা ছিল, তিনি যাহাদের ভালবাসিতেন, অনেক সময় অতিরিক্ত ভালবাসার জন্যই তাহাদের দোষগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া যাইত, ইহাতে পরিণামে বিপদ ঘটিত। তাঁহার

নিজের সম্মানের দিকে একেবারেই স্পৃহা ছিল না এবং তিনি ছিলেন 'অমানী মানদ।'

কাশীতে আসিয়া তিনি অদ্বৈতাশ্রমে রহিলেন এবং সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি এখানে কারও বিচার করতে আসিনি। সেবাশ্রমের কাজ এত বেড়ে গিয়েছে যে, তাতে কাজে বিশৃঙ্খলা হওয়াই স্বাভাবিক, এতে কারও দোষ নেই। তাই আমি কতকগুলি নিয়ম করতে চাই, যাতে কাজগুলি বেশ সুশৃঙ্খলে চলে যায়।" হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন সেবাশ্রমে ছিলেন। ইনি শরৎ মহারাজকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ যখন ২০০ টাকা মাহিনা দিয়া একজন অস্ত্রচিকিৎসক রাখিবার কথা বলিলেন, তখন তিনি কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছিলেন, "মাহিনা দিয়া লোক রাখা স্বামীজী কখনই পছন্দ করিতেন না।"

এ মন্তব্য অতি শীঘ্রই স্বামী সারদানন্দের কানে আসিল, তিনি হরি মহারাজের কাছে গিয়া বলিলেন, "হরি ভাই, আমি যদি স্বামীজীর ভাবের বিরুদ্ধে কোন কিছু কর্তে চাই, তাহলে তোমারই উচিত আমাকে ঠিক পথে চালানো।"

হরি মহারাজ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন ও বলিলেন, "না, না ভাই, সে কি কথা? তুমি যা বলেছ, তাতে আমার কোন অমত নেই।"

কিন্তু যাঁহারা বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বলিলেন, শরৎ মহারাজের এই নূতন নিয়মগুলি যতক্ষণ না স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বীকার করিয়া নিতে বলেন, ততক্ষণ তাঁহারা মানিতে বাধ্য নহেন।

শরৎ মহারাজ এই কথাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন—"বেশ, বেশ, তাই হোক্।"

সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে ঘটনাটি জানানো হইল, তিনি এক কথায় উত্তর জানাইলেন, "শরৎ যাহা করিতেছে তাহা আমারই ব্যবস্থা বলিয়া জানিবে।" ইহার পর আর আপত্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তখন নূতন নিয়ম সম্বলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইল। এবং স্বামী সারদানন্দ সকল পক্ষের লোককেই কমিটিতে গ্রহণ করিলেন। চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ), কালীবাবু (স্বামী কালিকানন্দ) উভয়কেই ডাকিয়া দুজনের উপরেই এই নূতন ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিবার ভার দিলেন। এবং ইহার পর হইতে মেয়ে-রোগীদের বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল, মেয়ে-সেবিকা ভিন্ন সেখানে পুরুষের প্রবেশের অধিকার রহিল না। ইহার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী গিয়া আর এক নূতন প্রণালীতে একেবারে বিবাদের মূল উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেখিলেন, বিবাদটা আসলে সেবাশ্রমের গৃহী ও সন্ন্যাসী সদস্যগণের বিবাদ। তিনি চারুবাবু ও কালীবাবু উভয়কেই বুঝাইলেন যে, তাঁহারা যখন স্বামীজীর কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কাজের দিক দিয়া এবং অন্যসব দিকেই মঙ্গল।

এইভাবে তিনি চারুবাবু, কালীবাবু ও আরও অনেককে সন্ন্যাস দিয়া বিরোধের মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন।

স্বামী সারদানন্দ সেবাকার্যের ভার লইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে ক্রিয়াশীল ও সজীব রাখিয়াছিলেন। এই সেবাকার্যের তালিকা দিতে গেলে তালিকা খুবই দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল সেবার দিক দিয়া নয়, প্রচারকার্যের দিক দিয়াও তাঁহার কৃতিত্ব কম নয়।

উদ্বোধন মঠ স্থাপনে তাঁহারই বেশীর ভাগ কৃতিত্ব। "মায়ের মন্দির স্থাপন করবো, মা সেখানে এসে অধিষ্ঠান করবেন"—এইটি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং "আমি মায়ের বাড়ির দারোয়ান" এইটিই তাঁর গর্বের বিষয় ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে আসেন, সেই অবধি কলিকাতার অনেক মেয়ে শ্রীশ্রীমার সংগলাভের অধিকারী হইয়াছিল। এটি স্বামী সারদানন্দের জন্যই হইয়াছিল।

স্বামীজীর দেহান্তরের পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম ক্যালভে বেলুড় মঠ দেখিতে আসেন। ম্যাডাম ক্যালভে ফ্রান্সের বিখ্যাত গায়িকা, স্বামীজীর তিনি একান্ত অনুরক্তা ও ভক্ত হইয়াছিলেন। আজ তিনি ভারতবর্ষে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও সমাধিস্থান দেখিতে আসিয়াছেন।

ম্যাডাম ক্যালভে ইংরাজীও জানিতেন না, সেজন্য তাঁর সংগে একজন দোভাষী ছিল। তিনি প্রথমেই স্বামীজীর সমাধি মন্দির দেখিতে গেলেন। সে সময় স্বামী সারদানন্দ ও স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দুইজনেই মঠে ছিলেন। তাঁরাও তাঁর সংগে সংগে চলিলেন। ম্যাডাম ক্যালভে হাতে করিয়া ফুল নিয়া গিয়াছিলেন, স্বামীজীর সমাধি মন্দিরে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া সেই ফুল দিয়া অর্ঘ্য দিলেন। এই সময় ব্রহ্মানন্দ স্বামী আসিলেন, ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে দেখিয়াই ম্যাডাম ক্যালভে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পরিচয় শুনিবামাত্র তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিলেন, যেন তিনি কতদিনের পরিচিত।

স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ঠাকুরঘরে নিয়া গেলেন। সে সময় স্বামীশিষ্য সংবাদ-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাডাম ক্যালভে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "আপনি যদি বৈদিকমন্ত্র কিছু পাঠ করিয়া শুনান তবে বিশেষ সুখী হইব।" সারদানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্বামীজী একটি বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ 'অন্ধকার হইতে আমাদের আলোকের পথে লইয়া চল', আপনি সেটি জানেন কি?" দোভাষী ইংরাজীতে এই কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলে স্বামী সারদানন্দ সেই "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়" প্রার্থনামন্ত্রটি আবৃত্তি করিলেন। তাহার পর ম্যাডাম একটি গান গাহিয়াও ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দের ম্যাডাম ক্যালভের সহিত পূর্বেই পরিচয় ছিল, সেইজন্য

ম্যাডাম ক্যালভে সে সময় সারদানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য গুপ্ত মহারাজ দেহত্যাগ করেন। ইনি হাতরাস স্টেশনের কর্মচারী ছিলেন, সেখানেই স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হয়। ইনি বাঙ্গালী এবং বৈদ্যবংশীয়, কিন্তু অনেকদিন পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া তাঁহার কথায় পশ্চিমা টান হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হইয়াছিল "স্বামী সদানন্দ"। স্বামীজীর ইনি বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী ইনি দেহত্যাগ করেন, এবং সেই বৎসর ২১শে আগষ্ট রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীও উদ্বোধন আফিসের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। এবং সেই বৎসরই ভগ্নী নিবেদিতাও ১৩ই অক্টোবর তারিখে দার্জিলিং-এ মহাপ্রয়াণ করেন।

গুপ্ত মহারাজ অসুস্থ হইয়া প্রায় দুই বৎসর শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেনের বসুপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। বশীশ্বর সেন স্যার জগদীশ বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান সাধনার ছাত্র ও সহকারী ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

মঠের অপর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ)। তিনি মঠের অল্পবয়স্ক সাধু বা ব্রহ্মচারীগণের মাতৃস্থানীয় ছিলেন। শশী মহারাজ বরানগর মঠে যেভাবে তাঁর গুরুভাইদের পরিচর্যা করিতেন, ইনি ঠিক সেইভাবেই মঠের সকলের পরিচর্যা করিতেন। তবে বরানগরে ছিলেন অল্প কয়েকজন মাত্র। আর বেলুড় মঠে দিনে দিনে ব্রহ্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল। হয়তো অসময়েও অনেক ভক্ত আসিয়া পড়িতেন, তখন খাবার সময় নয়, অথচ যিনি আসিয়াছেন বা যাঁহারা আসিয়াছেন সকলেই ক্ষুধার্ত। বাবুরাম মহারাজ তখন ডালচালের খিচুড়ি চড়াইয়া দিতেন, যেমন করিয়াই হউক, কোনরকমে আগন্তুকদের খাওয়াইয়া তবে শান্তি পাইতেন।

মঠের লোকসংখ্যা ছিল বেশী, আহার্য সে অনুসারে সংক্ষিপ্ত। ব্রহ্মচারী ছেলেরা সকালে মুড়ি জলখাবার পাইত, কিন্তু সেই মুড়ি এত শীঘ্র ফুরাইয়া যাইত যে, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আসিতে আসিতে অনেকের ভাগ্যে মুড়ি জুটিত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ ছিল, তাঁহার ঘরে যাহা কিছু থাকিবে যদি কেহ খাইতে না পাইয়া থাকে, সে যেন আসিয়া সেই জলখাবার লইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেন এক প্রেমের সূত্রে গ্রথিত বিশাল পরিবার। এই পরিবারে নানা বিভাগ, অথচ প্রত্যেক বিভাগ যেন সকলের সহিত সকলেই এক ও অখণ্ড। যেন এক মহান্ বনস্পতির শাখা প্রশাখা, একই ভূমি হইতে অমৃতরস আহরণ করিয়া একই দীপ্তিময় সূর্যের আলোকে সঞ্জীবিত হইয়া দিনে দিনে বর্ধিত ও প্রসারিত হইতেছে ও সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবহির্ভূত নানা দেশেও কল্যাণময়ী ছায়া ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণশক্তি বিতরণ করিতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি Memorandum পুস্তিকা বাহির হয়। তাহাতে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বিবৃতি ছিল। এ সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দই প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই সময় সমিতির গভর্নিং বডির সদস্যগণের যে নাম তালিকায় আছে তাহা এইরূপ ;

১। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ২। সারদানন্দ, ৩। প্রেমানন্দ, ৪। শিবানন্দ, ৫। অখণ্ডানন্দ, ৬। সুবোধানন্দ, ৭। তুরীয়ানন্দ, ৮। শুদ্ধানন্দ, ৯। স্বামী বোধানন্দ, ১০। আত্মানানন্দ, ১১। সচ্চিদানন্দ (১), ১২। বিরজানন্দ, ১৩। অচলানন্দ, ১৪। শঙ্করানন্দ, ১৫। মহিমানন্দ, ১৬। ধীরানন্দ, ১৭। নির্ভয়ানন্দ।

এই সতেরো জনই তখন বেলুড় মঠের ট্রাস্টি ছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বামী অভেদানন্দ সে সময় আমেরিকায় ছিলেন সেজন্য তাঁহাদের স্থানে স্বামী অচলানন্দ, শঙ্করানন্দ, মহিমানন্দ, ধীরানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ—এই পাঁচ জনকে ট্রাস্টিগণের মধ্যে লওয়া হইয়াছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন যখন রেজেস্ট্রী করা হয় তখন যে আটজন ট্রাস্টি ছিলেন তাঁহাদের নাম এবং কি কি কার্যের ভার তাঁহারা গ্রহণ করিযাছেন তাহাও এই মেমোরেণ্ডাম বইতে আছে। মিশন রেজেস্ট্রীর সময়ে যে নিযম করা হইয়াছিল সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছিল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে পঞ্চম সাধারণ কর্মবিবরণীর একখানি পুস্তিকা উদ্বোধন আফিস হইতে বাহির হয়। ইহাতে মিশন কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। প্রধান মঠগুলির নাম এইরূপঃ—১। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ, ২। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন আফিস), ৩। গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর ; ৪। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস সিটি ; ৫। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, আলমোড়া ; ৬। ময়ালপুর রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ; ৭। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর ; ৮। ব্রহ্মানন্দ আশ্রম, ত্রিবেন্দ্রাম ; ৯। তীরুভেলা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ত্রিবাঙ্কুর), ১০। বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতাল ; ১১। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খর (বোম্বাই), ১২। পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৩। উটকামণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৪। মাইশোর রামকৃষ্ণ আশ্রম।

অন্যান্য মঠ ও আশ্রম

১। মুন্সীগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (এলাহাবাদ), ২। আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর (হিমালয় প্রদেশ), ৩। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৪। ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৫। কিষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দেরাদুন), ৬। মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ

আশ্রম (রাঁচি), ৭। জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (সাঁওতাল পরগণা), ৮। জয়রামবাটী মাতৃমন্দির (বাঁকুড়া), ৯। আলেপ্পি ও অন্যান্য স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ত্রিবাঙ্কুর), ১০। কুইলান্দী এবং ওত্তাপালামের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ (ব্রিটিশ মালাবার), ১১। পন্নামপেট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কুর্গ), ১২। নাট্রারামপালী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তম আর্কট), ১৩। রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৪। দিল্লী রামকৃষ্ণ মঠ, ১৫। নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

বৈদেশিক কেন্দ্রসমূহ

১। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি (ইউ এস এ), ২। সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (ইউ এস এ), ৩। শান্তি আশ্রম (ক্যালিফোর্ণিয়া), ৪। পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটি (উরেগোঁয়া), ৫। বোস্টন বেদান্ত কেন্দ্র (ম্যাস্), ৬। লস এঞ্জেলস আনন্দ আশ্রম (ক্যালিফোর্ণিয়া), ৭। কুয়ালালামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (সম্মিলিত মালয় স্টেটস), ৮। বেদান্ত সোসাইটি, প্রভিডেন্স।

মিশন প্রপার

হেডকোয়ার্টার্স বেলুড়ে

১। দাতব্য ঔষধালয়, বেলুড়; ২। অস্থায়ী রিলিফের কাজ, ৩। অন্যান্য জনহিতকর কার্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের শিল্প-বিদ্যালয় (বেলুড়)

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত জনহিতকর কার্যঃ—১। বেনারস রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ২। কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হরিদ্বার), ৩। রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ৪। বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ৫। এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ৬। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন শাখা কেন্দ্র, ৭। নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (ঢাকা), ৮। বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ৯। রামকৃষ্ণ মিশন আউটডোর ডিসপেন্সারী, ভুবনেশ্বর; ১০। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া), ১১। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম লক্ষ্ণৌ, ১২। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বালিয়াটি (ঢাকা), ১৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সোনারগাঁ, ১৪। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতি (সিলেট), ১৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতি, হবিগঞ্জ—সিলেট; ১৬। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ভারুইকাটি; ১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কণ্টাই (মেদিনীপুর)। ইহা ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম ও ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়—এ দুটিও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত। দেওঘরের বিদ্যাপীঠ, বরানগরের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এবং ঢাকায় একটি ফ্রি স্কুল আছে। সরিসায় একটি আশ্রম আছে এবং জামসেদপুরে বিবেকানন্দ সোসাইটি ও সিলোনের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এগুলিও কতকটা স্কুলেরই মত। আরও ৮।১০টি আশ্রমের নাম এখানে দেওয়া হইল না, সেগুলিও সমস্তই রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্লিষ্ট বা অন্তর্ভুক্ত। রেঙ্গুনের আশ্রমটি পরে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপানীদের

আক্রমণের সময় ধ্বংস হইয়া যায়। স্বামী শ্যামানন্দ এই মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিরতির পর আশ্রমটি আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মাদ্রাজ-ময়ালপুরের স্টুডেণ্টস হোমটি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে গরীব ছেলেরা যাহাতে অবৈতনিকভাবে আশ্রয় ও শিক্ষা পায় সেইজন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে সামান্য আকারে আরম্ভ হইয়াছিল পরে ইহার বিশেষভাবেই প্রসার হইয়াছিল। এই প্রসারের মূলে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন মাদ্রাজী গৃহী শিষ্য, ইঁহার নাম ছিল রামস্বামী আয়েঙ্গার। ইনিই মাদ্রাজ স্টুডেণ্টস হোমের প্রথম পরিচালক এবং স্টুডেণ্টস হোমেই ইনি থাকিতেন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় মাদ্রাজ স্টুডেণ্টস হোমের দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বলিতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত বিদ্যাপীঠের মধ্যে মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠানটিই অগ্রগণ্য।

ইহার অর্থভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল এবং একটি হাই স্কুল ও একটি শিল্প বিদ্যালয় আশ্রিত বালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপন করা হইযাছিল। ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৩ জন হইয়াছে। এর মধ্যে ৭৭ জন হাইস্কুলের ছাত্র, ৩ জন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং অন্যান্য ছেলেরা নানা বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা করিতেছে। এইসব ছেলেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয় শ্রেণীরই ছেলে আছে। যদিও মাদ্রাজ জাতিভেদ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও ছিলেন অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই বিদ্যাপীঠে জাতিভেদ একেবারেই ছিল না। এই স্টুডেণ্টস হোমটি শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর জীবনব্যাপী সাধনার একটি প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। ইহাতে একাধারে চারিত্রিক উন্নতি ও জীবন-সংগ্রামে শক্তির বিকাশ—ছেলেদের জীবন এই উভয় দিক দিয়াই গঠিত হইতেছিল। ইহার সঙ্গে একটি লাইব্রেরীও স্থাপিত আছে।

এখানকার ছেলেরা যেমন ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইত, সেই সঙ্গে আবার পীড়িতের সেবা, আর্তত্রাণ সম্বন্ধেও শিক্ষা পাইত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অথবা স্বামীজীর জন্মোৎসবে এই ছাত্রগণ তিন-চার হাজার গরীব লোককে খাওয়ানোর কাজ নিপুণতার সঙ্গে সমাধা করিত, আবার প্রতি শনিবারের সন্ধ্যায় কাছাকাছি গরীবপাড়ায় ল্যাণ্টার্ন-লেকচার দিত এবং এইভাবে গরীবদের পাড়ায় স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে অজ্ঞানতা দূর হয় তাহার চেষ্টা করিত।

কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোমটি আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা একদিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটি হস্টেল এবং অপর দিক দিয়া একটি নৈতিক শিক্ষা-নিকেতন।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্থাপন

করেন। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় নারীগণের মধ্যে তাঁদের কৌলিক উচ্চভাবগুলি যেন বিশেষভাবে পুনরায় জাগ্রত হয়, সেজন্য জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সিস্টার ক্রিশ্চিনাও স্কুল পরিচালনে তাঁহার সহকারিণী ছিলেন এবং পরিচালিকাগণের যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সঙ্কুলান করিবার ভার মিশন কর্তৃক ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত ছিল। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। বর্তমানের স্কুলের অট্টালিকাটি তাঁহারই প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে তৈরী হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভার পড়িয়াছিল কুমারী সুধীরা বসুর উপর। ইনি বিখ্যাত বিপ্লবী দেবব্রত বসুর (যিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নাম গ্রহণ করেন) ভগিনী। ইনি বিদ্যালয়ের সুপরিচালিকা এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং স্বামী সারদানন্দের অশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৃন্দাবনধাম হইতে ফিরিবার সময় ট্রেন-দুর্ঘটনায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দও মহাপ্রয়াণ করেন এবং ইনিই ছিলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষক। ইহার পর কাণ্ডারীহীন নৌকার মত নিবেদিতা বিদ্যালয় অনেক বিপদ ও দুর্গতির মধ্যে পড়িয়াছিল; কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ও ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যবলে নিবেদিতা বিদ্যালয় এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সম্প্রতি একটি ব্রহ্মচারিণী মঠও স্থাপিত হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার দেওঘর বিদ্যাপীঠ, ঢাকার অবৈতনিক বিদ্যালয়, ডায়মণ্ডহারবার, সরিসার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিংহলের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ, জামসেদপুরের বিবেকানন্দ সোসাইটি—এগুলিও বিদ্যানিকেতন ও ছাত্রদের আশ্রয়স্থান। সিংহলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় নয়টি শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণের দ্বারা স্থাপিত অনেকগুলি শিক্ষানিকেতনও আছে, যেমনঃ- বাঁকুড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মালদহে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মেদিনীপুর গড়বেতায় সারদা পীঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ময়মনসিংহের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ফরিদপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং সিঙ্গাপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই বিস্তৃতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সভাপতিত্বের সময় এবং বিশেষ করিয়া তাঁহারই চেষ্টায় হইয়াছিল। তাঁহার দেহান্তের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল একটি অধিবেশনে স্বামী শিবানন্দকে প্রেসিডেন্টরূপে গ্রহণ করা হয়। ইনি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ এই সময় বিদেশ হইতে ফিরিয়া বেলুড় মঠেই ছিলেন। কিন্তু পরে ইনি স্বতন্ত্র আশ্রম স্থাপন করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল একটি অধিবেশনে শিবানন্দ স্বামীর সভাপতিত্বের সময় আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই সময়

স্বামী শিবানন্দ তাঁহার অসুস্থতার জন্য কয়েকবার অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই রামকৃষ্ণ মিশনে 'সন্ন্যাসী মহাসম্মেলন' আহ্বান করা হইয়াছিল।

এই মহা-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নানাদেশস্থ বিভিন্ন শাখা হইতে কর্মী সন্ন্যাসীগণ এই সম্মেলনে একত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং থাকিবার জায়গার অভাবের জন্য বেলুড় মঠের কাছে দুটি বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল। এত লোকের খাওয়া, চা ও জলখাবার এবং শয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা স্বামী সারদানন্দের পরিচালনে নিখুঁতভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই সম্মেলনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে এককথায় বলা চলে যে, সম্মেলনটি খুবই বিরাট হইয়াছিল। একদিকে সে সময় দিনের পর দিন সম্মেলন চলিতেছে, অন্যদিকে কলকাতায় চলিতেছে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা। সেজন্য সম্মেলন সম্বন্ধে কতকটা অসুবিধা হইলেও সম্মেলনটি সম্পূর্ণভাবেই সাফল্যলাভ করিয়াছিল। আটদিন ধরিয়া এই সম্মেলন চলিতেছিল এবং প্রতিদিন দুবার করিয়া সম্মেলনের অধিবেশন বসিত। প্রথম অধিবেশন হইত সকাল সাতটা হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধিবেশন হইত বৈকাল ২-২৫ মিনিট হইতে ৫-৩০ পর্যন্ত। আধ ঘণ্টা করিয়া বিরতি থাকিত। অধিবেশন বসিবার ১৫ মিনিট আগে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সকলকে জানানো হইত যে, অধিবেশন বসিবার সময় হইয়াছে এবং আরম্ভ হইবার আগে বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও ভজন সংগীত প্রভৃতি হইত।

এই সম্মেলনে স্বামীজীর আমেরিকার কতিপয় শিষ্যাও যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—মিস্ জে ম্যাকলিয়ড, মিসেস সি ফ্রেণ্ড এবং অ্যামেরিকার ব্রুস্টার পরিবারের কয়েকজন মহিলা। এঁদের গেষ্ট হাউসে থাকিবার জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয়া মহিলা,—যাঁহারা স্টাফের মেম্বর, তাঁহারাও সম্মেলনের দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

গান-বাজনায় যাঁহারা অভিজ্ঞ, সাধুদের সেইরকম কয়েকজন সন্ধ্যাবেলায় গান-বাজনার আসরে যোগ দিয়াছিলেন। এই গান-বাজনার আসরটিও ছিল উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানের গাইয়ে-বাজিয়ে এই আসরে যোগ দিয়াছিলেন। জ্ঞান গোস্বামী এই আসরে গান গাহিয়াছিলেন।

৮ দিন ধরিয়া এই মহাসম্মেলন চলিয়াছিল। ১লা এপ্রিল প্রথম সম্মেলনেব উদ্বোধন হয় এবং শেষ হয় ৭ই এপ্রিল। ৮ই এপ্রিল একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া মহাসম্মেলন শেষ হয়। এই মহাসম্মেলনে বহু বক্তা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—ইঁহাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট গৃহী ও মনস্বীও ছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছিঃ—

রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর (তৃতীয় দিন)। ঐদিন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্রের প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চতুর্থ দিনে সকালে স্বামী বিরজানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বৈকালের অধিবেশনে প্রিন্সিপাল কামাখ্যা মিত্র মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বিকালের অধিবেশনে বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর কলিকাতা স্টুডেন্টস হোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারী স্বামী নির্বেদানন্দ একটি বক্তৃতা দেন এবং স্বামী নিখিলানন্দ "রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্মতৎপরতা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত কালীকীর্তন হয়।

৫ই এপ্রিল অধিবেশনের পঞ্চম দিন। সকালে স্বামী বিরজানন্দ সভাপতি হন এবং বৈকালের অধিবেশনে স্বামী সারদানন্দ সভাপতিত্ব করেন। এই বৈকালের সভাগুলি জনসাধারণের সভা, সেজন্য ইহাতে বিপুল জনসমাগম হয়। কতকগুলি মহিলাও শ্রোতাদিগের মধ্যে ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বাঙলায় বক্তৃতা করেন। যাঁহারা বাঙলা জানেন না, তাঁহাদের জন্য বক্তৃতাটি ইংরাজীতে পরে অনুবাদ করা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে ধর্ম ও দর্শন।"

প্রেসিডেন্টের আহ্বানে আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পরমানন্দ উঠিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর বিভিন্ন ব্যক্তি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং কেহ কেহ বক্তৃতাও করেন।

এইদিন তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার "নবযুগের সংগ্রাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ষষ্ঠ দিনে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে কতকগুলি রিজলিউসন পঠিত হয়। সর্বশুদ্ধ নয়টি রিজলিউসন গৃহীত হইয়া তাহা সম্মেলনের ট্রাস্ট কমিটি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির নিকট পাঠানো হয়।

সপ্তম দিন সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনের শেষদিন এবং সেইদিন সন্ধ্যায় অভিনয় ও নানারকম ক্রীড়াকৌতুক হয় এবং অষ্টম দিনে একটি এক্সট্রা-অর্ডিনারী মিটিং হয়।

এই অধিবেশনে ডাক্তার ডি এন মৈত্র (বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ) একটি বক্তৃতা দেন।

ডাক্তার সরসীলাল সরকার* (সিভিল সার্জন নোয়াখালী) পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন।

চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্‌চার অফিসার শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার দেব "বাঙলার কৃষির উন্নতি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

এবং ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "এপিডেমিক ডিজিজ্‌ এবং সে বিষয়ে

---

*ইনি প্রবন্ধ-লেখিকার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সামাজিক কর্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। ডাক্তার চ্যাটার্জী যখন ম্যাজিক-লণ্ঠনসহযোগে কিভাবে জীবাণুর দ্বারা সংক্রামক রোগ সংক্রামিত হয়, তাহা দেখাইতেছিলেন তখন কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল যে, দাঙ্গা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি অধিবেশন শেষ করা হইল।

সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই সম্মেলন আহ্বানের একটি বিশেষ কারণ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সমস্ত মঠবাসীর একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে মঠে কোনরূপ বিপ্লব ও গোলমাল কিছুই হয় নাই। রামকৃষ্ণ মিশনে কোন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে নাই।

কিন্তু তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর মঠের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ আরম্ভ হইল। তরুণ সাধুগণ ও ব্রহ্মচারিগণ ক্ষমতা-প্রয়াসী হইলেন, প্রাচীন সাধুগণের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকা তাঁহারা যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের কার্যে ও কথায় অনেক সময় এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইতেছিল।

এই মহাসম্মেলনের মাধ্যমে যে নূতন কার্যপ্রণালী রচনা করা হইল, তাহার ফলে কার্যকরী সমিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বা সেক্রেটারীকে গ্রহণ করা হইল না, তবে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণের মধ্যে তাঁহাদের নাম রহিল। ইহার ফলে পূর্বে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা হ্রাস হইয়া সেই ক্ষমতা কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের উপর ন্যস্ত হইল।

স্বামী সারদানন্দ নবীন সাধুগণের এই মনোভাবে যদিও দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই পরিবর্তন প্রয়োজন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, এইসব নবীন সাধু- যাঁহারা স্বামীজীর আদর্শ মাথায় লইয়া ত্যাগধর্মে ও সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন ক্ষমতালুব্ধ না হইয়া যে প্রেরণার আহ্বানে গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই প্রেরণাকেই তাঁহাদের যাত্রাপথের ধ্রুবতারাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত কর্মতপস্যায় তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক মহান্ তপস্বী হন এবং রামকৃষ্ণ মিশনকেও জয়যুক্ত করেন।

স্বামী সারদানন্দের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণটি এখানে পুরাপুরিই দেওয়া হইলঃ—

এটি স্বামী সারদানন্দের অভিভাষণের বাঙলা অনুবাদ।

"যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায় সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্বে প্রথমে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তাহার সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। যে কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেই হয়—ইহা যেন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকৃতি সর্বত্রই সমান—তখন কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে জগতের সর্বত্রই এই নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ, নীতি, রাজনীতি বা ধর্ম—যে কোন ক্ষেত্রেই বলা যাক্ না কেন, যদি

তুমি কোন নূতন সংস্কার করিতে চাও, তবে দেখিবে তোমার চারিপাশের লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগিবে। আর তোমার প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলনের ভাবগুলি প্রচলিত ভাবসমূহ হইতে যতই নূতন হইবে, বাধা ততই প্রবলতর হইবে। লোকে বলিবে, উক্ত নব-আন্দোলনের মূলে যে ভাবসমূহ—যে আদর্শ বিদ্যমান, তাহার প্রভাবে বর্তমান সমাজের যাহাকিছু ভাল ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহার ভিত্তি পর্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ প্রাণশক্তি থাকে, যদি ঐ নূতন আন্দোলন মানব-প্রকৃতির ও তাহার বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্যাবলীর পরিচালক সার সত্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রবল বাধা সত্ত্বেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবহৃদয়ে উহা স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিবে। এই বাহিরের বাধার সংঘাতই ঐ আন্দোলনকে নিজের শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ ও কার্যকরী করিতে সহায়ক হইয়া থাকে—সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ বাধাকেও অহিতকর বলিতে পারা যায় না।

"কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা-আপনি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যাহারা প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল তাহারাই বলিতে থাকে,—দেখ, এই যে আন্দোলন দেখিতেছ ইহাতে নূতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে অমুক অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্বেই এ সকল কথা জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন। অতএব এগুলি লইয়া অধিক মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থার বাধা অপসারিত হওয়ায় ঐ আন্দোলন বহু দূরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সমাজের একটা স্থান অধিকার করিয়া বসে, উহাকে বাধা দিবার, উহার বিরুদ্ধে লাগিবার আর কেহ থাকে না।

"সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে। তবে ঐ আন্দোলনের উন্নতির ইতিহাসে এইরূপ সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলেই যে ঐ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে এমন মনে করা উচিত হইবে না। কারণ, বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছিয়া প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাঁটা পড়ে আর প্রথম অবস্থায় ঐ আন্দোলনের প্রবর্তকগণের মধ্যে ভাবের যে গভীরতা ও উদ্দেশ্যের যে একতা ছিল হঠাৎ

বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহিরের বাধার স্থানে উহার অঙ্গগণের বিভিন্ন মতামতের ফলে একটা অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথম অবস্থায় যথার্থ সত্যের জন্য যে প্রবল স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল তাহার স্থানে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপস করিয়া সমাজে একটা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা এবং ভিতরের যথার্থ জিনিসটার বদলে বাহিরের চাকচিক্যের দিকে, লোককে দেখাইবার দিকে একটা ঝোঁক হয়—বিশেষত যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না করিয়া আরামে জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবত এই দিকেই প্রবৃত্তি হয়। আর যদি ঐ আন্দোলনের নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগ্রত না থাকেন অথবা ঐ সকল দোষের উৎপত্তিতে বাধা দিবার জন্য দোষগুলিকে সমূলে বিনাশের জন্য কোনরূপ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া ঐ অবস্থাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহার ফল যে কি হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত এবং প্রধানত যতই স্বার্থের ভাব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমের সূত্রে এতদিন সকলে একত্র ও গ্রথিত ছিলেন, তাহা কমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণের সমগ্র সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে স্বার্থহীন, উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া পৃথক পৃথক বিভিন্ন এক-একটা দল হইয়া সমগ্র সঙ্ঘের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক পৃথক এক-একটা অংশের উন্নতি বিধান ও তাহার স্থায়িত্ব সাধনের ভাব লইয়া কার্যে অগ্রসর হন। এইরূপে সঙ্ঘের ভিতর বিচ্ছিন্নতার ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত সঙ্ঘটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। আর কালবশে গুরুজনের অবাধ্যতা, অহঙ্কার, আলস্য ও অন্যান্য শত শত দোষ সঙ্ঘের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিরদিনের মত উহার সর্বনাশ সাধন করে।

"শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, তাহাও ইহার প্রধান প্রবর্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্বেই এইরূপ বাধা ও উদাসীনতারূপ সোপানদ্বয় অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি তাঁহার তিরোধানের পূর্বেই 'রামকৃষ্ণ মিশন' নাম দিয়া ইহাকে একটি কার্যোপযোগী গঠন দিয়াছিলেন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি দেশের লোকের হৃদয়ে স্থান ও আদর পাইয়াছে। প্রথমে ইহা বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য সঙ্ঘমাত্র ছিল, এক্ষণে, এই অল্পকালের মধ্যে ইহা ভারতের সকল প্রদেশে—শুধু ভারতের কেন, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, যুক্ত-মালয়-রাজ্যে, এমন কি সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশে—যেমন আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ইউরোপের কতকাংশেও বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ধুগণ, তোমরা এবং তোমাদের সহযোগী কর্মী ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘের এই গৌরবময় পরিণতি আনয়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শ্রীপ্রভুর হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমরা একমাত্র

শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বারাণসী, কনখল ও বৃন্দাবনে জনহিতকর কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ, তোমাদের ভবিষ্যৎ-দর্শী নেতা তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতায় যে বলিয়াছেন, "অর্থবলে বলী ব্যক্তি নহে, কিন্তু চরিত্রবলে ও দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং একটা মহান্ উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগরূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষই এইরূপ কার্যকে স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে", তাঁহার সেই বাক্য জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করিয়াছে। তোমরা মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনেক প্রদেশে এবং ইদানীং নাগপুরে, বোম্বাই ও কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ, ঐ সকল স্থানের জনসাধারণ তোমাদের কার্য দেখিয়া তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের সহযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমরা সমগ্র ভারতে দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত এবং অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন নরনারীর সাহায্যকল্পে পুনঃ পুনঃ সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা জাগাইতে সাহায্য করিয়াছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তোমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশ বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া সমানে লাগিয়া আছ, কোন কোন স্থলে আবার সমগ্র জীবন একটা স্থানে কামড়াইয়া পড়িয়া আছ, কারণ তোমাদের অবসর দিয়া তোমাদের স্থলে বসাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই।

"সত্যই, আমাদের প্রভু এবং তাঁহার মনোনীত আমাদের সঙ্ঘের মূল নেতা তোমাদেরই মধ্য দিয়া দরিদ্র ভারতে এবং অন্য অধিকতর সৌভাগ্যশালী দেশসমূহে অদ্ভুত কার্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উহার অপেক্ষা বড় বড় কাজ এখনও বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। আর আমাদের প্রভু ও স্বামীজী সময়ে তোমাদেরই মধ্য দিয়া তাহা সাধন করিবেন, যদি তোমরা তাঁহাদের পবিত্রতা, সঙ্কল্পের একনিষ্ঠতা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মহৎ—তৎসমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপ তাঁহাদের জীবনের মহান গুণরাশির অনুকরণ করিতে পার এবং এতদিন যে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছ, যদি এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। কারণ, যদি আমরা তাহাদের কার্য করিতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই এবং তাহাদের কার্য করিতে নির্বাচিত হইয়া এতদিন উহা করিতে পারিয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি, তবে আমরা—সেই কর্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য করিবার জন্য অপরে নিবাচিত হইয়াছে দেখিয়া শীঘ্রই আমাদের শোকের অশ্রু বিসর্জন করিতে হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্বর-নির্বাচিত ইস্রায়েলদের কথা স্মরণ কর, তাহারা শ্রীপ্রভুর শাখা এবং "প্রভু অতি সামান্য ধূলিকণা হইতেও তাঁহার কার্য করিবার লোক গড়িয়া তুলিতে পারেন", তাহার এই সাবধান বাক্যে কর্ণপাত করে নাই—এবং তাহারা কি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল—ভাবিয়া দেখ!

এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দুর্গতির কথাও স্মরণ রাখিও।

"অতএব বিগত ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে গভীরভাবে এ-প্রশ্নটিও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের প্রথম অবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগবশে ঐ আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য যে সব কার্য করিতাম, তাহা বর্তমানে আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজ নিজ পদগৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশত দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে? সত্যই এক্ষণে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের বিচার, চিন্তা ও সমাধানের—খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং বিশুদ্ধ ধাতু হইতে খাদ বাছিয়া পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে।

"এই বর্তমান মহাসম্মেলন তোমাদিগকে এই সুযোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বা তোমাদের পূর্ববর্তী সহকর্মীদিগের সহিত এবং গুরুজনদিগের সহিত মিলিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, যাহা সচরাচর ঘটে না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা অনেক শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে, সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালীর বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা স্থির করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই সঙ্গীন অবস্থায় সর্বসাধারণ কর্তৃক উহার প্রচলিত ভাবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যে সকল বিপদ ও দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার অবকাশ পাইবে। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে অকপটে ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অদ্ভূত বিস্তারের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সেগুলি করিতে গিয়া আমাদের সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি কি না। আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের সঞ্চিত শক্তি,—কুণ্ডলিনী নিহিত থাকে। নিজেকে ও অপরকে ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিয়া লও। ইহা যদি করিতে পার, তবেই তুমি আমাদের কার্যের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়া এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

"এইরূপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে, ইহা যেন স্মরণ রাখিও। এইরূপেই আমাদের পূর্ববর্তী সঙ্ঘসমূহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল,—আমাদের সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের

মহৎ কর্মের সর্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যগণও তাঁহাদের সংঘজীবনের প্রাচীন যুগে সময়ে সময়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে, কিন্তু যাহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরেই এই প্রণালী প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতদিন না সমাধা হইতেছে, ততদিন প্রাণপণে খাটিয়া যাও, আমাদের নেতা আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ ততদিন অনলস-ভাবে অগ্রসর হইতে থাক' এই উক্তি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে ঐ উক্তি অনুসারে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচাররূপ কর্মক্ষেত্রে সহযোগিগণ, আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া এবং আমাদের ভূতপূর্ব সভাপতি আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম লইয়া তোমাদের সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।"

এই দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিবার সময় স্বামী সারদানন্দ ভাবাবেগে যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষত শেষের কথাগুলি তিনি প্রত্যেকটি কথার উপরেই জোর দিয়া এমনভাবে বলিয়াছিলেন যে, কথাগুলি যেন তাঁহার মুখ হইতে নয়, অন্তর হইতে বাহির হইতেছে। যাঁহারা সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই দিনই সেই অভিভাষণ পাঠ ও সেই সময়ের তাঁহার মুখের ভাব ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন, "ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সংকট মুহূর্ত" সেই সংকট যে কোন্ পথে আসিতেছে তাহাও তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

এই মহাসম্মেলনের অব্যবহিত পরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কর্মিগণকে তাঁহার ও সভাপতি স্বামী শিবানন্দের নাম সংযুক্ত একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

মহা সম্মেলনের পর

মহাসম্মেলনের পর নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল। ১২ জন সদস্য লইয়া এই কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম এখানে দেওয়া হইলঃ—

১। স্বামী বিরজানন্দ (সমিতির সম্পাদক), ২। স্বামী ধীরানন্দ, ৩। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, ৪। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ, ৫। স্বামী কালিকানন্দ, ৬। স্বামী আত্মবোধানন্দ, ৭। স্বামী সুবোধানন্দ, ৮। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, ৯। স্বামী ওঙ্কারানন্দ, ১০। স্বামী নির্বেদানন্দ, ১১। স্বামী নির্বাণানন্দ, ১২। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ।

কার্যকরী সমিতির অধিবেশন মাসে অন্তত দুইবার করিয়া হইবে এবং প্রত্যেক অধিবেশনের দিন সদস্যগণ নিজেরা ঐ দিনের সভাপতি নির্বাচন করিবেন। কমিটির একজন স্থায়ী সেক্রেটারী থাকিবেন। সাতজন সদস্য একত্র না হইলে কোরাম হইবে না।

প্রত্যেক সদস্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন, যখন কোন বিষয়ে সদস্যগণের মতভেদ হইবে, তখন দুইদিকেই সমানসংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত (কাস্টিং) ভোট দিতে পারিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারীকে এবং কমপক্ষে সাতজন সদস্যকে মঠে থাকিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যের কার্যকাল হইবে দুই বৎসর। এই দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক সদস্যকেই অন্তত আটটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভ্যের পদ যদি খালি হয়, তবে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী ও প্রেসিডেণ্ট ঐ শূন্যপদে অন্য সদস্যকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণের নামঃ—

১। স্বামী শিবানন্দ (সভাপতি), ২। স্বামী অখণ্ডানন্দ (সহ-সভাপতি), ৩। স্বামী সুবোধানন্দ, ৪। স্বামী সারদানন্দ (সেক্রেটারী), ৫। স্বামী শুদ্ধানন্দ (জয়েণ্ট সেক্রেটারী), ৬। স্বামী বিরজানন্দ, ৭। স্বামী অভেদানন্দ, ৮। স্বামী ধীরানন্দ, ৯। স্বামী শঙ্করানন্দ, ১০। স্বামী অচলানন্দ, ১১। স্বামী সর্বানন্দ, ১২। স্বামী মহিমানন্দ, ১৩। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, ১৪। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, ১৫। স্বামী মাধবানন্দ।

বিরজানন্দ, ধীরানন্দ ও অমৃতেশ্বরানন্দ উভয় কমিটিতেই রহিলেন।

বৎসরে অন্তত একবার করিয়া ট্রাস্টি কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির কার্যাবলী সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিবেন এবং কার্য শীঘ্র সম্পাদন করিবার জন্য

ট্রাস্টি-সভার পক্ষ হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী উপস্থিত থাকিবেন।

বস্তুত কার্য-পরিচালনের প্রায় সমস্ত দায়িত্বই ওয়ার্কিং কমিটির উপর অর্পিত হইল। অনেকে এইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, স্বামীজীর দেবোত্তর দলিলে ট্রাস্টিগণের এইভাবে ক্ষমতা অন্যের উপর দেওয়ার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, বরং নিজেরা বরাবরই সেইভাবে কাজ করিয়া যাইবেন, প্রকারান্তরে এইরূপই নির্দেশ ছিল।

ইহা লইয়া সন্যাসী মহাসম্মেলন শেষ হইবার সংগে সংগেই গোলমালের সূত্রপাত হইল, তরুণদলেরও অনেকে এই ব্যবস্থা মানিয়া নিতে রাজী হইলেন না। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী জ্ঞানই অগ্রণী ছিলেন।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান ও গণেন্দ্রনাথ ইঁহারা দুইজনই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রথম সময়ের ব্রহ্মচারী। অন্যান্য সকল ব্রহ্মচারীই ব্রহ্মচর্যের শেষে সন্ন্যাস লইয়া সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই ব্রহ্মচারীরূপেই বেলুড়মঠে আছেন।

জ্ঞান মহারাজ অবশ্য স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞান, আমি চাই যে, অন্তত একজনও আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে এই মঠে আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকুক।" স্বামীজীর এই কথার পর জ্ঞান মহারাজ আর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই।

স্বামী সারদানন্দ মঠবাসিগণ সকলেরই কেবল শ্রদ্ধার নয়, ভালবাসার পাত্র ছিলেন, তিনিই এইভাবে ওয়ার্কিং কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিজে যেন সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছেন, ইহাতে অনেকের দারুণ ক্ষোভ এবং তাঁহার উপর অভিমানও হইয়াছিল।

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষ হইতে কতকগুলি বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটিকে অর্পণ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল ঐ নিষ্পত্তির অনুকূলে অন্তত সাতজন সদস্যের ভোট থাকা প্রয়োজন। সেই বিষয়গুলি এইরূপঃ—

১। ট্রাস্টি কমিটি মঠ ও মিশনের যে সাধারণ নীতি নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অনুসারে মঠ ও মিশনের কার্যকারিতা নির্ণয় করা।

২। বিভিন্ন কেন্দ্রের (যদি পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে) অর্থনীতি পরিচালনা।

৩। স্বামীজীর নিয়মাবলী অনুসারে প্রধান কেন্দ্র ও শাখা-কেন্দ্রগুলির কর্মিগণকে শিক্ষাদান।

৪। সম্প্রদায়ে সভ্য গ্রহণ এবং শাখাকেন্দ্রে অধ্যক্ষ ও কর্মী প্রেরণ।

৫। বেলুড়মঠ ও মিশনের কার্য পরিচালন।

৬। অন্যান্য কেন্দ্রে মঠ ও মিশনের কার্য পরিদর্শন ও পরিচালন।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় ট্রাস্টি কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, সেগুলি এইরূপঃ

১। শাখা-কেন্দ্রগুলির মঠ বা মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা অথবা মঠ হইতে বহিষ্কার করা।

২। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় এবং বন্ধক দেওয়া বা দান সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে।

শরৎ মহারাজ এই সকল ব্যাপার লইয়া যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য বেলুড়মঠে সকলকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি ও মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সকল প্রাচীন সাধুই বেলুড় মঠে একত্র হইলেন। বেলুড় মঠের উঠানের আমগাছতলায় তিনি আসিয়া বসিলেন। মঠের প্রাচীন সাধুগণ এবং সে সময় গৃহীভক্ত বা সন্ন্যাসী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেখানে সমবেত হইলেন।

তখন শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এই নূতন কমিটি সম্বন্ধে তোমাদের যার যা বলবার আছে বল।"

জ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "আপনারা মঠ পরিচালনের সমস্ত ক্ষমতা নবীন সাধুদের হাতে দিয়া নিজেরা সরিয়া পড়িলেন কেন? এরকম আলাদা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি করিবার কি দরকার ছিল? যাঁহারা কাজ করিবেন, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তো তাঁহাদের চালাইতে পারিতেন।

উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "আমরা তো আর চিরদিন থাকবো না, আমাদের পরিবর্তে যারা পরে কার্যভাব নেবে তারা এখন থেকে হাতে ক্ষমতা না পেলে তৈরী হবে কেমন করে? আমাদের এখন এই প্রতিষ্ঠান যা'তে বরাবর চালু থাকে তাই তো করা দরকার। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই ব্যবস্থা হয়েছে।"

কিন্তু অনেক করিয়া বুঝাইলেও প্রতিবাদী দল বুঝিতে চাহিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, "এভাবে কাজ থেকে সরে দাঁড়ানো স্বামীজীরও অভিমত ছিল না। তিনি যতদিন দেহে ছিলেন, রুগ্নদেহেও কাজ করে গিয়েছেন। আপনাদের শিক্ষায় ও আপনাদের আদর্শেই এই মহাসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। সেই শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যদি বঞ্চিত হয়, তবে সঙ্ঘ কি যথেচ্ছাচারের রাজত্ব হয়ে উঠবে না? সকল শিক্ষার ভিতর সংঘ গঠনে আজ্ঞাবহতাকেই স্বামীজী বিশেষ প্রয়োজন বলেছেন, একথা কেন আপনি একবারও মনে করছেন না?"

তখন স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখাও তো প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা তো চিরদিনের জন্য হচ্ছে না, দুই বৎসর পরীক্ষা করেই দেখা যাক্ না কেন, ফল কি রকম হয়। যদি ফল তেমন ভাল না হয়, তখন আবার বদল করলেই তো হবে।"

কিন্তু দুই বৎসরে ফল কেমন দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি আর অপেক্ষা করেন নাই, দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

এই সন্ন্যাসী মহাসম্মেলনে স্বামী নির্মলানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন

মহারাজ) যোগ দেন নাই। দূরদেশেও অনেক সাধু ছিলেন, যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই—তাহাদের জন্য মহাসম্মেলনের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত একখানি মুদ্রিত-বিবৃতিপত্র প্রচার করা হইয়াছিল এবং সকল কেন্দ্রেই সেখানি পাঠানো হইয়াছিল। মুদ্রিতবিবৃতি-পত্রখানি এইরূপ ঃ—

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং]

Ramkrishna Math,
Howrah Dist.,
Belur P.O.,
Dated 17-5-26.

স্নেহাশীর্বাদমিদং

শ্রীশ্রীমঙ্গলময় ঠাকুরের অশেষ কৃপায় ও তোমাদের চেষ্টা এবং সহযোগিতায় তাঁহার সঙ্ঘের প্রথম মহাসম্মেলনের অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আশা করি, প্রতিনিধিবর্গের নিকট হইতে ও অন্যান্য প্রকারে তোমরা উক্ত মহতী মিলনসভার সমুদয় কার্যবিবরণী অবগত হইয়াছ। এখন উহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রীতি, প্রেম এবং ভালবাসা ও একতার সম্বন্ধ স্থাপনের যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা রক্ষা করার ও পুষ্ট করার ভার তোমাদের উপরেই রহিল। আমাদের স্থির বিশ্বাস, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ঐরূপ ভাব পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে এবং একমাত্র ঐ ভিত্তির উপরেই তোমাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতি, সঙ্ঘের উন্নতি ও আমাদের আশা-ভরসা সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

এই মহাসম্মেলনে তোমাদের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা প্রস্তাবিত হইয়া আমাদের অনুমোদনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘের সর্ববিষয়ে কল্যাণকর কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবগুলি তোমাদের জ্ঞাতার্থে পত্র-মধ্যেই পাঠানো হইল, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা তোমরা সকলে মিলিয়া একমন ও প্রাণ হইয়া ঐগুলিকে বরণ করিয়া লইয়া কার্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হও।

এতদ্ব্যতীত, আমরা ট্রাস্টিগণ ও গভর্নিং বডির মেম্বরগণ মিলিত বারজন সভ্য দ্বারা একটি কার্যকরী সভা গঠন করিয়াছি, প্রধান প্রধান কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত অধ্যক্ষ ও কর্মী বাছিয়া যাহাদিগকে বর্তমানে বেলুড় মঠে বা উহার নিকটে রাখিয়া কাজকর্মে আমাদের সহায়তার জন্য লওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইঁহারা অতঃপর আমাদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে পরামর্শ করিয়া আমাদেরই ভারপ্রাপ্ত বিশেষ অঙ্গরূপে মঠ ও মিশনের যাবতীয় কার্য পরিদর্শন ও পরিচালন করিবেন ; সভ্য-গণের নাম ও সভার গঠন, কার্যপ্রণালী এবং ঐ সভা কোন্ কোন্ বিষয় পরিদর্শন ও পরিচালন করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সর্বশেষ বিবরণ পত্রমধ্যেই তোমাদের জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হইল। সর্ববিষয় ও সকল অবস্থা ধীরভাবে ও

সুচারুরূপে আলোচনা করিয়া ও বিবেচনা করিয়া উক্ত সভা গঠন ও সভ্য নির্বাচন করিয়াছি।

উক্ত কার্যকরী সভা গঠন করিবার কালে অন্যান্য অবস্থা ব্যতীত প্রধানত দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া উহার গঠন ও প্রবর্তন করা আশু প্রয়োজন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, আশা করি তোমরাও এবিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবে। প্রথমত, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কার্য যেরূপ নানাভাবে বর্ধিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের কয়েকজনের পক্ষে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের পুষ্টিকল্পে সকল সময় সাহায্য করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার কারণ, আমরা অনেকেই বয়োবৃদ্ধির দরুণ তোমাদের সহিত কার্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষম হইয়া পড়িতেছি, ইহাতে তোমাদের এবং আমাদের নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সেজন্য আমাদের সহায়তা করিবার জন্যে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বিচক্ষণ কর্মীর অভাব আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতে-ছিলাম। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে তাঁহার সংঘের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তো তোমাদের উপরেই ন্যস্ত হইবে, সেজন্য আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আমরা থাকিতে থাকিতেই তোমাদের মধ্যে যতজনকে পারি আমাদের সহিত সর্ববিষয়ে সহযোগী করিয়া লইয়া যতটা সম্ভব কার্যক্ষম করিযা লই। এইরূপে কর্মভার লাঘব হইলে আমরাও যে কতকটা মানসিক শান্তি লাভ করিব তাহা তোমরা একটু বিবেচনা ও চিন্তা করিলেই ধারণা করিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া তোমাদের সহিত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে আমাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতঃপর তোমরা ব্যক্তি-গতভাবে সাধনভজন ব্যতীত অন্যান্য বিষযে পরামর্শের জন্য যেরূপ আমাদের নিকট পূর্বে জানাইতে সেইরূপ বর্তমানে কার্যকরী সভার সম্পাদক কালীকৃষ্ণ মহারাজের (স্বামী বিবজানন্দের) নিকট জানাইয়া সুখী করিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমাদের সকলের তাঁর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক।

ইতি—সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদানন্দ
স্বাঃ শিবানন্দ

এই যুক্ত-স্বাক্ষরিত পত্রে নূতন কার্যকরী সমিতি গঠনে যাঁহারা বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা ও নবভাবে কার্যভার গ্রহণকারী-দিগকেও কর্তব্যে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বহুবিস্তৃত ও সর্বজনহিতকর এক মহাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই তরঙ্গবিপুলা স্রোতস্বিনীর উৎসের দিকে আমদের মন যখন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, কতখানি ত্যাগ ও তপস্যার শক্তি যে এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক শক্তিরূপে ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়া

নিয়ত সফলতার পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহা যখন স্মরণ করি তখন আপনা হইতেই মন সেই মহত্ত্বের পদতলে লুণ্ঠিত হয়।

স্বামীজী শিক্ষাকে সর্বোপরি প্রাধান্য দিয়াছিলেন, তিনি বেদবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্বে জননী সারদামণির শতবার্ষিকী পূজার অর্ঘ্যদান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির তরঙ্গ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। সমস্ত দেশবাসীই আজ এই প্রতিষ্ঠানেব সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিতেছে, এবং দেশের পক্ষে এইরূপ মনোভাব বিশেষ মঙ্গলকর।

স্বামীজী মেয়েদের সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও আজ কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার তপস্যাপূত নিবেদিতা বিদ্যালয় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রহ্মচারিণীগণের স্বতন্ত্র মঠও স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েকখানি পত্রের অনুলিপি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, এই পত্রগুলির মধ্যে দুইখানি স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক তুলসী মহারাজকে (স্বামী নির্মলানন্দ) লিখিত, স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্র, এবং তুলসী মহারাজের দুইখানি পত্র আছে এবং একখানি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের তুলসী মহারাজকে লিখিত পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

শ্রীমান তুলসী,

আমার শুভ বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও কোলাকুলি জানবে।

আমি সব ভুলে গিয়েছি, তুমিও সব ভুলে যাও। একটু ভালবাসা নিয়ে এসো। ঠাকুর বড় ভালবাসার ঠাকুর। বুড়ো বয়সে আর কেন? দিনকতক আর বাকি বৈ তো নয়, এসো, ভালবেসে কাটিয়ে দেওয়া যাক্। তুমি এলেই একসঙ্গে মা কন্যাকুমারী দর্শন করে আসা যাবে। খরচপত্রের অভাব হবে না ঠাকুরের কৃপায়। এখানকার সব কুশল। একটা গরু কাল বিইয়েছে, এঁড়ে বাছুর। মহাষ্টমীর দিন বেশ ভোগরাগ হয়েছিল, অনেকগুলি ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিলেন, দরিদ্রনারায়ণও ২৫।৩০ জন সেবা করেছেন, ভক্তও প্রায় ৫০।৬০ জন। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। আসবার সময় সর্বানন্দকে আশীর্বাদ ক'রে এসো।

ইতি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—

শিবানন্দ

সম্ভবত পত্রখানি দাক্ষিণাত্যের কোন মঠ হইতেই লেখা, পত্রে ঠিকানা বা তারিখ ছিল না।

তুলসী মহারাজকে স্বামী সারদানন্দের লিখিত পত্রঃ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

উদ্বোধন কার্যালয়
১নং মুখার্জি লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
ইং ১৭।৮।২৪

তুলসী মহারাজ,

শ্রীমান সুধীরকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। শরীর আমার ভাল যাইতেছে না, mild type-এর বেরিবেরি ও পেটের অসুখ ইত্যাদিতে ভুগিতেছি, তাহার পর গোলাপ মা heart-এর অসুখে শয্যাগতা, বোধ হয় আর অধিক দিন দেহ থাকিবে না, এইসব কারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

আমি মহাপুরুষকে অদ্য লিখিয়া দিলাম যে, ঝগড়াঝাটি করিয়া সহসা তোমাকে ঐরূপে Bangalore-এর কাজ ছাড়িয়া দিতে বলা আমার মতে আদৌ ভাল নয়, তুমি ও তিনি এখানে চলিয়া আসিলে সকলে মিলিয়া যাহা ন্যায়সঙ্গত এবং যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কার্যের উন্নতি হইবে এইরূপভাবে একটা মীমাংসা স্থির করা যাইবে। জীবনের আর অল্পদিনই আমাদের অবশিষ্ট আছে, কয়টা দিনের জন্য এইরূপ ঝগড়া-বিবাদ করা তিক্তবোধ হয়।

অধিক আর কি লিখিব ভাই, মহাপুরুষের সঙ্গে তুমি একবার এদিকে কিছুদিনের জন্য চলিয়া আইস ইহাই অনুরোধ। আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে।

ইতি চিরপ্রেমাবদ্ধ—
স্বাঃ সারদানন্দ।

স্বামী শুদ্ধানন্দের পত্র।

(১) ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় পোঃ
হাওড়া, ২৭শে মে
১৯২৪

পূজনীয় তুলসী মহারাজ,

আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানিবেন। বহুদিন আপনাকে পত্রাদি লিখি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মধ্যে নানা source হইতে আপনার কিছু কিছু সংবাদও পাইয়া থাকি। মধ্যে শুনিয়াছিলাম আপনার নাকি ডায়েবেটিস হইয়াছে, আশা করি এখন অনেকটা ভাল আছেন। সম্প্রতি বুড়োবাবার পত্রে জানিলাম, আগামী পূজার সময় আপনার এদিকে আসিবার সম্ভাবনা আছে। যদি শরীর থাকে, তবে আপনার দর্শন পাইব। শুনিলাম, হরিপদ ব্যাঙ্গালোর যাইতেছে বোধহয় এতদিনে গিয়াছে। সে আবার আমেরিকা যাইবে বলিতেছে। আমি

তাহাকে এখানে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে বলে, "২।৩ বৎসর পরে একেবারে ফিরিব। আমি গেলে Miss Morton নিউইয়র্ক সোসাইটির auditorium করিয়া দিতে পারে।" আমার তো মনে হয়, হরিপদ যদি ভারতেই থাকিয়া যায় তাহা হইলে বোধহয় ভারতীয় কার্যের বেশ সুশৃঙ্খল হইতে পারে। কারণ, শরৎ মহারাজও আজকাল নানা কারণে কিছু দেখিতে পারেন না। মহাপুরুষ মহারাজও বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইতেছেন এবং আমরাও বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়া ক্রমশ কর্মে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। আপনি কি মনে করেন? যদি ভাল বিবেচনা করেন, তাহার সহিত দেখা হইলে, তাহাকে ভারতে থাকিতে বলিবেন। বোধহয়, সে যদি Indian work বেশ organise করিতে পারে, তবে প্রয়োজন হইলে ২।৪টি ভাল ভাল চরিত্রবান উপযুক্ত লোক আমেরিকায় পাঠাইয়া তথাকার কার্যের সুবিধা করিতে পারি। এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

আমি প্রায় সাতমাস হইল কাশী সেবাশ্রমে change-এ ছিলাম। দুর্গা ডাক্তারের ব্যবস্থামত পথ্যাদি করিয়া কতকটা ভাল আছি। এখানে মাসখানেক হইল আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কাশীতে গরম কাটাইব। কিন্তু মহাপুরুষ change-এ যাওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে মঠ হইতে পুনঃ পুনঃ লিখায় এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আশীর্বাদ করুন যেন এই শেষ বয়সে মন ঠাকুরের পাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, আর বাজে হুজুগে যেন না কাটে। বাল্যকাল হইতে আপনাদের আশ্রয় লইয়াছি, কত অপরাধ করিয়াছি, কত ঝগড়াঝাটি করিয়াছি, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আবার সদুপদেশ দিয়াছেন। এখন যাহাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে মন যায় তাহার জন্য তাঁহাব কাছে একটু বলুন। আপনারা তাঁর সন্তান, তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের কথা শুনিবেন।

কাশীতে যাইবার কিছু পরেই সুকুল দেহত্যাগ করিল। আমাদের বাল্যসঙ্গীও চলিয়া গেল। আপনারা ঠাকুরের ভক্তত্যাগী-শিষ্যও কয়েকজন মাত্র আছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদেরও টানিয়া লইয়া ঠাকুরের কাছে চলুন।

কাগজে দেখিয়া খুব সুখী হইলাম Trivandrum Math সম্পূর্ণ হইয়া উহা open করিয়াছেন—আরও আনন্দিত হইলাম জানিয়া যে ঐ দেশীয় কয়েকজনকে ঠাকুরের ত্যাগের পথে আনিয়া সন্ন্যাস দিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে থাকিয়া ঠাকুরের কাজ আপনার দ্বারা যেরূপ পাকা হইল, শত শত বাজে লেকচারেও বোধহয় তা হয় না। আমি আপনার মনজোগানো কথা বলিতেছি না। আমার ইহাই আন্তরিক বিশ্বাস।

বেজায় sentiment করা গেল। আপনি হয়তো বলিবেন বুড়ো বয়সে আবার বৈষ্ণবীভাব এত কোথা হইতে আসিল? যাই বলুন, কিন্তু আপনার অনুগ্রহ চাই-ই—চাই,—যথেষ্ট পাইয়াছিও। পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ হইতে আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর কৃপা করিয়াছেন। তার জোরেই এখনও একরূপ মঠে আপনাদের আশ্রয়েই টিকিয়া আছি।

এই চিঠিখানি লেখার occasion হইল মঠের কর্মীদের চাপে। মঠ হইতে mission-এর General Report বলিয়া ইতিপূর্বে দুইখানি বাহির হইয়াছে। ১৯১২তে প্রজ্ঞানন্দ করিয়াছিল, ১৯১৯-এ আমি ও শরৎ মহারাজ করি। সম্প্রতি অনেক লোক মঠ mission সম্বন্ধে মোটামুটি একটা Idea পাইতে চায় বলিয়া বহুদিন হইতে আর একটা General Report লিখিবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এতদিন কার্যে পরিণত হয় নাই। 2nd General Reportটার এক কপি আপনাকে পাঠাইলাম। দয়া করিয়া এটা একটু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া 3rd-এর জন্য যদি আপনার ওদিককাব কার্যের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত মনে করেন তো পাঠাইয়া দিবেন আপনার সাবকাশ মত—তাড়াতাড়ি কিছু নাই। আরও কিরূপভাবে Report বাহির করিলে সাধারণের উপকার বেশী হইবে বলিয়া মনে করেন তৎসম্বন্ধে যদি কিছু suggestion দেন, তবে তাহাও যাহারা উহা সংকলন করিতেছে তাহাদের জানাইব।

এখনও মঠের climate ভাল,—বর্ষা নামিলেই হয়তো পালাই পালাই করিতে হইবে। শরৎ মঃ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তবে, তাঁহারও প্রস্রাবের ব্যায়রাম, বাত এবং রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি মাঝে মাঝে আছে। তার উপব আবার যোগীন মা বুড়ি একেবারে শয্যাশায়ী, তাঁর দিনরাত তত্ত্বাবধান। আর আর খবর একরূপ ভাল। আশা করি আপনার কুশল সংবাদ সত্বর পাইব। ইতি—

স্বাঃ শুদ্ধানন্দ।

ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

The Ramkrishna Math,
Belur, P.O. Howrah,
Dated the
12th August, 1924.

Seal,
R. K. Math

পূজনীয় তুলসী মহারাজ,—

আপনার ২৪ জুনের পত্র পাইয়া যে কি পর্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম, তাহা কি বলিব। × × আপনার প্রতিশ্রুত তৃতীয় General Report-এর জন্য ওদিককার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রতীক্ষায় এতদিন পত্রের উত্তর দিই নাই, ইতিমধ্যে আপনার ৭ই আগস্টের পত্র আসিয়া পৌঁছিল।

পত্রখানি পড়িয়া কিছু আশ্চর্য হই নাই, কারণ আপনার পূর্বের পত্রে উহার কতকটা আভাস ছিল। আপনার আদেশ অনুসারে ঐদিনই উদ্বোধনে গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। এইরূপ একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হওয়াতে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, আমিও মর্মাহত হইয়াছি। কাল তিনি মঠে আসিয়াছিলেন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে পত্র লিখিবেন বলিলেন।

এক স্থানের কার্যভার ত্যাগ করা এক কথা। মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছা

হইয়াছে যে, আপনি ওখানকার কার্য ছাড়িয়া দিন। তাঁহার উপর আপনার যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে ইহাও জানি, আর মহাপুরুষ মহারাজ আপাতত যতই অন্যরূপ ব্যবহার করুন, তিনি যে আপনাকে আন্তরিক ভালবাসেন না বা আপনি ওদিকে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন, ঠাকুর স্বামীজীর নাম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, একথাও আমি বিশ্বাস করি না।

কাল আবার আপনার আর একখানি পত্র পাইলাম এবং আপনার শরীর খারাপ হইয়াছে জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আশা করি, এতদিনে মহাপুরুষ মহারাজের রাগ পড়িয়া গিয়াছে এবং আপনার মনে এই ব্যাপারে যে একটা অশান্তির ভাব জাগিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে এবং উভয়ে সৎভাবে ও শান্ত-ভাবে পরামর্শ করিয়া যাহাতে ওদিককার কার্য বেশ ভালভাবে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, যাহাতে মনটা ক্রমশ বহির্মুখী ভাব হইতে সরিয়া একটু অন্তর্মুখী হয় । জীবনের শেষ দশায় আসিয়াছি। ঠাকুর স্বামীজীর মুখের দিকে চাহিয়া আপনাদের পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলাম, আশীর্বাদ করুন, তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া শেষ পর্যন্ত যেন আপনাদের সকলের উপরেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা অক্ষুন্ন রাখিতে পারি। আমাদের আজ মহা পরীক্ষার দিন, আমি যেন নিজের দোষ কেবল দেখি, আপনাদের গুণই যেন কেবল আমার লক্ষ্য হয়। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার নিয়মাবলীতে বড় কঠোর একটি আদেশ করিয়া গিয়াছেন—"এ মাঠের কেহই মন্দ নহে—মন্দ হইলে কখনও আসিত না, অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার পূর্বে কেন মন্দ ভাবি, এটা ভাবা উচিত।" আশীর্বাদ করুন, স্বামীজীর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া জ্ঞান, ভক্তি লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। হরিপদর এডেন হইতে এক পত্র পাইয়াছি, মনসুনের ঝড়ে কষ্ট পাইয়াছে। অপরাপর কুশল, মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন। শীঘ্র যদি ঐদিকে আসা হয়, আপনার বহুকাল পরে সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হইব। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকেও জানাইবেন। আয়েঙ্গার প্রভৃতিকে ভালবাসা জানাইবেন।

ইতি দাস,

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ।

পুনশ্চঃ—ওদিককার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, মাঝখানে এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া যাওয়াতে বোধ হয় তাহা পাইবার একটু বিঘ্ন ঘটিল। আশা করি, উহা আপনার স্মরণ আছে এবং উহা পাঠাইবার আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন। রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া টাইপ হইতেছে ১০।১৫ দিনের মধ্যে ওদিককার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসিলে বিশেষ সুবিধা হয়। দয়া রাখিবেন। ইতি দাস,

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ।

এবার স্বামী নির্মলানন্দের লিখিত দুইখানি পত্রের অনুলিপি দিয়া প্রবন্ধটির সমাপ্তি করিতেছি। স্বামী নির্মলানন্দ বহুদিন বাঙ্গালোরে ছিলেন এবং সেখানে অনেক মঠ স্থাপন করেন। মঠে ইঁহাকে তুলসী মহারাজ বলা হইত। এই পত্রাংশ হইতে ইঁহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রথম পত্রখানির শেষের দিকটাই উদ্ধৃত করা হইল।

১০ই আগস্ট, ১৯১২

× × "তোমার শরীর ক্রমশ ভালোর দিকে যাইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম, ঠাকুর শীগ্‌গির তোমাকে পূর্ববৎ সুস্থ ও সবল করুন এই প্রার্থনা করি।

"এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। দিনের বেলাতেও গরম জামা ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু এখন এ বৎসর স্বাস্থ্য ততো ভাল নয়। চারদিকেই 'সর্দিজ্বর' অর্থাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা মত হইতেছে।

তোমাকে আমাদের কলিকাতার নূতন মঠে (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ) আমাদের সকলের (সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের) বাহিরের স্ত্রীলোকদের দ্বারা পরিচালিত ও সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন সাবিত্রী সম্মিলনী, সাবিত্রী শিক্ষালয় প্রভৃতি) সহিত কিরূপভাবে সংস্রব রাখা উচিত, সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিতেছি, বিশেষ করিয়া চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া দেখিবে।

প্রথমত, ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আমরা বিশেষভাবে জানি ও বুঝি, তাহা কখনও অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের ঐসব কাজের সঙ্গে কোন Direct সম্বন্ধ রাখা (যেমন ঐসব প্রতিষ্ঠানের কমিটির মেম্বর হওয়া বা অপরাপর সময়ে ঐ সংক্রান্ত কাজকর্মের দরুণ বা কাজের অছিলায় ঐসব স্ত্রী মেম্বরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা কিম্বা কোন স্ত্রী মেম্বরের বাড়ি গিয়া পরামর্শ বা আলাপ-পরিচয় করা ইত্যাদি) আমার ক্ষুদ্র মতে উচিত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের যদি ঐ সকল কার্যে সহায়তা করিতে হয় বা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আসিয়া দূরে থাকিয়া সকল প্রকার সাহায্যই আমরা অনায়াসে করিতে পারি।

Direct সম্বন্ধে ঐসব কাজের জন্য ডাক্তার দুর্গাপদ, মাথমবাবু, কিরণবাবু, যতীনবাবু প্রভৃতি মিশনের সুযোগ্য গৃহস্থ মেম্বররা থাকিলেই শোভনীয় ও নির্দুষ্য হয় ও সাধারণের সমালোচনার গণ্ডির বাহিরে থাকিয়া কাজটি সুচারু-ভাবে চলিতে পারে। এইরূপ কাজের সম্বন্ধে ঠাকুর ও স্বামীজীর অভিমত আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষভাবে তফাৎ হইতে সহায়তা করার নির্দেশ ও উপদেশ আছে, ঘনিষ্ঠভাবে নয়। আজকালকার হাল ফ্যাশানের যে কোন Movement হোক না কেন, তাতে দু'চারজন 'স্বামী' নামধারী থাকা যেন একটা Indispensable factor তা না থাকিলে যেন সেই সব Movement 'মুভমেণ্ট' নামেরই অযোগ্য (যেমন শ্রমিক দল, ধর্মঘটী দল, স্বরাজ, স্বদেশী, সমাজ-সংস্কার, বিধবা বিবাহ, শিশুপালন ও সংগঠন ইত্যাদি ইত্যাদি)। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত যেসব সন্ন্যাসী, তাঁহাদের আদর্শ এই হাল ফ্যাশানের

সন্ন্যাসীদের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, আমরা ঐরূপ হইলে আমাদের সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। নিবেদিতা স্কুল যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন আমি স্বামীজীর নিকটেই ছিলাম ও তিনি ঐ স্কুল পরিচালনে কিরূপ কঠোর নিয়মাবলী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সব শুনিয়াছিলাম। আমি যাহা লিখিলাম, তাহা সেই উপদেশের একটু আংশিক ছায়া মাত্র।

আমরা যদি তাঁহার আদিষ্ট উপদেশে চলিতে পারি বা সতত চলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের সর্বতোভাবে কল্যাণ হইবে। আর যদি স্বেচ্ছানুযায়ী কাজ করি, তাহা হইলে নিজেদের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়া তাহার বিষময় পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। যেটা যে ভাবের কাজ, তার ভালমন্দ বিচার করিয়া, আমাদের সন্ন্যাসজীবনের সহিত ঐসব কাজের কোন অংশে কতটুকু খাপ খায় ও আমাদের ঐ কাজবিশেষের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক ও সংস্রব রাখিলে নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক অন্যথা পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বেশী আর কি লিখিব। আমার যাহা অভিমত লিখিতেছি, জীবন্মুক্তজী প্রভৃতি সকলকে ইহা জানাইয়া বলিবে, তাঁহারা যেন এই কথাব যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। আমরা যেন Impulsive Emotion ও সেণ্টিমেণ্টাল দাসত্বেব কবলে না পড়ি।

আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভাশিস জানিবে ও মঠস্থ সকলকে এবং স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদিগকে জানাইবে।

শুভানুধ্যায়ী—নির্মলানন্দ।

হর-পার্বতীবাবুকে লিখিত পত্রের শেষাংশঃ—

"" * * দোষ-ত্রুটির কথা লিখেছেন, সে তো আমাদের সকলেরই আছে। তা না থাকলে আমাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা হবে কেন? ঠাকুর বলতেন, 'খাদ নইলে গড়ন হয় না।' আমরা যত কাজ বা যা কিছু করি সবই ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণ। কোনটাই একেবারে দোষশূন্য নয়। আর ঐ ভালো ও মন্দ উভয় কার্য ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন নয়, উভয়ই মানুষের ভিতর কার্যকারিতা-শক্তি উৎপন্ন করে, মানুষকে গড়ে তোলবার সাহায্য ও চেষ্টা করে,—অর্থাৎ এই মানুষের ভিতর যে আসল মানুষ আছে, তার সন্ধানের পথ সুগম করে। পুরো সন্ধান পেলেই সেই আসল মনুষ্যত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হবার উপায় হয়। "ভবতি ক্রমশঃ বিজ্ঞতমা জনাঃ"। এ-সবই সময়সাপেক্ষ।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ক্রমবিকাশবাদীদের কাহারও কাহারও মতে এই সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, সকলেই যথাক্রমে এবং যথাসময়ে সেই নির্দিষ্ট অবস্থায় উপনীত হবে। অতএব, তাঁদের মতে সৃষ্টি অনাদি অনন্ত নয়, সাদি ও শান্ত। একদিন সৃষ্টির পূর্ণাবসান হবে যেদিন সৃষ্টি নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। আর্য ঋষিগণেব সিদ্ধান্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের

মতে এই সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য প্রবহমান, অনাদি ও অনন্ত। ইহার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, ইহা লীলাময়ের লীলা। তিনি আপ্তকাম, সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছা বা অভাব নাই তাই ঋষিরা বলেন, "লোকের তু লীলা কৈবল্যম।" যে খেলছে ও যে খেলাচ্ছে দুই এক। তবে খেলুড়ে অজ্ঞান অবস্থায় সেটা প্রথমে বোঝে না, তাই তার কষ্ট। যদি খেলা ভাল হয় তো সে সুখী, মন্দ হলে দুঃখী। ভালোতেই তার ভালবাসা ও আসক্তি, মন্দতে বিরাগ। এই ভাল-মন্দের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে ধাক্কা খেতে খেতে দৈবাৎ কোন অননুভূত দৈবী শক্তির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই খেলার স্বপ্ন ভেঙে যায়। যন্ত্র ও যন্ত্রীর স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়। তখন লীলাময়ের উপর তার এক নূতন রকমের ভালবাসা জন্মায়, সে বুঝতে পারে সংসার যাকে ভালবাসা বলে সেই তথাকথিত ভালবাসাটা ঐ আসল ভালবাসার একটা ছায়া মাত্র, আর কিছুই নয়। এই সময় থেকে তার খেলাটা রূপান্তর ধারণ করে, পূর্বের খেলা আর থাকে না। সে খেললেও খেলার হার-জিতে তাকে আর অভিভূত করে না, সে এখন বুড়ি ছুঁয়ে খেলছে। বুড়ি-ছোঁয়া ব্যাপারটা সময়-সাপেক্ষ। আজ এই পর্যন্ত। যদি সময় পাই তো কিছু লেখবার ইচ্ছা রইল। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন।"

ইতি শুভানুধ্যায়ী—নির্মলানন্দ।

এবার বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টগণেব নাম দিয়া আমরা এই রচনা সমাপ্ত করিব। আজ বেলুড় মঠে প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে অনেকেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেবলমাত্র অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) ও স্বামী মাধবানন্দজীউ প্রমুখ দুই একজন মাত্র আছেন। কিন্তু সেই সব অগ্রগামীদের মহান তপস্যায় আজিও সেই পুণ্যভূমি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। গঙ্গার এক পাবে পুণ্যাবতী রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের দেব-নিকেতন এবং অপর পারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বাংলা দেশের এই দুই মহাতীর্থ।

বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টগণ

- স্বামী ব্রহ্মানন্দ
- স্বামী শিবানন্দ
- স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ, ইনি মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন)
- স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন মহারাজ, ইনি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন)
- স্বামী শুদ্ধানন্দ (স্বামীজীব শিষ্য ও স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর অনুবাদক)
- স্বামী বিরজানন্দ (স্বামীজীর শিষ্য, মায়াবতী মঠের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, পরে আলমোড়া সামলাতালায় একটি আশ্রম স্থাপন করেন)
- স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য মহারাজ)